তিন তরঙ্গ

প্রতিভা বসু

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৩, জুলাই ১৯৫৬

দাম : চার টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

আমার কুড়ি বছরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধু
শ্রীমতী উমা দত্তের জন্য

তিন তরঙ্গ

প্র থ ম

ত র ঙ্গ

১

খালের ঘাটে নৌকো বাঁধা। সব তৈরি। একে-একে বাক্স বিছানা এনে উঠিয়ে দিলো চাকর, ছোট্ট মাটির হাঁড়ি ভর্তি নাড়ু মোয়া, লম্বাটে লিলি বিস্কুটের টিন ভর্তি মুড়ি। কাগজে জড়ানো আমসত্ব আছে ট্রাঙ্কের তলায়, কাপড়ে জড়ানো ছোটো কাচের বৈয়মে কাগজি-লেবুর আচার, কবিরাজি টনিকের বোতল, ছোট্ট স্নোর কৌটোয় পুরোনো ঘি পর্যন্ত। সব দিয়ে দিয়েছেন তরঙ্গিণী সেই ট্রাঙ্কের মধ্যে ছেলেকে। সোমনাথ আজ কলেজে পড়তে কলকাতা যাচ্ছে।

এইবার সোমনাথ লক্ষ্মীনারায়ণের আসনের কাছে প্রণাম ক'রে, কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে যাত্রা ক'রে বেরুলো ঘর থেকে। আধ-কপাল ঘোমটা-টানা তরঙ্গিণী মনে-মনে বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা।' তরঙ্গিণীর খুড়শাশুড়ি বললেন, 'ওর বাঁ-হাতের ক'ড়ে আঙুলে তিনবার কামড় দিয়ে দাও বৌমা, দুর্গা দুর্গা।' দাদু এসে তাড়া দিলেন, 'আর দেরি করিয়ে দিয়ো না তোমরা, সময় হ'য়ে গেছে, নেপেন ভূপেন কতক্ষণ এসে ব'সে রয়েছে ঘাটে।'

সজল চোখে সোমনাথ প্রণাম করলো গুরুজনদের। একটু দাঁড়ালো মা-র গা ঘেঁষে, তারপর ধীরে-ধীরে চ'লে গেলো ঘাটে, যেখানে নৌকোয় দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গীরা। তারা দু-জন কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা।

একজন সরকার বাড়ির নৃপেন, দাঁতের ডাক্তারি পড়ে, আর-একজন ঘোষেদের ছেলে ভূপেন, চাকরি করে ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে। তারাই এখন সোমনাথের মুরুব্বি, তাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হবে তাকে। খানিক দূরে জবা গাছের ঝোপে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন তরঙ্গিণী। খালের ঘাট পর্যন্ত আসতে পারেন না, সেখানে সব কর্তারা দাঁড়িয়ে আছেন, বাইরের লোকজন এসেছে। কামার, কুমোর, ভুঁইমালি, চাকর, সবাই জড়ো হয়েছে বকুলতলার ঘাটে।

একে-একে নৌকোয় উঠলো তিনজনে। সোমনাথ আর-একবার ফিরে তাকালো, সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে দাদু পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মাঝিরা নৌকোর খুঁটি খুলে লগিতে ডান বাউলি দিয়ে বুকে হাত ছুঁইয়ে আল্লার নাম নিলো।

তরঙ্গিণী এবার চিলকুঠির ছাতে এলেন। এখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত খাল দেখা যায়। একেবারে নলখাগড়ার বাঁক পর্যন্ত, যতদূর দেখা গেলো তিনি সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকলেন সেই দোমাল্লাই ছিপের মতো কালো নৌকোটির দিকে। সোমনাথও নৌকোর ছৈয়ে হেলান দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। সে জানে মা ছাতে এসে দাঁড়াবেন। নৌকোটি মিলিয়ে যেতে-যেতে তরঙ্গিণী অনুভব করলেন, তাঁর হৃদয় যেন শূন্য হ'য়ে গেলো, বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে-মুচড়ে উঠলো। আর তিনি পারলেন না। সেখানেই, সেই রোদ্দুরেই চিলকুঠির সিঁড়িতে ব'সে প'ড়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

কত দুঃখের ধন তাঁর এই ছেলে। এই ছেলেকে ছেড়ে যে তিনি একটা দিনও থাকতে পারেন না। একে বুকে নিয়েই সকল জ্বালা জুড়িয়েছিলেন। ষোলো বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন। স্বামী-শোকে

তিনি পাগল হ'য়ে যেতেন যদি না ও জন্মাতো। হয়তো এ-জন্যেই ছেলের প্রতি তাঁর স্নেহটা অত্যন্ত উগ্র ছিলো। আত্মীয়স্বজনরা পরিহাস করেছেন এ নিয়ে, বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়েছেন। জটলা পাকিয়ে নিন্দে করেছেন খাটো গলায়। তাঁরা জানতেন না সোমনাথকে বুকে জড়িয়ে, তার ফোলা-ফোলা গালের হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে তরঙ্গিণীর মন-প্রাণ কতখানি ভ'রে থাকতো। হৃদয় কতখানি শান্ত হ'তো এই অল্প বয়সের সন্তানের মধ্যে। এই ছোট্ট মানুষটি ছাড়া আর কে আছে তাঁর। এ তো সে-ই। সে-ই তো ছোটো হ'য়ে আবার এসেছে তরঙ্গিণীর কাছে। এমনও তো হ'তে পারতো স্বামীর মৃত্যুতেই সব শেষ হ'য়ে গেলো। কোনো স্মৃতি, কোনো চিহ্নই আর রইলো না। তবে কী হ'তো? যখনি তাঁর এ-কথা মনে হয়েছে, চিবুক পর্যন্ত ঘোমটা-টানা চোখে বিভীষিকা দেখে শিউরে উঠেছেন তিনি। এই এক-ছিটে রক্তকণিকার মূল্য যে কত বড়ো তা ভেবে নিন্দে-প্রশংসার অতীত হ'য়ে গেছে মন। ঈশ্বর আছেন। তিনি দুঃখও যেমন দেন, তার প্রতিষেধকও দেন বৈকি।

নিষ্ঠার ত্রুটি ছিলো না তাঁর জীবনে। ষোলো বছরের মেয়ে চুল মুড়িয়ে, থান প'রে, নির্জলা একাদশী ক'রে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো সকলকে। নেহাৎ নিঃশব্দ অধৈর্যহীন মানুষ। যেটা দৈব দোষে ঘটলো তাঁর জীবনে, তাকে মেনে নেবার নম্রতা ছিলো। মৃত্যু যখন প্রেমের চাইতেও শক্তিমান তখন আর লড়াই ক'রে লাভ কী? হাজার চেষ্টাতেও যে মানুষকে ধ'রে রাখা যাবে না সেখানে কী হবে কপালে করাঘাত হেনে। মৃত স্বামীর পায়ের পাতায় মুখ গুঁজে এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন। যাঁর জিনিস তিনিই যখন নিয়েছেন সেখানে জবর-দস্তি করাই তো হঠকারিতা। চুপ! একেবারে চুপ হ'য়ে যাও, হৃদয়, শান্ত হও, বিনীত হও, অন্যের ধনে লোভ কোরো না। এই যে, এই তো

আছে তোমার। সাতদিনের মধ্যেই সেই দুরন্ত শোক সামলে উঠে ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। আট মাসের মোটাসোটা নধর সোমনাথ।

সেই ছেলেকে কোলে ক'রে খুড়শ্বশুরের আশ্রয়েই তাঁকে উঠতে হ'লো। ভাইপোর বিধবাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবার ঔদার্য না থাকাটা খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় নয় বাঙালির সংসারে। এ নিয়ে কৃষ্ণদাসকে দোষ দেয়া যায় না। কৃষ্ণদাস নিঃসন্তান। নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। এর মধ্যে এই কাঁচা বিধবা আর কচি ছেলের ভার?

মুখে কিছু না বললেও প্রথম দিকটা কৃষ্ণদাস মনে-মনে বিরক্তই হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই এ-ভাবটি তাঁর বদলে গেল। তার অবিশ্যি কারণও ছিলো। সমস্ত সংসারটি মাথায় তুলে নিলেন তরঙ্গিণী। সারা মনটা যেমন তাঁর সোমনাথের প্রতি একাগ্র, ঠিক তেমনি সারা শরীরটাকে একাগ্র করলেন সংসারের সেবায়। সেখানে তাঁর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, বিরামহীন, বিচারহীন যন্ত্রের মতো তাঁর কাজ। শেষ পর্যন্ত আশ্রয়দাতাই যেন আশ্রিত হ'য়ে উঠলেন। আর সংসারে তরঙ্গিণী হলেন অপরিহার্য। তাঁর জায়গা হ'লো।

জ্ঞান হবার সঙ্গে-সঙ্গে সোমনাথ এ-কথাই উপলব্ধি করলো যে, তার মা-র এই হতাশাভরা ব্যর্থ জীবনের একমাত্র আলো সে নিজে। আশার এই সূক্ষ্ম রেখাটি একদিন তাকেই উজ্জ্বল করতে হবে। করতেই হবে। আর ছেলে একটু বড়ো হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তরঙ্গিণী উপলব্ধি করলেন যে, জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই ছেলেকে তাঁর বড়ো করতেই হবে। শিক্ষিত করতে হবে। তিনি মন দিলেন সেদিকে। সমস্ত দিনের সব ক্লান্তির শেষে তাঁর বিশ্রাম হ'লো ছেলেকে নিয়ে পড়তে বসা। তিনি তার সঙ্গী, সহচর, বন্ধু, একাধারে সব হলেন। খেলা দিয়ে, কথা

দিয়ে, গল্প দিয়ে ছেলের মনে শিক্ষার বীজ বপন করতে লাগলেন ধীরে-ধীরে। আর ছেলেও একান্ত মনে গ্রহণ করতে লাগলো তাঁর শিক্ষা। মা-র সব-কিছু তার ভালো লাগলো। তাঁর চেহারা, তাঁর কথা হাসি, তাঁর ধরন-ধারন সব-কিছুতেই মুগ্ধ হ'লো সে। এবং সাবালক হ'তে-হ'তে মতের অনেক গরমিল দেখা দিলো বটে, কিন্তু সে-সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোনো জোর পেলো না মনে। কেননা তরঙ্গিণীর অতলস্পর্শী কুসংস্কার, জাতিধর্মে অখণ্ড বিশ্বাস, গুরুজনে অন্যায়রকম ভক্তি, অদৃষ্টের উপর আত্ম-সমর্পণ, সব-কিছুর মূলে একটা গভীর বিশ্বাস ছিলো। সেটা ছিলো তাঁর একান্তই নিজের, এ নিয়ে অন্যের সঙ্গে তিনি তর্ক করতেন না, উত্যক্ত করতেন না, অন্যেরা না মানলে কোনো ভাবান্তর ছিলো না তাঁর। তুমি সবুজ ভালোবাসো না, আমি বাসি— যেন এরকমই একটা সহজ ব্যাপার। এ নিয়ে ঝগড়া করবার আর কী আছে? সকলের মন কি এক তারে বাঁধা যে সকলের বিশ্বাস এক হবে? এমন কি নিজের ছেলের মধ্যেও তিনি নিজের ইচ্ছাকে সংক্রমিত হ'তে দিলেন না। বড়ো হও, ভালো হও, সৎ হও, তারপর নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করো পৃথিবীকে। মা-র এই পরিচ্ছন্ন নিরাসক্ত বুদ্ধিকে সোমনাথ বরং প্রশংসাই করলো মনে-মনে। তরঙ্গিণীর বিদ্যা রামায়ণ-মহাভারতেই সীমাবদ্ধ, তবু তাঁর মন যে এমন উদার এ-কথা ভেবে অবাক হ'লো সে। হয়তো মা-র প্রতি এই ভক্তির ভাবটাই তাকে ঠেলে নিয়ে গেলো উন্নতির পথে। লাফিয়ে-লাফিয়ে টগবগে ঘোড়ার মতো ইস্কুলের সব ক'টা ধাপ অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'য়ে ম্যাট্রিকুলেশনে একটা বৃত্তি পেলো কুড়ি টাকার। তারপর কলকাতা। আরো, আরো বড়ো আশা।

অবিশ্যি কুড়ি টাকার বৃত্তিটা পেলো ব'লেই তরঙ্গিণীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তে পারলো, সোমনাথ আজ রওনা হ'তে পারলো কলকাতা। তা

নৈলে কী সম্বল ছিলো যার জোরে ছেলেকে তিনি ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারেন? যে তিমিরে সে তিমিরেই জীবন কাটতো।

চিলকুঠির ছাতে বেলা বারোটার রোদ্দুর মাথায় নিয়ে কত কথা আজ ভিড় করলো তরঙ্গিণীর মনে। সতেরো বছর আগে স্বামীকে বিদায় দিয়ে যে-শোকের মুখে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলেন এতদিন, সেই শোক আজ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠলো। ব্যাকুল কান্নায় তিনি ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলেন। কিন্তু কেন এই কান্না? আঁচলের তলায় রাখতে তো তিনি চান নি ছেলেকে। ছেলে বড়ো হোক, মানুষ হোক, এ ছাড়া তিনি আর কী ভেবেছেন এই সতেরো বছর ধ'রে? তাঁর ঐকান্তিকতা তো এতদিন এখানেই নিবদ্ধ ছিলো। তবে কেন এই কান্না? আর কাঁদবেনই যদি তাহ'লে কেন পাঠালেন? ম্যাট্রিক-পাস ছেলে নিয়েই তো তাঁর যথেষ্ট সুখী হওয়া উচিত ছিলো। তাঁর মতো নিঃস্ব বিধবার এমন জীবনপণ ক'রে কী দরকার ছিলো কলকাতা পাঠাবার? ক'রে খাওয়ার পক্ষে তাঁদের মতো অর্ধশিক্ষিত পরিবারের এই তো যথেষ্ট। জমিদারি সেরেস্তায় অনায়াসেই একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন কৃষ্ণদাস। ছেলের উপার্জনে স্বাধীন জীবনের আস্বাদ পেতেন তরঙ্গিণী। সবাই বলতো ছেলের মতো ছেলে। এইটুকু বয়সেই মা-র দুঃখ ঘোচালো। কিন্তু দুঃখ কি ঘুচতো? আজ যদি তিনি ছেলেকে কলকাতা না পাঠাতে পারতেন তাহ'লেই সত্যি ব্যথা পেতেন অন্তরে। আজ কিসের কষ্ট? ক'দিন! দেখতে-দেখতে কেটে যাবে দুটো বছর। ছুটি আছে, তিন মাস পরেই তো পুজো।

নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। কত কাজ এখনো বাকি। গোরুকে জাবনা দিতে হবে, শ্বশুরের স্নানের জল তুলতে হবে— শাশুড়ির ছাড়া কাপড় এখনো প'ড়ে আছে ঘাটে, সব সেরে

নিজের জন্যও তো ফুটোতে হবে দুটো। সোমনাথের যাওয়া উপলক্ষে আজ আর তরঙ্গিণী অন্য কোনোদিকেই মন দিতে পারেন নি। ঘর মোছা পর্যন্ত বাকি রেখেছেন আজ। শরীরটাকে প্রায় টানতে-টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলেন। শেষ সিঁড়ির মুখেই তাঁর শোবার ঘর। শূন্য ঘরের এলোমেলো বিছানার দিকে তাকিয়ে আবার তাঁর অবাধ্য চোখ জলে ভ'রে উঠলো।

২

সত্যি-সত্যিই যে কলকাতাই পড়তে আসতে পারবে, এটা শেষ পর্যন্তও আশা করতে পারে নি সোমনাথ। কৃষ্ণদাসের মত ছিলো না। ঘরের কোণে ঢাকা, ঢাকা অপরাধ করলো কী? পড়তেই যদি বাসনা তাহ'লে সেখানেই তো সবচেয়ে ভালো। কত আত্মীয়স্বজনের বাড়ি আছে, এক বাড়ি গিয়ে উঠলেই হ'লো, থাকলেই হ'লো। মুন্সিগঞ্জে যাক না, চমৎকার কলেজ হয়েছে সেখানে, পীতাম্বর খুড়ো সেখানকার হাই স্কুলের হেডপণ্ডিত। জামাই-আদরে থাকবে তাঁর বাড়িতে। ঘোমটা টেনে, মাথা নিচু ক'রে, নিঃশব্দে বারে-বারে এ-সব কথা শুনতে-শুনতে মা-ও শেষে বিচলিত হয়েছিলেন। ঠিকই তো। ঢাকাই তো ঘরের কোণে, সেখানে থাকলে খরচ কম, প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়ি আসতে পারবে, ঘন-ঘন দেখতে পাবেন তিনি। আর কলকাতা! কত দূরের দেশ সেটা, কত ভয় সেখানে, কত আশঙ্কা! সেখানকার খরচই বা দেবে কে?

'তা-ই ভালো, খোকা,' রাত্রিবেলা মশারি গুঁজে দিতে-দিতে বলেছেন, 'কলকাতা-কলকাতা ক'রে এত খেপেছিস কী জন্যে? ঢাকাতেই পড়।'

'সে তুমি বুঝবে না, মা। সম্ভব হ'লে আমি কলকাতাতেই পড়তে যাবো।' মা মশারি গোঁজা স্থগিত রেখেছেন খানিকক্ষণের জন্য, 'আমার তো মনে হয় স্কলারশিপ পেলেও ওখানে চালাতে পারবিনে তুই। তাছাড়া ঠাকুর-খুড়ো যখন বারণ করছেন—'

'কিছু ভেবো না, মা। না যদি কুলোয় তাহ'লে তো আমি নিজেই যাবো না। আর যদি সব দিক ঠিক হ'য়ে যায় তাহ'লে আর বারণ কোরো না।'

'ছাখ ভেবে।' তরঙ্গিণী আর কথা কাটেন নি। তিনি জানেন সোমনাথ তাঁর অবুঝ নয়, বালক হ'লেও বালকোচিত নয়। সবদিক ভেবেই সে কাজ করবে। সত্যি বলতে কলকাতাই তো সব চেয়ে ভালো, সেখানে স্থযোগ আছে, স্থবিধে আছে, ভাগ্যলাভের একমাত্র বাণিজ্য-কেন্দ্র কলকাতা। অবিশ্যি কলকাতা যে কেমন তা তিনি আন্দাজও করতে পারেন না। বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এসেছেন, মাত্র এ-ছুটো দেশই তাঁর জানা। আহা রে! মা-র জন্য ছেলেমাস্থষের মতো মন-কেমন করতে লাগলো সোমনাথের। এত সাধের কলকাতা-যাত্রা ব্যর্থ লাগলো।

সোমনাথ নৌকোর বাইরে থেকে ছৈয়ের ভেতরে ঢুকে বসলো এবার। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চোখ মুছলো পেছন ফিরে। নেপেনদা স্থন্দর বিছানা পেতেছেন ভেতরে, একেবারে তোশক বালিশ দিয়ে। ভূপেনদা শার্ট ছেড়ে গেঞ্জি গায়ে লোমশ বুক বার ক'রে, বালিশে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছেন আরামে। সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা তো এই নৌকোতে কাটাতে হবে, কায়েমি হ'য়ে না-বসলে চলে?

'কী রে, চোখ ছলছল যে? কাঁদছিস নাকি?' ঠাট্টা করলো ভূপেন। 'এঃ, তুই দেখছি এখনো কোলের ডিম আছিস!'

বিশ্রী লাগলো সোমনাথের। কলকাতায় থাকলে তো মানুষের কথা-বার্তা কত মার্জিত হয়, গলার স্বর কত নিচু হয়, ভূপেনদার কথাবার্তা কেন এমন গ্রাম্য ? নেপেনদা হাসলেন, সস্নেহে পিঠে হাত রেখে বললেন, 'বোকা ! মন খারাপ করছিস কেন ? কত ভাগ্য তোর কলকাতায় পড়তে চলেছিস। ক'টা ছেলে এ পর্যন্ত এই গ্রাম থেকে কলকাতায় পড়তে গেছে বল তো ?'

যদি উপায় থাকতো তাহ'লে এই মুহূর্তে এই গৌরব সাগ্রহে ত্যাগ ক'রে মা-র কাছে ফিরে যেতো সোমনাথ। কী হবে, কী লাভ হবে, কী এমন মোক্ষ হবে তার কলকাতা গিয়ে। সেখানকার প্রতিযোগিতায় যদি সসম্মানে উত্তীর্ণও হয়, তাহ'লেই বা কী এমন সুখ হবে তার ! তার চেয়ে মা-র কাছে থাকা ঢের ভালো, ঢের সুখের ছিলো।

'ব্রিলিয়েণ্ট ছাত্র তুই, কলকাতাই তো তোর উপযুক্ত জায়গা। চিনি-খুড়িমা যে ছেড়ে দিয়েছেন তোকে, তাতে তাঁকে প্রশংসাই করতে হয়। আমার কথা জানিস তো ?'

সোমনাথের কান বধির হ'য়ে গেছে, চোখ অন্ধ হ'য়ে গেছে, সব ইন্দ্রিয়ের সব শক্তি একত্রিত হয়েছে একটা অসহ্য বুক-ভাঙা কষ্টের চেতনায়। গলা থেকে বুক আর বুক থেকে পেট পর্যন্ত একটা কান্নার ঢেউ ওঠা-নামা করছে কেবল। সে জবাব দিলো না। নিচু হ'য়ে জুতোর ফিতে খুলে পা খালি করলো, তারপর সোজা বাইরের দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলো চুপ ক'রে।

এতক্ষণে চৌধুরী-বাড়ির ঘাট ছাড়িয়ে বড়ো খালে পড়লো নৌকো। এবার মাঝিরা লগি ছেড়ে বৈঠা নিলে। প্রকাণ্ড শরীরের বলিষ্ঠ মাংস-পেশীতে কম্পন উঠলো তাদের। তারপাশা গিয়ে স্টিমার ধরতে হবে, বেরুতে একটু দেরি হ'য়ে গেছে। উচিত ছিলো ঠিক পৌনে এগারোটায়

রওনা হওয়া। তাহ'লে আর এই হয়রানিটা হ'তো না। এখন প্রাণপণ চালিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারলেই হয়।

কাঁপা-কাঁপা রোদ্দুরে তাকিয়ে সবুজ রঙের মখমল-বিছানো ধানখেত, পাটখেত, শাদা মাটি লেপা গৃহস্থ-বাড়ি, চালে-চালে লাউ কুমড়োর পরিপুষ্ট লতা, কলসি-কাঁখে ঘোমটা-টানা বৌ, ন্যাংটো-ন্যাংটো ছেলে-মেয়ের দল— এই দেখে-দেখে বেলা চারটে পর্যন্ত কাটিয়ে দিলো সোমনাথ। ততক্ষণে নিটোল একটি ঘুম সেরে গা চুলকোতে-চুলকোতে নেপেন, ভূপেন উঠে ব'সে চারদিকে তাকালো। 'আর কত দেরি হে,' ব'লে হাঁক-ডাক করলো মাঝিদের, তারপর যার-যার পুঁটলি খুলে কিছু-কিছু খাবার বার ক'রে বসলো।

'পথে বেরুলে কি খিদেটা একেবারে পেয়ে বসে নাকি রে? অ্যাঁ? তা নৈলে চারটে বাজতেই কখনো খাই?' ভূপেন চিঁড়ের মালসায় কলা চটকালো। নেপেন মুচকি হাসলো সোমনাথের দিকে তাকিয়ে। 'তুই কী খাবি রে?'

'কিছু না।'

'সে কী, খেয়ে এসেছিস সেই বেলা দশটায়, এখনো খিদে পেলো না? আয়, আয় খাবি আয়।' ভূপেনদা মোটা-মোটা লোমশ হাতে এক খাবলা চিঁড়ে এগিয়ে ধরলেন তার মুখের কাছে। সোমনাথ মুখ ফিরিয়ে নিলো। তরঙ্গিণী যে-শিক্ষায়, যে-রুচিতে, যেভাবে তাকে মানুষ করেছেন সে রাজত্বে ভূপেনের মতো মানুষের প্রবেশপত্র নেই, অথচ কলকাতা গিয়ে এই ভূপেনদার বাড়িতেই উঠতে হবে তাকে। খারাপ মন আরো খারাপ হ'য়ে গেলো।

ভূপেন এসেছিলো একটা মস্ত কেস করতে। জমিদারের বড়ো ছেলেকে

ভজিয়ে পঁচিশ হাজার টাকার একটা পলিসি বাগালো। তা নৈলে এই অসময়ে গ্রামে আসবার তার কথাই উঠতো না, আর সে না এলে নিশ্চয়ই কলকাতায় তার বাড়িতে গিয়ে উঠতো না সোমনাথ। তার চেয়ে নেপেনদা ঢের ভালো। বেশ লাগে নেপেনদাকে। অল্প বয়স, মাথা ভরা চুল, লম্বা বহরের ধুতিতে আদ্দির পাঞ্জাবিতে সর্বদাই ফিটফাট। বিয়ে করতে এসেছিলো। কথা ছিলো সোমনাথ তার সঙ্গে তার মেসেই প্রথমটায় উঠবে, তারপর দেখে-শুনে কোনো ভালো জায়গায় নেপেনই ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে আসবে তাকে। সেই ভালো ছিলো, হঠাৎ যে ভূপেনদা এসে উদয় হবেন কে জানতো। দাদু অমনি তার বাড়িতেই সোমনাথের থাকা ঠিক ক'রে ফেললেন। ভূপেনের কত বুদ্ধি, কেমন নিজের ফন্দিতে নিজে এই বয়সেই দিব্যি টাকাকড়ি জমিয়ে বসেছে, কলকাতার মতো জায়গায় ছ'টা ছেলেমেয়ে, স্ত্রী নিয়ে বাড়ি ভাড়া ক'রে আছে, সচ্চরিত্র, সজ্জন— তার কেয়ারে থাকা তো একটা ভাগ্য। নেপেনটা তো একটা ফচকে। কী জানে, টেড়ি বাগানো আর গুরু-জনদের দেখলে প্রণাম না-ক'রে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া? নেপেনদাকে দাদু দু-চক্ষে দেখতে পারেন না।

নিশ্বাস ছেড়ে ভূপেনদার হাত থেকে চিঁড়ে-কলা নিতেই হ'লো শেষ পর্যন্ত দু-চার গরস। নেপেনদা বললেন, 'না রে, ও-সব খাসনে তুই, স্টিমারে চমৎকার চা দেবে দেখিস, সঙ্গে ডিমের পোচ, টোস্ট রুটি মাখন—' বাঁ-হাতের ঘড়িতে তাকিয়ে বললেন, 'সাড়ে-চার, এসে গেছি প্রায়। একটুখানি কষ্ট ক'রে থাক।'

তারপাশা এসে আর অপেক্ষা করতে হ'লো না, পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভোঁ শোনা গেলো স্টিমারের। ছোটো-ছোটো ছিপের মতো নৌকোগুলো নানারকম খাবার জিনিস নিয়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে।

তার মধ্যে কলাই সবচেয়ে বেশি। রসগোল্লা পান্তুয়ার নৌকোও আছে, আছে টাটকা গরম দুধ, উনুন জ্বালিয়ে ফুলুরি ভাজছে নৌকোর মধ্যে, দিচ্ছে গরম-গরম। জিবে গজা, তক্তি বিস্কুট হাঁকছে আরেক নৌকো থেকে। ভোজবাজির মতো পলকে সরগরম হ'য়ে উঠলো নিঃঝুম বালুর চর।

এবার ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ করতে-করতে স্টিমার এসে ভিড়লো। খালাসিরা কাছি ফেললো দূর থেকে। পাটাতন ফেলা হ'লো, দু-দিকে বাঁশ দিয়ে হাতল করা হ'লো যাত্রীদের ধ'রে-ধ'রে নিরাপদে উঠে আসবার জন্য। বাঁ-বগলে পুঁটলি নিয়ে, ডান-হাতে সোমনাথকে হ্যাঁচকা মেরে, অন্য যাত্রীদের কনুই গুঁতিয়ে সর্বাগ্রে সেই পাটাতনে ভূপেনদা চড়লেন। মুটের মাথায় বাক্স বিছানা চাপিয়ে পেছনে-পেছনে নেপেন। এমন কিছু অসংখ্য যাত্রী নয়, কিন্তু তাতেই ঐ ক্ষণিক সেতু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। কেউ নামলো, কেউ উঠলো, অনেকে রেলিং থেকে যতটা সম্ভব নিচু হ'য়ে গরম ফুলুরি নিলো, কেউ হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা, কেউ বা ডজন-ডজন কলা।

ভূপেনদাও ছাড়লেন না। সোমনাথকে দোতলার ডেকে তুলে দিয়েই নেমে এলেন নিচে। তিন হাঁড়ি পান্তুয়া কিনলেন ছেলেমেয়েদের জন্য।

দেশের মাটি ছাড়লো সোমনাথ। পদ্মার বিশাল বুকের দিকে তাকিয়ে প্রাণের মধ্যে আবার হুহু ক'রে উঠলো। ঘাই মেরে-মেরে জলকে আলোড়িত ক'রে স্টিমারের চাকা দেখতে-দেখতে তীর ছাড়িয়ে চ'লে এলো মাঝখানে। দিগন্তব্যাপী মাটির সমুদ্রের উপর একখানি দরমার একচালা টিকিট-ঘর, আর টিকিট-ঘরের সামনে কাপড়-পরা দু-একজন মানুষ, নেংটি-পরা কয়েকটি বালক, ছেঁড়া ফ্রক আর উকুন-ভরা মাথার

কয়েকটি বালিকা— ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রৌদ্ররাঙা গোটা কয়েক গাছ নিয়ে একখানি ফ্রেমে আঁটা ছবি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারপাশা স্টেশন।

৩

কলকাতা। সোমনাথের আজন্মের স্বপ্ন। ভূপেনদার একতলা ফ্ল্যাটের আড়াই খানা ঘরের আধখানা ঘরে ব'সে সমস্তটা সকাল সে মাকে চিঠি লিখলো। ন'টা না বাজতেই হুড়মুড় ক'রে স্নান-খাওয়া সেরে ভূপেনদা আপিসে ছুটলেন। দশটা না বাজতেই ছ' ছেলেমেয়ের পাঁচটি মাকে হিমসিম খাইয়ে ইস্কুলে ছুটলো। সোমনাথ চুপচাপ ব'সেই রইলো ঘরে। সেও বেরুবে এগারোটার সময়। নেপেনদা এসে নিয়ে যাবেন তাকে ভর্তি করতে। কলেজের কাছাকাছি মেসও ঠিক ক'রে দেবেন। এক্ষুনি যেতে পারলে বাঁচে সোমনাথ। ছ'টি ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী নিয়ে এইটুকু পরিসরে ভূপেনদাই গলদঘর্ম, একটা রাতই বা এখানে আরেকটা মানুষ থাকবে কী ক'রে?

দেশে আম-বাগান, জাম-বাগান, রাশি-রাশি এলোমেলো হাওয়া, বড়ো-বড়ো মাঠ, মস্ত-মস্ত নদী— সোমনাথের যেন দম বন্ধ হ'য়ে এলো। খুপরি বাথরুমে স্নান ক'রে এসে ব'সে থাকতে-থাকতে হয়তো তন্দ্রা এসেছিলো, হঠাৎ চুড়ির মৃদু আওয়াজে চমকে তাকালো। ভূপেনদার কৃশাঙ্গী স্ত্রী একটু হাসলেন। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলে? রাত্তিরে বুঝি ঘুমুতে পারো নি? যা ভিড় থাকে ঢাকা মেলে। চলো খাবে।'

এতক্ষণে তিনি অবসর হ'য়ে স্নান করেছেন, চুল মেলে দিয়েছেন পিঠের উপর। পাৎলা ব্লাউসে, শাদা পরিচ্ছন্ন শাড়িতে, সিঁদুরের টিপে সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো

সোমনাথ। ভূপেনদার স্ত্রীকে গ্রামে থাকতে আর কখনো ভাখে নি সে। মনে পড়ে না ভূপেনদা কবে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলেন। অবিশ্যি গ্রামে তাদের নেইও কেউ। সকালে এক পলক পরিচয়ের পালা সাঙ্গ ক'রেই ভদ্রমহিলা রান্নাঘরে চ'লে গিয়েছিলেন, এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

আসন পেতে খেতে বসিয়ে ছোটো-ছোটো আলাপ করলেন তিনি। এটা ওটা না চাইতেই পাতে তুলে দিলেন, স্কলারশিপ পাবার জন্য বারে-বারে আন্তরিক আনন্দ জানালেন। বললেন, 'সন্তুও তো এবার ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠলো। কী করবে কে জানে। ভালো ছাত্র দেখলেই আমার ওর ভাবনা উঠে যায়। ছেলেপুলের দিকে মোটেও তো নজর নেই ওঁর, লেখা-পড়ার দিকে কোনো অনুরাগই নেই মানুষটার। আর ছেলেটিও ঠিক তেমনি।'

বৌদির কথা শুনতে-শুনতে ঈষৎ হাসলো সোমনাথ।

এতক্ষণে বাড়িটা যেন সহনীয় লাগলো তার কাছে। দুরন্ত জ্বরতপ্ত কপালে স্নিগ্ধ একখানি ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া। সত্যি! মেয়েরা সবাই ভালো। প্রত্যেক বাড়িতে একজন-না-একজন মেয়ে আছেন ব'লেই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে শান্তি আছে, সুখ আছে। এ-বাড়িতে এই বৌদিটি না থাকলে মানুষগুলো বাঁচতো কেমন ক'রে? মনে-মনে নম্র হ'য়ে এইটুকু স্নেহভাষণের জন্যেই সোমনাথ কৃতজ্ঞ হ'লো।

যথাসময়ে নৃপেন এসে নিয়ে গেলো তাকে। বৃত্তি-পাওয়া ছেলে, ভর্তি হ'তে কিছুই বেগ পেতে হ'লো না। কলেজের কাছাকাছি হস্টেলও ঠিক করা হ'লো। সব ঠিকঠাক ক'রে, বাসে ট্রামে সারাদিন শহর বেড়িয়ে বেলা চারটের সময় বাড়ি ফিরলো সোমনাথ।

সন্ধ্যার সময় হাঁটুর উপর কাপড় তুলে রুটি সহযোগে চা খেতে-খেতে পিঠ চাপড়ালেন ভূপেনদা, 'কী রে, কেমন লাগলো কলকাতা শহর?

বাস্ দেখেছিস ? ট্রাম দেখেছিস ? মনুমেণ্ট ?' দুটো ছেলে হে-হে ক'রে হেসে উঠলো বাপের কথায়। ভূপেনদাও হাসলেন। সোমনাথ লাল হ'য়ে উঠলো। ভূপেনদার স্ত্রী বললেন, 'আহা দু-দিনেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে দেখো। এখন ওর কত খারাপ লাগছে সবাইকে ছেড়ে, তার আবার শহর দেখা।'

ভূপেনদা আঙুল দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে খাবার সাপটে জিবের উপর নিয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, 'তাহ'লে একটা গল্প বলি শোন। আমাদের দক্ষিণের বাড়ির পদি পিসিকে মনে আছে তোর ? তার ছেলে একবার তাকে কলকাতা দেখাতে নিয়ে এসেছিলো, বুঝলি ? দেশে ফিরে গিয়ে কী তার গল্প ! বলে যে— "জান্‌ছ নি ভূপা, কইলকাতায় আমাগো বাউসার কী পিতিপত্তি। বড়ো-বড়ো সব হাপ টেনের মতো গাড়ি যেই ও আত দেখায় ওমনেই থাইমা যায়।" '

এবার সকলের সঙ্গে সোমনাথও হেসে উঠলো। ভূপেনদার স্ত্রী বাঙাল কথা ভালো বোঝেন না, তিনি ব্যগ্র হ'য়ে বললেন, 'কী ? কী ? কী বললো ?' ভূপেনদা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, 'জানিস রে ভূপা, অর্থাৎ ভূপেন, কলকাতায় আমাদের বাউসা, মানে বাসুদেব, তার ছেলে, তার কী প্রতিপত্তি, বড়ো-বড়ো সব হাফ-ট্রেনের মতো গাড়ি অর্থাৎ, ট্রাম, যেই ও হাত দেখায় অমনি থেমে যায়।' এবার হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়লেন বৌদি। ভূপেনদা এবার গৌরবান্বিত হ'য়ে আরেকখানি গল্প ছাড়লেন। 'শোন আরেকটা বলি, আমি যখন প্রথম কলকাতায় এলুম, আমার সঙ্গে পুব পাড়ার হরেকেষ্ট মজুমদার এলেন মুরুব্বি হ'য়ে। নিজেই সে কিছু জানে না অথচ ভাবখানা যেন কত কালের ঘাগি। গড়ের মাঠের কাছ দিয়ে আসতে-আসতে মনুমেণ্টের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "এটা কী খুড়ো ?"

'কোনডা ?'

'ঐ যে। অনেক উঁচু।'

'বইল কোনহানের। এডাও বুঝলি না ? ঐটা অইল কইলকাতার শিব !' আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'শিব ? এত বড়ো ?'

'হ, হ, অত বড়োই। বড়ো-বড়ো শহরের বড়ো-বড়ো শিব। এই কি তগো বটতলার বুইরা আঙ্গুল ?'

আরেক প্রস্থ হাসির ফোয়ারা ছুটলো। ছোট্ট বাড়ির অন্ধকূপ প্রাণপ্রাচুর্যে মুহূর্তে জীবন্ত হ'য়ে উঠলো সোমনাথের মনে। কই, এখন তো ভূপেনদাকে তত খারাপ লাগছে না। বরং ভালোই লাগছে। চমৎকার দিলখোলা মানুষ, দিব্যি হাসি গল্প। কাল মেসে গিয়ে সে টিঁকবে কেমন ক'রে ? খানিক পরে বৌদি উঠলেন। বাড়িতে অতিথি, কালই চ'লে যাবে, আজ একটু তার বিশেষ ব্যবস্থা না করলে কি চলে ? চোখে চেয়ে তিনি বিদায় নিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে শুধু-শুধু চোখ জলে ভ'রে উঠলো সোমনাথের। এই তো বাড়ি। সব বাড়িই এক রকম। সব বাড়িই ভালো। কিন্তু মেস ! মেস কেমন ? শোবার আগে সে আরেকখানা চিঠি লিখলো মাকে। সারাদিনের সব খবর দিয়ে।

৪

কিন্তু মেসই বা মন্দ কী ! শেষ পর্যন্ত মানুষের সবই স'য়ে যায়। অন্ধকার তেতলা বাড়ির একতলার ঘরে আরো তিন জন ছেলের সঙ্গে চার জন হ'য়ে প্রথম রাত্রে অবিশ্যি ঘুম হ'লো না, দ্বিতীয় রাত্রিতেও না, তৃতীয় রাতে মশার আধিক্য ছিলো, চতুর্থ দিন রাস্তার কোলাহল, পঞ্চম রাত্রে প্রায় গা-সওয়া, এই ক'রে-ক'রে কয়েকদিনের মধ্যেই সব ঠিক হ'য়ে

গেলো। কিন্তু খাওয়ার কষ্টটা মেনে নিতে সময় লাগলো একটু। ভোজ্য তালিকাটি অবিশ্যি নেহাৎ মন্দ নয়, খোঁজাখুজি করলে প্রায় সবই পাওয়া যায়। পাৎলা হলদেটে জলের মধ্যে একটু-আধটু ডালের আভাস, তরকারির মধ্যে কুমড়োর পেস্টে হাৎড়াতে-হাৎড়াতে দু-এক টুকরো আলু, সবুজ আর লালের মাঝামাঝি রংদার মাছের ঝোলে হাত ডোবালে গলন্ত মাছের একটু-আধটু, সবই পাওয়া যায়। তার উপরে শাদা রঙের তরল দই আছে দু-চামচে। তবু পেট ভরে না সোমনাথের। বাইরে রেস্তোঁরায় গিয়ে খেতে-খেতে পকেট ফাঁক হ'য়ে যায়।

দিন চারেক অসম্ভব গরমের পরে এর মধ্যেই এক বিকেলে বর্ষা নামলো উত্তাল হ'য়ে। কলকাতার আশ্চর্য সুন্দর বর্ষা। ধোঁয়ারা সব কোথায় গেলো, ধুলোরা ধুয়ে-মুছে ফিটফাট, ট্রামের তারে হাজার তারার হার। কালো কুচকুচে দুটো কাক কোথা থেকে উড়ে এসে বসলো সোমনাথের জানলায়, সরু গলির উল্টো দিকের তেতলা ডিঙিয়ে, ছাতে-ছাতে রেডিয়োর বাঁশ পেরিয়ে, হলদে বাড়ির নারকোল গাছে নাচের ছন্দ নামলো বৃষ্টির একটানা গানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। কী সুন্দর! কী সুন্দর! সোমনাথ একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। একতলার জানলা দিয়ে এই মেঘে-ঢাকা বৃষ্টি-মোছা আকাশের দিকে তাকিয়ে কলকাতাকে ভালোবাসলো সে।

গ্রামে বৃষ্টি নামে খালে, বিলে, পুকুরে, টিনের চালে। নামে গাছের মাথায়-মাথায়। আর নামে ঝোপে ঝাড়ে বনে বাদাড়ে। ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর কোলাব্যাং ডাকে, ছাঁট এসে ঘর ভিজিয়ে দেয়, টপটপ জল পড়ে ফুটো টিনের ফাঁকে। রাস্তায় বেরুলে কাদায় জুতো ডুবে যায়। উঠোনে কেঁচোরা কিলবিল করে। বন্ধুদের বাড়ি বেড়ানো বন্ধ, মাঠে এক হাঁটু জল। হাট হয় না, বাজার হয় না, খিচুড়ি আর ডালের বড়া। দাদুর

দাবা আর ঠাকুরমার পাড়া-বেড়ানো বন্ধ। সকলের জন্য একটি মন-খারাপের ডালা নিয়ে আসে বৃষ্টি। কেবল সোমনাথের মন আবেগে ভারি হ'য়ে থাকে, মধুর ভালো লাগায় ভ'রে যায় মন। এমন প্রাণ-ঠাণ্ডা-করা, চোখ-জুড়োনো বৃষ্টি কেন সবাই ভালোবাসে না, সেজন্য কষ্ট হয় তার। একলা ঘরে ব'সে-ব'সে বই পড়ে, মা ডালা ভর্তি মুড়ি মেখে নিয়ে আসেন তেল নুন কাঁচা লঙ্কা দিয়ে··· আনমনে খায়।

সেই বৃষ্টি, সেই তার আত্মার সহোদর, ভালো লাগার, ভালোবাসার পরম কেন্দ্র— কলকাতার স্বজনবিরহিত শুকনো ইট কাঠের ফাঁকে-ফোকরে, অলিতে-গলিতে, ডাস্টবিনে, অন্ধ ঘরে ঠিক পথ চিনে-চিনে দেখা করতে এলো তার সঙ্গে। তবে কলকাতাতেও স্নেহ আছে? মমতা আছে? ধূলি-ধূসর নিষ্ঠুর কলকাতায়?

দরজা খুলে খালি পায়ে খালি মাথাতেই সে রাস্তায় নেমে এলো, আর নেমেই অবাক। এমন সুন্দর ধোয়া মোছা, চিক্কণ চিকচিকে কালো পাথরের মতো মসৃণ রাস্তাটি কে এখানে পেতে রেখে গেলো? সেই নোংরা, বিশ্রী, তরকারির খোসা আর ছাইয়ের গাদায় ভর্তি মেটে রংয়ের গলিটা তবে গেলো কোথায়?

আই. এ. আর আই. এ.-র পর বি. এ. এই চার বছরে কলকাতার প্রেমে প'ড়ে গেলো সে। শুধু বর্ষণ কেন! শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত কোন ঋতু এখানে মনোহর নয়? কোন শহরে এমন কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ? গ্রীষ্মের বিকেলে এমন বকুল-বিছানো রাস্তা! এমন শীতল হাওয়া, আকাশে এমন শাদা মেঘের তুষার!

কী এখানে নেই? মনোমতো সঙ্গী? আছে। বই? আছে। আছে মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ, সবুজ ঘাসে ভরা দিগন্তব্যাপী গড়ের

মাঠ, লেকের আঁকাবাঁকা জল, কার্জন পার্কের রাশি-রাশি ফুলের বিছানা। নির্জনতা চাও? তাও আছে। কলরব তো আছেই। তবে? তবে কেন ভালোবাসবো না কলকাতাকে? সমস্তটা সময় যেন পাখির মতো উড়াল দিয়ে কাটে বন্ধুদের সঙ্গে এ-পাড়ায়, ও-পাড়ায়, বে-পাড়ায় উদ্দাম আড্ডায়। কলেজের করিডরে, কমনরুমে আর লাইব্রেরিতে।

অভাব শুধু মা নেই এখানে। সারাদিনের সব আনন্দের পরে মেসের ছোটো ঘরে আরো তিন জনের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে-করতে প্রত্যেকদিন তার নতুন ক'রে মা-র জন্যে কষ্ট হয়। মনে-মনে সময় ঠ্যালে সে। আর দেরি নেই। হ'য়ে এলো। হ'য়ে এলো সময়। চোখ বুজে আর দুটো বছর। সেই পানাপচা খাল থেকে কাঁকাল বেঁকিয়ে কলসি-কলসি জল টানা, গোবর গুলে উঠোন লেপা, শুচিবায়ুগ্রস্ত শাশুড়ির চব্বিশখানা কাপড় কাচা, মেজাজি শ্বশুরের প্রত্যেক মুহূর্তের প্রত্যেক ইচ্ছার সহযোগিতা, সব-কিছুর অবসান তারপর। অফুরন্ত আলোর অঞ্জলিতে সে স্নান করাবে তার মাকে। তরঙ্গিণীকে। যে-মানুষটিকে সে সব-কিছুর চাইতে ভালোবাসে, যে-মানুষ তার কাছে সব চেয়ে সুন্দর। পৃথিবীর সব-কিছুর উপরে যাঁর স্থান।

৫

দেশে মস্ত লম্বা ছুটি কাটিয়ে এম. এ.-তে এসে ভর্তি হ'লো সোমনাথ।

আই. এ.-টা তরঙ্গিণীই কোনোরকমে চালিয়েছিলেন, তাছাড়া স্কলারশিপের টাকাও ছিলো। কিন্তু বি. এ.-তে উঠে নিজের উপার্জনেই প্রায় দুটো বছর চালাতে হয়েছিলো তাকে। এম. এ.-র প্রথম বছরটাও সে তা-ই করলো, কিন্তু দ্বিতীয় বছরের কয়েক মাস যেতেই তার মনে

হ'লো যতটা পড়াশুনো করলে ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়া যায়, দিনে তিনটে টিউশনি করলে তার অর্ধেক পড়াও তার হবে না। তরঙ্গিণীর লাইফ-ইনশিওরেন্সের দু-হাজার টাকা ততদিনে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। তবু উপায় কী! তার উপরেই কিছুটা নির্ভর করতে হবে। তিনটের মধ্যে অন্তত একটা টিউশনি ছাড়তে সংকল্প করলো সে।

এক সহপাঠীকে বললো, 'তুমি নেবে নাকি? বলেছিলে তো দরকার আছে।'

'নিশ্চয়ই!' প্রায় লাফিয়ে উঠলো ছেলেটি 'কেতকী আমাকে রোজ তাগাদা দেয় একটা টিউশনি জোগাড় ক'রে দেবার জন্য।'

'কেতকী? কোন কেতকী? বাংলার?'

'হ্যাঁ!'

'তোমার আত্মীয়?'

'বন্ধু। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পাশাপাশি বাড়িতে বড়ো হয়েছি।'

'তার বুঝি টিউশনির দরকার?'

'ভীষণ।'

'বেশ তো। তাহ'লে বোলো ওঁকে। আমি এ-মাসের আর বাকি ক'টা দিন ক'রেই ছেড়ে দেবো।'

তার দু-দিন পরেই সোমনাথের সঙ্গে করিডরে দাঁড়িয়ে এ-বিষয়ে খোঁজ খবর নিলো সহপাঠিনী কেতকী মুখার্জি। দেখাশোনা বলতে গেলে প্রত্যহই হয়, কিন্তু আলাপ এই প্রথম। ঝাঁকড়া খাটো চুল, মসৃণ শ্যামল রং, আঁটোসাটো গড়ন, সব মিলিয়ে বেশ দেখতে। অন্তত সোমনাথের তা-ই মনে হ'লো। আলাপটা হ'লো এইরকম:

'এই যে— আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

করিডর দিয়ে চ'লে যেতে-যেতে একটু থমকালো সোমনাথ।

'বলুন।'

'সন্দীপ সেন, ইংরিজির—ও বলছিলো আপনার হাতে একটা টিউশনি আছে ?'

'আছে একটা। মানে আমি ছাড়ছি একটা।'

'সত্যি ছেড়ে দিচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে যদি দয়া ক'রে—'

'আপনি নেবেন ?'

'যদি পারেন—'

'বেশ তো, আমি বলবো ওঁদের।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

একটু চুপচাপ।

'কোন ক্লাশে পড়ে আপনার ছাত্র ?'

'নাইন।'

'ছেলে না মেয়ে ?'

'মেয়ে।'

'মাইনে জানতে পারি কি ?'

'তিরিশ।'

আবার চুপচাপ।

'আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন ?' অসংগত প্রশ্ন। জবাব দিতে একটু ইতস্তত করলো সোমনাথ। সেইটুকু সময়ের মধ্যে কেতকী আবার বললো, 'আপনার বদলে আমাকে কি রাখবেন ওঁরা ?'

'কেন রাখবেন না ?'

'আপনি আর আমি !'

'তফাৎ কী? বরং মেয়ের জন্য মেয়ে-মাস্টার পেলেই হয়তো বেশি খুশি হবেন।'

'তাহ'লে একবার যদি বলেন।'

'আজই বলবো।' একটু পরে, 'তাহ'লে আমি যাই?'

'চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

একসঙ্গে তারা করিডর পার হ'য়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলো, গেট পেরিয়ে রাস্তায় এলো, তারপর ভিড়ের মধ্যে কে কোথায় হারিয়ে গেলো।

পরের দিন আবার দেখা হ'লো তাদের। সামান্য হাস্য-বিনিময়ের পরে লাজুক মুখে কেতকী জিজ্ঞেস করলো, 'বলেছিলেন?'

সোমনাথ বললো, 'বলেছিলাম।'

'রাজি?'

'খুব।'

একটু তাকিয়ে থেকে—'আপনাকে যে কী ব'লে ধন্যবাদ জানাবো।'

'আমাকে! আমাকে কেন ধন্যবাদ?' মৃদু হেসে ক্লাশে ঢুকে গেলো সোমনাথ।

পরের দিনও আবার দেখা হ'লো তাদের, পরের দিনও, তার পরের দিনও, এই ক'রে-ক'রে এক সপ্তাহ পরে যখন কেতকীকে সঙ্গে ক'রে সোমনাথ তার ছাত্রীর বাড়িতে নিয়ে গেলো পরিচয় করাতে, ততদিনে তাদের পরিচয়টা আরো অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। পরস্পরের কাছে অনেকখানি সহজ হ'য়ে এসেছে তারা।

দু-মাস পরে মির্জাপুরের অন্ধকার মেসের একতলার ঘরে সামান্য সর্দি-জ্বরে দু-দিনের জন্য আবদ্ধ থাকতে-থাকতে সোমনাথ এ-কথাটাই বারে-বারে উপলব্ধি করলো যে এ-সংসারে জ্ঞানত যত যন্ত্রণা সে সহ্য করেছে আজ পর্যন্ত, প্রিয়-বিরহের যন্ত্রণার মতো অসহ্য আর কিছুই নয়।

৬

এর ঠিক তিনমাস পরে কোনো-এক সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের পুকুরপাড়ে ব'সে হঠাৎ সে আবিষ্কার করলো কেতকীরা তিন পুরুষের খৃস্টান। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের মধ্যে সহস্র হাতুড়ির আঘাত পড়লো। শুকনো ঠোঁটে দু-বার জিভ বুলিয়ে, তিনবার ঢোঁক গিলে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললো, 'কই, আমি তো আগে এ-কথা জানতাম না।'

'কী জানতে না?' সরল চোখে কেতকী সোমনাথের দিকে তাকালো।

'এই— মানে— অর্থাৎ তোমরা যে খৃস্টান।'

'ঈশ্! কী একটা জানবার বিষয়। তারপর শোনো—' গল্পের বাকি অংশ শেষ করলো সে—'আমার ছোটো ভাই ডিক তখন এইটুকু বাচ্চা। আমাকে কাকা ঠেলে তুললেন ঘুম থেকে। হয়তো রাত তখন চারটে কি সাড়ে-চারটে, সবে ভোরের আলো ফুটছে। তাকিয়ে দেখলুম দু-হাতে মুখ ঢেকে মা উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছেন, কেবল তাঁর ধনুকের মতো বাঁকা পিঠটা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে। আর দেখলুম, শাদা কাপড়ের আচ্ছাদন। বাবার চোখে গভীর ঘুম। মুখে আলোর মতো হাসি। আর বুকের উপর ছোটো বাইবেল। তারপর বিকেলবেলা নিঃশব্দে এসে দরজায় কালো গাড়ি দাঁড়ালো।'

থেমে-থেমে, ধীরে-ধীরে, স্পষ্ট গম্ভীর স্বরে কবিতার লাইনের মতো শেষের কথা ক'টি উচ্চারণ করলো কেতকী।

সোমনাথ স্তব্ধ।

একটু চুপচাপ।

'তারপর থেকেই আমরা কাকার অধীন।'

'হুঁ।'

'কাকা অবিশ্যি খুব ভালোবাসেন, কিন্তু স্বাধীনতা নেই।'

'ওঠা, হাঁটা, শোয়া বসা, ফুর্তি, আনন্দ সব তাঁর ইঙ্গিতে, তাঁর ইচ্ছেতে, যেন তাঁরই হুকুমের দাসমাত্র আমরা।'

'হুঁ।'

'তবু তো আমি অনেকটা আদায় ক'রে নিই। ডিক আর মা তো ভয়েই অস্থির। টাকা আছে কিনা। আর কাকার তো ছেলেপুলে নেই, কাজেই মা-র আশা যে সব-কিছু শেষ পর্যন্ত ডিকেরই হবে।'

'ও।'

'তাই মনে হয় কোনোরকমে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি— কী হয়েছে তোমার?' এতক্ষণে কেতকী লক্ষ্য করলো সোমনাথের মন নেই তার কথায়।

'কী হবে?' একটা ঘাস ছিঁড়লো সোমনাথ।

'কী ভাবছো?'

'কিছু না। তোমার কথা শুনছিলাম।'

'শুনছিলে না হাতি।' কেতকী রাগ ক'রে মুখ ঘোরালো।

'শোনো—'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েই কেতকী জবাব দিলো, 'বলো না।'

কী যেন ভাবলো সোমনাথ তারপর একটু পরে বললো, 'চলো এবার যাই।'

'চলো।'

দু-জনেই উঠে পড়লো। পাশাপাশি হেঁটে বাইরে এলো, ট্রাম ধরলো।

তারপর তালহীন গানের মতো, ছন্দহীন কবিতার মতো কেমন একটা ব্যর্থ মনে সেদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হ'লো তাদের।

সেই রাত্রে ঘুমুতে পারলো না সোমনাথ। উঠলো, বসলো, জানলায় দাঁড়ালো, কলতলায় গিয়ে বারে-বারে জল ছিটোলো মুখে-চোখে। বারে-বারে চাবুক মারলো মনকে। এখনো, এখনো সময় আছে, সোমনাথ, সাবধান হও। মা-র কথা কি ভুলে গেলে তুমি? ভুলে গেলে, তুমি ছাড়া আর কিছু নেই, কেউ নেই তাঁর। তোমার সুখের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ, তাঁর অক্লান্ত সেবা, সকলের মন জুগিয়ে তোমার প্রতি তাঁদের মনকে আর্দ্র করবার ব্যাকুল চেষ্টা, নিজের স্বল্পাহারকে স্বল্পতম ক'রে তোমার আহার্য সমৃদ্ধ করা, প্রতিদিন প্রতি নিশ্বাসে যাঁর নির্যাস টেনে-টেনে তুমি আজ এখানে পৌঁচেছো তাঁকে কি শেষে ভুলে গেলে তুমি? শেষে কি তোমার এই হ'লো? তুমি কি জানো না জাতিধর্মে অখণ্ডবিশ্বাসী তরঙ্গিণী তোমাকেও ছাড়বেন, কিন্তু ধর্মত্যাগ ক'রে কোনোদিনই কেতকীকে গ্রহণ করতে পারবেন না?

কিন্তু প্রেমের জোর মৃত্যুর মতোই প্রবল। তাকে ঠেকাবে কে? তাই সমস্ত রাত না ঘুমিয়ে, সারাদিন মনের সঙ্গে লড়াই ক'রে বিকেল হ'তেই চঞ্চল হ'য়ে উঠলো সে। হঠাৎ একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্র্যাকেট থেকে টেনে একটা জামা গায়ে দিলো, তারপর প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

শুধু চোখের দেখায় তো আর মানুষের ধর্মপতন হয় না!

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হ'লেই পরীক্ষা আরম্ভ। কাজেই এবার আর দেশে যাবে না স্থির করলো সোমনাথ। বাস্তবিকই পড়াশুনোয় অনেক শৈথিল্য ঘ'টে গেছে তার। কিন্তু ছুটির দিন তিনেক আগে একদিন নেপেনদা এসে হাজির— 'কী রে? তুই নাকি দেশে যাবিনে?'

নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে দেখে সোমনাথ অবাকও হ'লো, খুশিও হ'লো।

'বসুন, বসুন। আপনি যাচ্ছেন বুঝি ?'

'তাই তো। চিনি-খুড়িমা চিঠি লিখেছেন যে—'

'মা ? কী লিখেছেন ?' মা-র খবর জানতে উৎসুক হ'লো সোমনাথ।

'কী আর। তুই যাবিনে, তাই তাঁর মন খারাপ।'

সোমনাথ একটু চুপ ক'রে রইলো, তারপর বললো, 'সে তো জানিই। মাকে আমি সেজন্যেই খুলে লিখেছি সব।'

পিঠে চাপড় দিয়ে নেপেন বললো, 'আরে চল চল, একবার ঘুরে আসবি।'

'না, নেপেনদা, বড়ো ক্ষতি হবে পড়াশুনোর।'

'তোর মা-র মন কি মানবে। তোকে না-দেখলে তাঁর দুনিয়া অন্ধকার।'

সোমনাথেরও মন-কেমন করলো মা-র জন্য। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনি বুঝিয়ে বলবেন।'

'আরে তার দরকার নেই, তার দরকার নেই, তিনি বুঝেরই মানুষ। আমি যেন তোকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাই, এ-হুকুম দেন নি তিনি। আমি তার জন্যেও আসিনি, যেন স্বচক্ষে একবার দেখে যাই তাঁর পুত্রটিকে এ-কথাই লিখেছেন তোর বৌদির মারফত। তা তোর চেহারা তো দেখছি খুব ভালো হয়েছে। ভালোই আছিস, কী বলিস ?'

সোমনাথ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলো, একটু চমকালো, একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো নেপেনের দিকে।

'কবে যাচ্ছেন আপনি ?'

'এই দু-চার দিনের মধ্যেই। পরশু ছুটি হবে। তারপর টুকটাক যা দু-একটা কাজ, সামান্য কেনাকাটা— তা আমি বলি কী না-হয় হপ্তা দুয়ের জন্যই চল না একবার, দেখা ক'রে আসবি।'

'আমার যে পড়াশুনো একদম হয় নি—'

'আরে ও হ'য়ে যাবে।'

'তাহ'লে—'

'তাহ'লে আর কিছু না, আমি যেদিন যাবো, সেদিনই চল। কিছু ক্ষতি হবে না।'

নৃপেন চ'লে যাবার পরে সোমনাথ ভালো ক'রে নিজের মন পরীক্ষা ক'রে দেখলো কেন সে যেতে চাইছিলো না। সত্যিই কি পড়াশুনোর কথা ভেবেই, না আর কিছু? হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেলো।

পরের দিন কেতকীর সঙ্গে দেখা হ'তেই বললো, 'আমি দেশে যাচ্ছি কেকা।'

'দেশে। কেন?' অবাক চোখে ভুরু কুঁচকোলো কেতকী।

'একবার দেখা ক'রে আসি মা-র সঙ্গে।'

'ও।'

'বেশিদিন থাকবো না। পড়াশুনো তো বলতে গেলে কিছুই করি নি সারা বছর।'

'হুঁ।'

'তুমিও বরং তোমার মা-র কাছে একবার ঘুরে এসো না।'

'যাবো।'

এর পরে আর কোনো কথা ভেবে পেলো না সোমনাথ। কেতকী মুখ ভার ক'রে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ পরে সোমনাথ বললো, 'রাগ করলে?'

'রাগ কেন? বা রে!'

'তবে কথা বলছো না?'

'কী বলবো। সব সময়ে ভালো লাগে না কথা বলতে।'

'তবে থাক কথা।' একটু মন ভারি সোমনাথেরও হ'লো বৈকি।

কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে স্টেশনে এসে ছেলেমানুষের মতো কান্না পেলো সোমনাথের। মাকে দেখবার আগ্রহকে ছাপিয়ে যে কেতকীর বিচ্ছেদ-বেদনাই এমন প্রবল হ'য়ে উঠলো এটা ভেবে-ভেবেই যেন দুঃখ হ'লো বেশি। কেমন একটা ধাক্কা লাগলো হৃদয়ে। তবে কি এতদিনের মা, এই দু-দিনের মানুষটির কাছে হেরে গেলেন? এর চেয়ে দুঃখ তবে আর কী আছে জীবনে? নেপেনদা খুশি মুখে এটা কিনছেন ওটা কিনছেন, একবার নামছেন, একবার উঠছেন, পরিপাটি ক'রে বিছানা পাতছেন জায়গা জুড়ে, এই ছুটতে-ছুটতে গিয়ে কুঁজোভর্তি জল নিয়ে এলেন, আবার তক্ষুনি ছুটলেন পাখা আনতে। একটা আনন্দের জোয়ার। যেন ফুটছেন টগবগ ক'রে।

সোমনাথও নামলো একবার, প্রচণ্ড ইচ্ছে হ'লো একছুটে পালিয়ে যায় স্টেশন থেকে। মনকে শায়েস্তা ক'রে আবার উঠে বসলো তক্ষুনি। ঘণ্টা দিলো গাড়িতে, গার্ড নিশেন উড়িয়ে চ'লে গেলো। হুইসিল বাজিয়ে গাড়ি ছাড়লো ঝক্‌ঝক্ ক'রে। জানলা দিয়ে পরিত্যক্ত স্টেশনের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কখন চোখ নিবিড় হ'য়ে অন্ধকারে ডুব দিলো। কেবল জোনাকি আর জোনাকি। ঝোপ আর ঝাড়, সোমনাথের মনের মতোই দুর্ভেদ্য অরণ্যে রোদন।

দেশে এসে মা-র সান্নিধ্যলাভের পরেও সেই বিষণ্ণতা কাটলো না সোমনাথের। তারপর কেয়ার অব পোস্টমাস্টারের ঠিকানায় যখন ঘন-ঘন নীল রঙের মোটা থাম আসতে লাগলো রঙে রসে পরিপূর্ণ হ'য়ে, তখন মুখে হাসি ফুটলো তার। মা-র সঙ্গে হৃদ্যতা গভীর হ'লো, ঠাকুরমার সঙ্গেও দু-চারটে অপটু ঠাট্টায় গলদঘর্ম হ'লো।

কেতকীর সঙ্গে বিরহের একমাত্র সান্ত্বনা সেই ঘন-ঘন নীল খামের ভেতরকার পত্র-প্রলাপ তাদের পরস্পরকে যেন আরো নিবিড় হবার সুযোগ দিলো। যে-কথা যে-মন এতদিনের লক্ষ-লক্ষ কথাতে বলতে পারে নি, চিঠির নীরব অক্ষর অনায়াসে তা উন্মুখ ক'রে দিলো দু-জনের কাছে।

তারপর যে একটা মাস সে দেশে রইলো সমস্তটা হৃদয় ঘড়ির কাঁটার মতো থরথর ক'রে কাঁপলো, সমস্তটা সময় একটা মধুর বিরহ বেদনায় পরিপক্ক ফলের মতো পরিপূর্ণ হ'য়ে রইলো। আবার একদিন গুরুজনদের প্রণাম ক'রে বেলপাতা কানে গুঁজে মা-র জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে ফেরবার সময় হ'লো সোমনাথের। যাবার আগের মুহূর্তে কী জানি কেন হঠাৎ সে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তরঙ্গিণীকে। মা ছোটো হ'য়ে গেছেন, এইটুকু একটা একমুঠো মানুষ। ফর্শা, রোগা, অসহায় আর মিষ্টি। মা-র ঘাড়ের কাছে আঙুর-থোবার মতো কালো চুলে হাত ডুবিয়ে সরু শাদা বিধবা সিঁথিতে গাল ঠেকিয়ে হৃদয় যেন তার ভেঙে গেলো। মা, মা, তার মা, তার ছোট্ট আর শান্ত আর দুঃখিনী মা। তার মেয়ে। তরঙ্গিণীর গাল বেয়ে জলের ধারা নামলো। কতদিন আগে, এমনি ক'রে তরঙ্গিণীর বাবা একদিন তাকে বুকে জড়িয়ে মাথায় চুমু খেয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। মনে পড়লো সেই কথা। মাতৃহীন তরঙ্গিণীর চোখে সেদিন

এমনি ক'রেই ধারা নেমেছিলো। সেদিন তাঁর কপালে চন্দন ছিলো, সিঁথিতে লাল সিঁদুর, পরনে লাল চেলি। আঁচলে গিঁট বেঁধে সোমনাথের বাবা নিয়ে এসেছিলেন এই বাড়িতে। বেয়াল্লিশ বছরের বাবার বুকে মাথা রেখে সেদিন যে বিচ্ছেদ বেদনায় সমস্ত হৃদয় তাঁর মথিত হয়েছিলো, আজ পঁচিশ বছর পরে তেইশ বছরের ছেলের বুকে মাথা রেখেও তাঁর বুকটা যেন ঠিক তেমনি স্বরে কেঁদে উঠলো। এ কেমন বিদায়?

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ছেলের মাথায় হাত রাখলেন। মনে-মনে ঈশ্বর স্মরণ করলেন। আর তো মাত্র দুটো মাস, তারপরেই আবার সোমনাথ ফিরে আসবে তাঁর বুকে। তবে কেন তাঁর মন এমন ব্যাকুল হ'লো আজ? আহা, সোনা আমার। মানিক আমার। আমার বুক-জুড়োনো ধন। ভালো থেকো, ভালো থেকো। বারে-বারে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন তিনি।

৮

কলকাতা ফিরে এসে আর কোনোদিকে মন দিলো না সোমনাথ। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, চিন্তা-ভাবনা সব-কিছুর উপর একটি কালো পর্দা ফেলে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো একমাত্র পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই ভাবলো না। যতটা ক্ষতি হয়েছিলো, তার দ্বিগুণ সে পূরণ ক'রে নিলো ঐটুকু সময়ে।

পরীক্ষার পরেই একজন প্রোফেসরের দয়ায় একটি ভালো চাকরির তদ্বিরের সুযোগ পেলো, ফল বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে বহাল হ'তেও দেরি হ'লো না। বলাই বাহুল্য প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সোপান অতিক্রম করলো সে।

যা চেয়েছিলো, যেমন ক'রে চেয়েছিলো, ধাপে-ধাপে সবই ঈশ্বর

দিলেন তাকে। এইবার মা। এইবার একটি বাড়ি ভাড়া ক'রে মাকে এনে প্রতিষ্ঠিত করা। সে আর কে? সে তো তার মা-রই। মা-রই প্রতিলিপি। তবু মনে-মনে অস্থিরতা কাটে না সোমনাথের। তবু শান্তি নেই। মা এলেই কি সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে? একলা ঘরে দেয়ালে মাথা ঠোকে মনে-মনে।

তারপর কোনো-এক সন্ধ্যায় কার্জন পার্কের ঘাসে ব'সে আসল কথাটি উত্থাপন করলো কেতকী।

'আর কতদিন এভাবে কাটবে?'

সোমনাথ চমকে উঠলো।

'তোমার মাকে এইবার জানাও।'

'কী! কী জানাবো?'

'তা কী তুমি জানো না?'

'ও।'

'আমিও আমার মাকে বলি। রাজি হ'লে ভালো, না হ'লে—'

'না হ'লে কী হবে?'

'কী আর হবে। বাধ্য হ'য়ে ওঁদের অমতেই।'

'অমতেই?'

'উপায় কী!'

'না, না, ছি।'

'কী ছি?'

'গুরুজনদের অমতে— মানে…'

'গুরুজনদের অমতে বুঝি আর সবই করা যায়, কেবল বিয়েটা ছাড়া?'

'না, না, তা কেন?'

‘তাই তো বলছো।’

‘আমি— আমি বলছিলাম কী, ওঁদের মত থাকা দরকার।’

‘সে তো নিশ্চয়ই।’

‘তাই— তাই বলছিলাম—’

‘যদি ওঁরা মত না দেন, তাহ’লে ?’

‘তাহ’লে ?’ সোমনাথ আকাশের দিকে তাকালো— যেন সেখানে উত্তর লেখা আছে।

‘তাহ’লে কী করবে তুমি ?’

‘তুমি ? তুমি কী করবে ?’

‘আমার কথা বারে-বারে শুনলে কি তোমার মনে জোর আসবে ?’

সোমনাথ চুপ ক’রে রইলো। একটু অপেক্ষা ক’রে সহসা কেতকী উত্তপ্ত হ’য়ে বললো, ‘কিছু বলছো না কেন ?’

‘কী বলবো ?’

‘কিছু বলবার নেই ?’

সোমনাথ চুপ।

আস্তে-আস্তে অন্ধকার গাঢ় হ’লো, তার ছায়া পড়লো নাগকেশরের ডালের ফাঁকে, ছোটো-ছোটো লাল নীল ফুলের পাপড়িতে। লোকজন বিরল হ’য়ে এলো, গঙ্গার হাওয়া ঝাপটা দিলো গড়ের মাঠের প্রশস্ত বুকে।

নিশ্বাস নিলো সোমনাথ।

‘তোমরা তো খৃস্টান, না ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমরা হিন্দু।’

‘জানি।’

'আমার মা—'

'তা-ও জানি।'

'তবে ?'

'তবে— তবে কী সোমনাথ ?' কেতকীর গলা কেঁপে উঠলো থরথর ক'রে।

'কেকা, আমার মা-র কথা তো তুমি সবই শুনেছো।'

কেতকী হাঁটুতে মুখ লুকোলো।

'তোমাকে বিয়ে করলে মা আমাকে ত্যাগ করবেন।'

'শুধু কি তাঁর কথাই ভাববে ? আমার কথা ভাববে না ?'

'তা-ও ভাবি, কেতকী। কিন্তু কিছুই কিনারা করতে পারি না। তোমার মাকে জিগেস ক'রে দেখো তিনি কী বলেন।'

'আমার মা-র মত হবে না, তা আমি জানি।'

'আর কাকা—'

'তিনিও মত দেবেন না।'

'তুমি কি তবে তাঁদের অমতেই—'

'আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের অনুষ্ঠানটুকু ছাড়া আর কী বাকি, সোমনাথ ? এতদিন তো তাঁদের কথা ভাবি নি আমরা—'

'আমার মা-র দুঃখের ইতিহাস তুমি জানো না। আমি ছাড়া তাঁর কেউ নেই, কিছু নেই—' সোমনাথের গলা ধ'রে এলো।

'জানি—' হাঁটু থেকে মুখ তুলে চকচকে চোখে সোমনাথের মুখে দৃষ্টি স্থির করলো কেতকী। '—তিনি তোমার জন্য অনেক করেছেন, অনেক ত্যাগ, অনেক দুঃখ, অনেক সহ্য— কিন্তু সন্তানের জন্য মায়ের এই সমর্পণ কি একটা খুব আশ্চর্যের বিষয় ? সে-ধৈর্য, সে-শক্তি তো ঈশ্বরই তাঁদের মধ্যে দিয়ে দেন। তা নৈলে সৃষ্টি থাকে না। কিন্তু আমি ? আমি

তোমার কে ? আমি যে দিনের পর দিন তোমার জন্য এমন উন্মুখ ক'রে রেখেছি নিজেকে, মান-সম্মান, নিন্দে-প্রশংসা, স্বধর্ম, স্বজাতি সব, সব ছাড়তে প্রস্তুত করেছি নিজেকে, তার ঋণ তুমি শুধবে কী দিয়ে ?' কেতকী উঠে দাঁড়ালো, 'আজই তবে সব শেষ হোক।'

'কেকা—' কেতকীর আঁচলটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলো সোমনাথ, 'শান্ত হও, শোনো—'

কেতকী আঁচলটা ছাড়িয়ে নিলো, 'মা তোমাকে স্নেহ দিয়ে ভ'রে রেখেছেন, তার মধ্যে তাঁর আবার আশার বীজ লুকোনো আছে, জল-সিঞ্চন করলে এই বীজই একদিন গাছ হ'য়ে ফলে ফুলে তাঁর জীবন ভ'রে দেবে। আমার কী স্বার্থ! ভালোবাসি, শুধু তো এই ?'

'কেকা—'

'সোমনাথ, আমি ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি তুমি আমাকে এড়িয়ে বেড়াও। তার দরকার কী ? আমি নিজেই স'রে যাবো তোমার জীবন থেকে।'

'শোনো, শোনো কেতকী।'

'না, এ-ভাবে আমি আর তোমার সঙ্গে দেখা করবো না। ভারি বিশ্রী, ভারি অশোভন। আমি আর নিজেকে অসম্মান করতে পারবো না।'

'কেকা শোনো, আমার কথা শোনো—' ব্যাকুল আগ্রহে দু-হাতের আকর্ষণে কেতকীকে কাছে টেনে নিলো সোমনাথ, 'আমাকে দয়া করো, আমাকে সময় দাও, আমাকে বাঁচাও—'

কেতকী বসলো। আস্তে তার মাথার চুলে বিলি কাটতে-কাটতে বললো, 'শান্ত হও, শান্ত হও, যা ভালো বোঝো তা-ই করো, যা তোমার ভালো লাগে তা-ই হোক। আমি আছি, আমি তোমারই, আমার সমস্ত জীবন তোমার, সমস্ত আশা তোমার।' গুনগুন ক'রে গানের মতো বলতে

লাগলো কেতকী। সোমনাথের এতদিনের রুদ্ধ যন্ত্রণা বরফের মতো গ'লে-গ'লে ঝ'রে পড়লো গাল বেয়ে বুক বেয়ে।

৯

এর পরে মনস্থির করলো সোমনাথ। না, আর দেরি নয়। কেতকী ঠিকই বলেছে।

দু-সপ্তাহ পরে একদিন তাকে নিয়ে রেজিস্ট্রি আপিশে গিয়ে বিয়ে ক'রে এলো। জনকয়েক বন্ধু মিলে সাক্ষী হ'লো। ছোটোখাটো একটি পার্টিও হ'লো চায়ের। খবরটা মাকে জানালো না, জানাতে পারলো না কিছুতেই। মনে-মনে ভাবলো এখন থাক, কোনো অবসরে, সুযোগ-মতো নিজে গিয়েই সব ভালো ক'রে বুঝিয়ে আসবে। একটা চিঠিতে আর কতটুকু বলা যায়? তরঙ্গিণী অবুঝ নন। খুলে বললে নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করবেন, গ্রহণও করবেন।

দু-জনে মিলে প্রাণপণে বাড়ি খুঁজে বার করলো একটি। কেতকী তার টিউশনির টাকায় হাঁড়িকুড়ি হাতাখুন্তি কিনলো, ঘর সাজাবার সরঞ্জামও কিনলো কিছু, আর হাতের বালা বন্ধক দিয়ে সংসার পাতলো। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সোমনাথ ছাড়িয়ে আনলো সেই বালা। তরঙ্গিণী চিঠি লিখলেন, 'তোমার চাকরির খবরে এখানে সবাই খুব সুখী হয়েছেন। এবার তুমি ধীরে-আস্তে ভালো পাড়ায়, ভালো একটি বাড়ি ভাড়া নেবার চেষ্টা কোরো। মেসে হোটেলে এ-ভাবে কতদিন আর কাটাবে। আমিও আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না।' পুনশ্চ দিয়ে লেখা, 'তুমি কি মাইনে পেয়েছো? যদি তোমার নিজের খরচপত্র কুলিয়ে, অসুবিধে না হয় তাহ'লে আমাকে গোটা কয়েক টাকা পাঠিয়ো;

তোমার প্রথম চাকরির টাকায় সামান্য ভোগ দিতে চাই গোবিন্দকে। আর তোমার দাদু আর ঠাকুরমাকেও প্রণামী পাঠিয়ো কিছু।'

চিঠি হাতে নিয়ে সোমনাথ লুকিয়ে-লুকিয়ে চোখের জল মুছলো, মন-খারাপ ক'রে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ালো। বাড়ি সে নিয়েছে, ভালো পাড়ায় ভালো বাড়িই নিয়েছে, কিন্তু সে-বাড়িতে হয়তো কোনোদিনই মা আসতে পারবেন না। টাকাটা কোনোরকমে জোগাড় ক'রে পাঠিয়ে দিলো।

কিন্তু কেতকীকে বিয়ে ক'রে সে যত সুখী হয়েছিলো তার কোনো তুলনা ছিলো না, তাই এই মন-খারাপও স্থায়ী হ'লো না, মনের মেঘ মুহূর্তে কোথায় ভেসে গেলো। এই উচ্ছ্বসিত জীবনের মাঝখানে কালো ছায়া ফেলবে এমন সাধ্য কার আছে? দিন কাটে নেশার মতো, রাত একটা গানের গুনগুন। চোদ্দ অক্ষরের ঠাসবুনোনের পয়ার ছন্দ। জীবন যে এত মধুময়, জগৎ-সংসার যে এত সুন্দর, এ-কথা সে কেমন ক'রে উপলব্ধি করতো যদি না বুকের মধ্যে কেতকীকে পেতো? বিয়ে করবার আগের মুহূর্তেও সোমনাথ ভাবতে পারে নি, একটা মানুষের শারীরিক সান্নিধ্যে এত আলো, এত আনন্দ।

কেতকীর মা-ও মত দেন নি এই বিয়েতে। সেই একই আপত্তি। জাত-খৃস্টান হ'য়ে হিন্দুর ছেলে বিয়ে ক'রে শেষে কি নরকে যাবে তাঁর মেয়ে? কেন, ব্যাপ্টাইজড হ'তে বাধা কী? হাতে পেয়েও, মুঠোয় এনেও মেয়েটা ত্রাণ করবে না লোকটিকে? স্বর্গের রাস্তা বাৎলে দেবে না? ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের কথা ভাবতে শেখাবে না? তবে ধিক্ তাকে। তবে তুমি কিসের জন্য এই পবিত্র খৃস্টকুলে জন্মগ্রহণ করেছো, শুনি? এটুকুও ধর্মজ্ঞান নেই তোমার? ও যীশু, যীশু— কেতকী মা-র কথা বলতে-বলতে হেসে ফেলেছিলো। এ-সব ধর্মের বুলি সে সইতে

পারে না, তার হাসি পায়, রাগও হয়। কিন্তু সোমনাথ হাসে নি, হাসতে পারে নি; হঠাৎ নিজের মা-র কথা মনে প'ড়ে মন-খারাপ হ'য়ে গিয়েছে।

মা-র বন্ধন ছিন্ন ক'রে, কাকাকে লঙ্ঘন ক'রে যত অনায়াসে কেতকী চ'লে আসতে পেরেছে তার কাছে, সে তা পারে নি। ভরা হৃদয়ের ফাঁকে-ফাঁকে কোথায় যেন একটা শূন্যতাও অনুভব করেছে মনে-মনে। কোথায় যেন একটা বেদনার টনটনানি।

মাস কয়েক পরে কেতকী বললো, 'তুমি আজকাল এমন ভার হ'য়ে থাকো কেন? তার চেয়ে একবার যাও না মা-র কাছে। মাকে তুমি এখানে নিয়ে এসো গিয়ে, এলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'আনবো?' সোমনাথ খুশি হ'য়ে ওঠে, তার আশা হয়, কিন্তু কী ভেবে আবার ভয়ও হয় মনে। তবু তো এখন আশা আছে, তারপর যদি সেটুকুও না থাকে?

যাবে-যাবেই করছিলো, আবেদনও পাঠিয়েছিলো ছুটির জন্য। এর মধ্যেই একটা টেলিগ্রাম এলো। তরঙ্গিণীর অসুখ। প্রাণ মুহূর্তে আকুল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু মুশকিল হ'লো কেতকীকে নিয়ে। ক'দিন থেকেই তার শরীর অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছিলো, ডাক্তার বললেন সন্তানসম্ভবা।

'ও মা, তাতে কী হয়েছে?' কেতকী আশ্বাস দিলো, 'তুমি এখুনি চ'লে যাও। আমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। বৃন্দাবনই তো রয়েছে।'

'তবু—'

'তোমার যত বাজে চিন্তা। বেশ তো, রমেনবাবুকে ব'লে যেয়ো, তিনি আসবেন খবর নিতে—' (রমেন সোমনাথের বন্ধু। বিয়ের সাক্ষী) 'আর সম্ভব হ'লে অবস্থা বুঝে মাকে এখানে নিয়েই চ'লে এসো। তুমি দেখো, মা কিছুই বলবেন না, দু-দিনে আমি তাঁকে ঠিক ক'রে নেবো।'

তোমার প্রথম চাকরির টাকায় সামান্য ভোগ দিতে চাই গোবিন্দকে। আর তোমার দাদু আর ঠাকুরমাকেও প্রণামী পাঠিয়ো কিছু।'

চিঠি হাতে নিয়ে সোমনাথ লুকিয়ে-লুকিয়ে চোখের জল মুছলো, মন-খারাপ ক'রে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ালো। বাড়ি সে নিয়েছে, ভালো পাড়ায় ভালো বাড়িই নিয়েছে, কিন্তু সে-বাড়িতে হয়তো কোনো-দিনই মা আসতে পারবেন না। টাকাটা কোনোরকমে জোগাড় ক'রে পাঠিয়ে দিলো।

কিন্তু কেতকীকে বিয়ে ক'রে সে যত সুখী হয়েছিলো তার কোনো তুলনা ছিলো না, তাই এই মন-খারাপও স্থায়ী হ'লো না, মনের মেঘ মুহূর্তে কোথায় ভেসে গেলো। এই উচ্ছ্বসিত জীবনের মাঝখানে কালো ছায়া ফেলবে এমন সাধ্য কার আছে? দিন কাটে নেশার মতো, রাত একটা গানের গুনগুন। চোদ্দ অক্ষরের ঠাসবুনোনের পয়ার ছন্দ। জীবন যে এত মধুময়, জগৎ-সংসার যে এত সুন্দর, এ-কথা সে কেমন ক'রে উপলব্ধি করতো যদি না বুকের মধ্যে কেতকীকে পেতো? বিয়ে করবার আগের মুহূর্তেও সোমনাথ ভাবতে পারে নি, একটা মানুষের শারীরিক সান্নিধ্যে এত আলো, এত আনন্দ।

কেতকীর মা-ও মত দেন নি এই বিয়েতে। সেই একই আপত্তি। জাত-খৃস্টান হ'য়ে হিন্দুর ছেলে বিয়ে ক'রে শেষে কি নরকে যাবে তাঁর মেয়ে? কেন, ব্যাপ্টাইজড হ'তে বাধা কী? হাতে পেয়েও, মুঠোয় এনেও মেয়েটা ত্রাণ করবে না লোকটিকে? স্বর্গের রাস্তা বাৎলে দেবে না? ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের কথা ভাবতে শেখাবে না? তবে ধিক্ তাকে। তবে তুমি কিসের জন্য এই পবিত্র খৃস্টকুলে জন্মগ্রহণ করেছো, শুনি? এটুকুও ধর্মজ্ঞান নেই তোমার? ও যীশু, যীশু— কেতকী মা-র কথা বলতে-বলতে হেসে ফেলেছিলো। এ-সব ধর্মের বুলি সে সইতে

পারে না, তার হাসি পায়, রাগও হয়। কিন্তু সোমনাথ হাসে নি, হাসতে পারে নি; হঠাৎ নিজের মা-র কথা মনে প'ড়ে মন-খারাপ হ'য়ে গিয়েছে।

মা-র বন্ধন ছিন্ন ক'রে, কাকাকে লঙ্ঘন ক'রে যত অনায়াসে কেতকী চ'লে আসতে পেরেছে তার কাছে, সে তা পারে নি। ভরা হৃদয়ের ফাঁকে-ফাঁকে কোথায় যেন একটা শূন্যতাও অনুভব করেছে মনে-মনে। কোথায় যেন একটা বেদনার টনটনানি।

মাস কয়েক পরে কেতকী বললো, 'তুমি আজকাল এমন ভার হ'য়ে থাকো কেন? তার চেয়ে একবার যাও না মা-র কাছে। মাকে তুমি এখানে নিয়ে এসো গিয়ে, এলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'আনবো?' সোমনাথ খুশি হ'য়ে ওঠে, তার আশা হয়, কিন্তু কী ভেবে আবার ভয়ও হয় মনে। তবু তো এখন আশা আছে, তারপর যদি সেটুকুও না থাকে?

যাবে-যাবেই করছিলো, আবেদনও পাঠিয়েছিলো ছুটির জন্য। এর মধ্যেই একটা টেলিগ্রাম এলো। তরঙ্গিণীর অসুখ। প্রাণ মুহূর্তে আকুল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু মুশকিল হ'লো কেতকীকে নিয়ে। ক'দিন থেকেই তার শরীর অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছিলো, ডাক্তার বললেন সন্তানসম্ভবা।

'ও মা, তাতে কী হয়েছে?' কেতকী আশ্বাস দিলো, 'তুমি এখুনি চ'লে যাও। আমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। বৃন্দাবনই তো রয়েছে।'

'তবু—'

'তোমার যত বাজে চিন্তা। বেশ তো, রমেনবাবুকে ব'লে যেয়ো, তিনি আসবেন খবর নিতে—' (রমেন সোমনাথের বন্ধু। বিয়ের সাক্ষী) 'আর সম্ভব হ'লে অবস্থা বুঝে মাকে এখানে নিয়েই চ'লে এসো। তুমি দেখো, মা কিছুই বলবেন না, দু-দিনে আমি তাঁকে ঠিক ক'রে নেবো।'

তবু খুঁতখুঁত করলো সোমনাথ। তারপর খুঁজে-পেতে একটা চেনা-জানা বুড়ি ঝি এনে বহাল ক'রে রওনা হ'লো।

১০

ভিড়, ভিড়। অসম্ভব ভিড়। এত ভিড় কেন আজ? অবিশ্যি ঢাকা মেল আবার ভিড়শূন্য কবে? তবু আজকের ভিড় যেন অসহ্য বোধ হ'লো সোমনাথের। মন বিরক্তিতে ভ'রে উঠলো। এমনকি, গাড়িটা ছাড়ছে না ব'লেও ভীষণ রাগ হ'লো তার। মনে হ'লো তাকে জ্বালাবার জন্যই যেন পণ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে এই যন্ত্রদানব। কিন্তু সত্যি তা নয়, গাড়ি ছাড়লো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে? লোক-জনের কিচিরমিচিরের অন্ত নেই। এরা কি আজ সারারাতই কোলাহল করবে নাকি? কোলাহলও বন্ধ হ'লো খানিকক্ষণের মধ্যেই, গাড়ির একটানা শব্দ ছাড়া অন্য সব শব্দ মুছে গেলো পৃথিবী থেকে। এই চাপাচাপি গুঁতোগুঁতির মধ্যেও কী কৌশলে হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়লো সব। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে তাতেও বিরক্ত বোধ করলো সোমনাথ। মানুষ তো মানুষই, এমন জন্তু-জানোয়ারের মতো যেমন-তেমন ক'রে শোয় কী ক'রে? যদি বা শোয় ঘুমোয় কী ক'রে?

আলো-জ্বলা, ঘুমে-ভরা কামরা থেকে মুখ ফিরিয়ে চোখ রাখলো বাইরে। তারপর কখন সেই জন্তু-জানোয়ারের মতো তারও চোখে তন্দ্রা নেমে এলো। স্রোতের মতো গাড়ির একটানা দোলানিতে বোধহয় ছেলেবেলার মায়ের কোলের ঝাঁকানির আস্বাদ আছে, গাড়ির একটানা আওয়াজে ঘুম-পাড়ানি গান। জানলার কাঠে মাথা রেখে তার তন্দ্রা

ঘুমের গভীরে পৌঁছলো। ভাঙলো যখন তখন ভোর চারটের শিরশিরানি, পদ্মার বুক-জুড়োনো প্রাণ-জুড়োনো ঠাণ্ডা হাওয়া।

গাড়ি থামলো গোয়ালন্দে। রাশি-রাশি কুলির স্রোত ঝিকির দিয়ে উঠে পড়লো গাড়িতে, তার পরেই যে কে কোনখান দিয়ে কার মাল টেনে নিয়ে হাওয়া, তার সন্ধানেই অস্থির হ'য়ে যেন পিলপিল ক'রে যাত্রীরা সব ছুটতে লাগলো। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো সোমনাথ, চোখ মুছতে-মুছতে নেমে পড়লো তাড়াতাড়ি।

রেল-লাইন থেকে পদ্মা এখন বহুদূরে, জল নেমে গেছে। আবার আষাঢ় শ্রাবণ মাসে লাইনের উপরেই থৈথৈ করবে জলরাশি, স্টিমার একপায়ের রাস্তা। অন্ধকারে চোখ দিয়ে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলো কুলিটিকে ; কখন সে চ'লে গেছে কতদূরে কে জানে।

স্টিমারে উঠলো এসে। সিঁড়ি দিয়ে কি ওঠা যায়? লোকের চাপে এগোনোই দায়। কিন্তু দোতলায় উঠেই মন খুশি। একলা একটি কোণে, ডেকের উপর, সুজনি বিছিয়ে বালিশ দিয়ে জায়গা আটকে রেখেছে কুলি, তাকে দেখেই একগাল হাসি, 'এই তো আমি বাবু, আইয়েন, এইদিগে আইয়েন।' ওরা ঠিক জানে কোন যাত্রী কোথায় বসবে, কী-রকম তার পছন্দ। তাছাড়া কতবার এলো গেলো, হয়তো চেনেও সোমনাথকে।

আলো ফুটছে একটু-একটু, ঝাউপাতার মতো ঝাপসা-ঝাপসা দৃশ্য। মুখ দেখা যায় সেই অস্পষ্ট আলোয়।

'বকশিস দিবেন কৈলে, কেমন নিরালা জাগা বাইছা দিছি।' আবার একগাল হাসি। বয়স তার উনিশ-কুড়ি, রং পরিষ্কার, কচি সুন্দর মুখ। সোমনাথ পকেট থেকে চার আনার বদলে পুরো

একটি টাকা গুঁজে দিলো হাতে। ভোরের স্পর্শ মনের গ্লানি মুছে নিয়েছে।

এই ট্রেন থেকে নামা, এই সকাল, সকালের এই গন্ধ, হাওয়া, পদ্মার শীতলতা, কুলি, কুলিদের বন্ধুতা, সব জানে সোমনাথ। এই ক'বছরে কতবার এলো গেলো, কতবার কত ঋতুতে। সব সময়েই এই সকালটি তার অদ্ভুত ভালো লাগে। রেলিঙে ভর দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। আস্তে-আস্তে আবির ছড়ালো জলে ; ধীরে-ধীরে, তিলে-তিলে, ভাঁজে-ভাঁজে রং ছিটিয়ে পশ্চিম আকাশে স্পষ্ট হ'য়ে সাতটি রং খেলা করলো খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ পুবের দিগন্তরেখা বিদীর্ণ ক'রে লাফ দিয়ে উঠে এলো মেজেণ্টা রঙের গোলগাল প্রকাণ্ড সূর্য।

ভোর হ'লো। সোমনাথ খাবার ঘরের সামনে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিলো খানসামাকে।

১১

স্টিমার লেট হয়েছিলো। তারপাশা পৌঁছতেই বেলা বারোটা। নৌকো ক'রে বাড়ি আসতে-আসতে প্রায় বিকেল।

কৃষ্ণদাস তখনো ফেরেন নি দপ্তর থেকে, ঠাকুরমারও পাড়া-বেড়ানো শেষ হয় নি। বারান্দায় ব'সে তরঙ্গিণী চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন একটি মেয়ের। পাশে ছোট্ট গন্ধ তেলের বাটি, কাঠের হেলানো আয়না সামনে, রঙিন জাপানি টিনের বাক্সে কাঁটা, ফিতে, খোঁপার রুপোর ফুল। লম্বা চুল আঁচড়ে-আঁচড়ে মসৃণ সাপের মতো চ্যাপ্টা চওড়া আটগুছির বিনুনি পাকাতে-পাকাতে তিনি ফিরে তাকালেন।

সোমনাথ মাকে দেখে অবাক হ'লো। আর মা ছেলেকে দেখে হাসি-মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসেছিস?' মেয়েটি মুখ তুলে তাকালো একপলক, তারপর আস্তে-আস্তে চ'লে গেলো ঘরের মধ্যে।

'তোমার অসুখ—'

'হ্যাঁ, আয়।' ছেলের মাথায় তিনি হাত রাখলেন, 'দু-দিন সামান্য জ্বর হয়েছিলো। বিশেষ কিছু না—'

'এখন ভালো আছো?'

'আছি।'

সোমনাথকে নিয়ে তিনি নিজের ঘরে এসে বসলেন।

ভূমিকা ক'রে খুব বেশি সময় নষ্ট করলেন না তরঙ্গিণী। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শেষ ক'রে চা খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'তেই আসল কথাটা তিনি পাড়লেন ছেলের কাছে। নরম গলায় জিগেস করলেন, 'কেমন চাকরি?'

একটু হেসে হাই তুলে সোমনাথ বললো, 'কেমন আর। চাকরি সবই সমান।'

'ছুটি ক'দিনের?'

'দু-সপ্তাহ।'

'দু-সপ্তাহ?' একটু চিন্তা করলেন। 'আর কিছুদিন বাড়াতে পারিস না?'

'এই কত কাণ্ড ক'রে—' কেতকীর কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে প্রাণটা ছটফট ক'রে উঠলো সোমনাথের। এতক্ষণ একা-একা কী জানি ভাবছে ও, কত যেন খারাপ লাগছে।

বড়ো-বড়ো চোখের শান্ত দৃষ্টি ছেলের দিকে তুলে তরঙ্গিণী আস্তে ডাকলেন, 'খোকা।'

'মা।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বুঝতেই পারছিস এই সামান্য দু-দিনের জ্বরের জন্যেই আমি তোকে অতদূর থেকে অত খরচ করিয়ে টেলিগ্রাম ক'রে আনি নি। অন্য কারণ আছে তার।'

'অন্য কারণ? কী, মা?'

'আমি তোর বিয়ে ঠিক করেছি।'

'বিয়ে!'

'হ্যাঁ। তারিখ-টারিখও আমি দেখে রেখেছি, এই চোদ্দ দিনের মধ্যেই যা হোক নমোবিষ্ণু ক'রে সেটা তোকে সেরে যেতে হবে, তারপর সময় সুযোগ-মতো লোকজন ডেকে খাওয়ানো-দাওয়ানো বা কোনো উৎসব করা—'

'মা!'

'মেয়েটি খুব ভালো। দ্যাখ, তুই মা-র পছন্দকে নিন্দে করতে পারবিনে। কিন্তু সেটা কথা নয়, তার চাইতে অনেক বেশি জরুরি হচ্ছে, ওর আমি ছাড়া আর কেউ নেই সংসারে। বড়ো দুঃখী, বড়ো বিপন্ন।'

'মা।'

'অবিশ্যি বলতে পারিস তার জন্য এ-ভাবে ফাঁকি দিয়ে ডেকে আনবার দরকার ছিলো কী। এও ভাবতে পারিস বিপন্ন ব'লে তোকেই বা বিয়ে করতে হবে কেন। তার কারণও আমি বলছি তোকে। দক্ষিণের বাড়ির পীতাম্বর বাঁড়ুজ্যেকে মনে আছে তো তোর? সেই যে মুন্সীগঞ্জে থাকতেন? তোর দাদু তোকে যার বাড়ি গিয়ে থেকে ঐ কলেজে ভর্তি হ'তে বলেছিলেন?'

সোমনাথ মূঢ়ের মতো মাথা নাড়লো।

'টুনিকে মনে আছে? টুনি-পিসি বলতিস তুই! পীতাম্বর-কাকার মেয়ে?'

স্মৃতির অন্ধকার হাৎড়ে টুনি-পিসির মুখখানাও মনে পড়লো সোমনাথের। তার মা-র প্রিয়তমা সখী। রোজ দুপুরে আসতেন। লম্বা-লম্বা মিষ্টি গন্ধমাখা চুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে-শুয়ে কত গল্প করতেন মা-র সঙ্গে, গাল টিপে দিতেন তার, আর সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতো তাঁর মুখের দিকে। সোমনাথ তখন কত বড়ো? ছয় না সাত?

একটি ছোট্ট তুলতুলে নরম পুতুল রেখে একদিন মারা গেলেন তিনি। জ্যান্ত পুতুল। সেই পুতুল হাত নাড়লো, পা নাড়লো, খাবার জন্য কেঁদে উঠলো জোরে, কিন্তু টুনি-পিসি একটুও তাকালেন না। কপালে সিঁদুর মেখে পায়ে আলতা প'রে লোকেদের কাঁধে চ'ড়ে চ'লে গেলেন গোয়াল-পাড়ার শ্মশানে। তরঙ্গিণী আঁচলে চোখের জল মুছে সেই ছোট্ট পুতুলটি বুকে তুলে নিলেন।

তারপর? তারপর কী?

'ঐ তো একমাত্র সন্তান ছিলো পীতাম্বর কাকার।' মা-র গলা আবার কানে এলো তার, 'ঐ মেয়েকে দশ বছরের রেখে তার মা মারা গিয়েছিলেন, আবার টুনিও তার মেয়েকে মাতৃহীন ক'রে মা-র ধারা বজায় রাখলো।' তরঙ্গিণী আবেগভরে ছেলের পিঠের উপর হাত রাখলেন, 'ওকে নিয়ে তুই সুখী হবি তাও আমি জানি।' অল্প হাসলেন, গালের উপর তাঁর টোল পড়লো সুখের, তারপর মুখ ঘুরিয়ে ঈষৎ উঁচু গলায় ডাকলেন, 'অরুন্ধতী।'

সোমনাথ ভেবে পেলো না তার কী করা উচিত, কী বলা উচিত। একচল্লিশ বছরের দুঃখক্লিষ্ট মুখের উপর চোখ রেখে মা-র জন্য তার কষ্ট হ'লো।

ধীরে-ধীরে পা ফেলে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে এসে ঘরে দাঁড়ালো মুখ নিচু ক'রে। একখানা নীলাম্বরী শাড়ির আঁচলে সারা গা

ঢেকেছে, মৃদু একটি সৌরভ ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। বোধহয় বিকেলের স্নান সেরে এলো এইমাত্র। আভাসেই সোমনাথ দাঁতে দাঁত লাগিয়ে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

'ওকে প্রণাম করো, অরুন্ধতী, আমার ছেলে।'

'ছী ছি ছি—' সোমনাথ একেবারে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। গম্ভীর মুখে তরঙ্গিণী বললেন, 'ছি কী! মেয়েদের সমস্ত জীবনের সমস্ত সার্থকতাই স্বামীকে ঘিরে। তাঁকে ছাড়া সুখ নেই, শান্তি নেই, মান-মর্যাদা কিছু নেই। তাঁর অভাবে জীবন মৃত্যু দুই সমান। স্থির হ'য়ে দাঁড়া। প্রণাম করো তুমি।' অরুন্ধতী নিচু হ'য়ে তার ঠাণ্ডা নরম হাত সোমনাথের পায়ের পাতায় ছোঁয়ালো।

অরুন্ধতী ঘর থেকে চ'লে যেতে তরঙ্গিণী বললেন, 'ভেবেছিলাম তুই একটু গুছিয়ে বসলে, একেবারে শীতের সময়ই— কিন্তু অসম্ভব। পীতাম্বর কাকা মারা গেছেন বোধহয় দু-মাসও পোরে নি, এর মধ্যেই কানাঘুষো আরম্ভ হ'য়ে গেছে। মেয়েটা এখানে সুস্থির-মতো আমার কাছে আছে ব'লে গ্রামসুদ্ধ সব যেন বদ্ধপরিকর হয়েছে ওকে দুঃখ দিতে।' তরঙ্গিণী নিশ্বাস নিলেন, 'অবিশ্যি তাতে আমি ততটা ব্যস্ত হতাম না। কিন্তু তোর দাদু ঠাকুমাও এ নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছেন। এ জন্যেই আমি উপায়ান্তর না দেখে শেষে টেলিগ্রাম করলাম।'

সোমনাথ চুপ।

ছেলের সম্মতি সম্বন্ধে তরঙ্গিণীর মনে লেশমাত্রও সংশয় ছিলো না ব'লেই তিনি এমন সাহসের সঙ্গে, এমন সম্পূর্ণভাবে এই অসহায় মেয়েটিকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছেলে, তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা, ভালো লাগা, ভালোবাসার একমাত্র আধার, অতি বাধ্য সোমনাথ; সে কি

এটুকু সম্মান, এটুকু অধিকার দেবে না তার মাকে? আর নির্বাচন যেখানে অযোগ্য নয়।

যেদিন পীতাম্বর বাঁড়ুজ্যে মারা গেলেন সেদিনের দৃশ্যটি ছবি হ'য়ে যেন লেগে আছে তাঁর মনে। প্রথমটায় অরুন্ধতী বড়ো-বড়ো চোখে চারদিকে তাকিয়ে ছটফট ক'রে উঠলো সারা শরীরে। মুহূর্তের জন্য ভেঙে পড়লো একেবারে। কিন্তু পর মুহূর্তেই স্থির। ধীরে-ধীরে নিচু করলো মাথা, কয়েকবার হাত মুঠো করলো আর খুললো, তারপর ফুলচন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিলো তার একমাত্র বন্ধু, বন্ধন, আশ্রয়, স্বজন, অতিপ্রিয় দাদামণিকে। মৃতদেহ সৎকারে নিয়ে যাবার পর তরঙ্গিণী নিয়ে এলেন তাকে নিজের বাড়িতে। পায়ে-পায়ে চ'লে এলো সঙ্গে, মুখে একটা আওয়াজ নেই, চোখে একফোঁটা জল নেই। আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলেন তিনি। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে টের পেলেন তাঁর বুকের কাছে বালিশে মুখ গুঁজে এতক্ষণে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে অরুন্ধতী। তরঙ্গিণী তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, বললেন, 'ভয় কী, বোকা? আমি তো আছি। আমিই তো আজ থেকে তোমার মা।' 'ম্‌মা।' কাঁপা-কাঁপা গলায় অস্ফুটে উচ্চারণ করলো অরুন্ধতী। তারপর আকুল আগ্রহে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো তাঁকে। মুহূর্তে বন্ধন দৃঢ় হ'লো।

তারপর থেকে একেবারে ছায়া হ'য়ে আছে দু-মাস তাঁর সঙ্গে। ওতপ্রোতভাবেই তো তিনি দেখছেন ওকে? এমন অদ্ভুত চুপচাপ ঠাণ্ডা স্বভাব, অথচ সেই স্বভাবের মধ্যে এমন একটি দৃঢ়তা ঋজুতা জড়িয়ে আছে যে অবাক হ'য়ে যান তিনি। দুধের মতো রং, কাজল-ডোবানো চোখ, মেঘের মতো চুল, সারা শরীরে কাঁচা লাবণ্যের জোয়ার। রূপে গুণে এমন দুর্লভ মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে কেনই বা আপত্তি হবে সোমনাথের।

দু-একদিন পরে কৃষ্ণদাস বললেন, 'এ-সব তুমি কী করছো বৌমা, বলো তো ? এত বড়ো বিয়ের যুগ্যি একটা মেয়েকে কোন সাহসে তুমি নিজের দায়িত্বে বাড়ির মধ্যে এনে রেখেছো ?'

মাথায় ঘোমটা টেনে দরজার এপিঠে দাঁড়িয়ে তরঙ্গিণী শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাকাকে আপনি বলুন খুড়িমা, সোমনাথের বৌ হিসেবেই আমি ওকে এখানে নিয়ে এসেছি। ওর সব দায়িত্ব আমার।'

'দায়িত্ব নিলেই তো আর হ'লো না, তাহ'লে ছেলেকে লিখে দাও সে-কথা। সে এসে যা হোক ব্যবস্থা করুক।'

'লিখবো।'

'বেশ। কিন্তু এ-সব ঝামেলা আমি খুব বেশি দিন সইতে পারবো না সেটাও আগেই জানিয়ে রাখলুম।'

রীতিমতো রাগভাব দেখালেন কৃষ্ণদাস। এ-ব্যাপারে একটুও খুশি হন নি তিনি। তাঁর স্ত্রীও না। এতদিন খাওয়ালেন পরালেন আর বিয়ের বেলা তরঙ্গিণীই সব ? কেন, ছেলেটাকে দিয়ে কি কম টাকা নিতে পারতেন তাঁরা ? তবু তো তরঙ্গিণীর একটা ঋণ শোধ হ'তো ? কিন্তু কী বলবেন ? এখন তো আর তরঙ্গিণী তাঁদের আশ্রিত নয়। তার এখন এম. এ. পাস চাকুরে যোগ্য ছেলে আছে পেছনে।

মৃত্যুর দিন সকালবেলা পীতাম্বর ডেকে পাঠিয়েছিলেন তরঙ্গিণীকে। তরঙ্গিণী কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে চোখ নিচু ক'রে তাঁর পায়ের তলায় বসলেন এসে।

'বৌমা!' ঘড়ঘড়ে গলায় তিনি ডাকলেন, ইশারা ক'রে কাছে এসে বসতে বললেন।

'খুব কষ্ট হচ্ছে, কাকাবাবু?' তরঙ্গিণী বুকের উপর হাত বুলোলেন।

'খুব।'

'বুকে একটু পুরোনো ঘি মালিশ ক'রে দি ?'

'কী লাভ ? বৌমা— '

'বলুন।'

'তুমি তো জানো তোমার শ্বশুর আমার কত বন্ধু ছিলেন।'

'জানি।'

'সোমনাথের বাবাকে আমি নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতাম।'

'সে-কথাও আমি শুনেছি।'

'আর সোমনাথ, সে আজ বড়ো হয়েছে, মানুষ হয়েছে, যোগ্য হয়েছে,' হাঁপাতে লাগলেন তিনি, বুকের শব্দ প্রবল হ'লো।

তরঙ্গিণী সস্নেহে বললেন, 'কাকা, আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি, সে-কথা তো বরাবরই স্থির। আপনি চুপ করুন।'

চুপ তো তিনি করবেনই। তবু তাঁর শেষ কথাটি তো বলতে হবে ?

'বৌমা।'

'বলুন।'

'তাহ'লে— আমাকে কথা দাও, ওকে তুমি— তুমি নিজের—' শির-ওঠা মুমূর্ষু হাতটি তরঙ্গিণীর হাতের ওপর রাখলেন, 'গ্রহণ করবে ছেলের জন্য ?'

'কথা দিলাম। কথা দিলাম! আপনি কিছু ভাববেন না।' তরঙ্গিণী মুমূর্ষুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন, তাঁর চোখ সজল হ'য়ে এলো। ধরা-গলায় বললেন, 'আজ থেকে ওর সব ভার আমার। আপনি শান্ত হোন।'

পীতাম্বরের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, কাঁপা-কাঁপা হাত একটু তুললেন কি তুললেন না— ঠোঁট নেড়ে অস্ফুটে আশীর্বাদ করলেন।

মা-র মুখের উপর চোখ রেখে সবিস্তারে সব কথা শুনলো সোমনাথ। তরঙ্গিণী একটু থেমে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুই কি সেজন্য রাগ করলি ?'

'না।'

'আমি কি অন্যায় করেছি ?'

'না।'

'তবে অমন চুপ ক'রে আছিস কেন ?'

'কী বলবো।'

'মেয়েটি ভালো না ?'

'কী ক'রে জানবো ?'

'দেখতে ?'

'মা, একটা কথা—'

না, আর না। সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে এবার বদ্ধপরিকর হ'লো সোমনাথ। সঙ্গে-সঙ্গে তরঙ্গিণীর চোখে কেমন একটা ভয় নেমে এলো। ব্যাকুল গলায় বললেন, 'কী বলবি তুই ? কী কথা ? সোমনাথ, আমি তো তোর কাছে কোনোদিন কিছু চাই নি, এটুকু অধিকার না-হয় দিলিই আমাকে। আমি তো তোর মা। তুই রাগ করিসনে, এই মেয়েকে বিয়ে করতে দ্বিধা করিসনে তুই।'

সাপের কোমর ভেঙে গেলো। দুটি হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে ঐটুকু ঘরের অপরিসর মেঝের উপরই জোরে-জোরে পায়চারি করতে লাগলো সোমনাথ।

তরঙ্গিণী ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'তোর স্ত্রী হিসেবেই ও এ-বাড়িতে এসেছে। তা নৈলে অত বড়ো একটি মেয়েকে এখানে নিয়ে আসার বা অসহায় ব'লে সহায় হবার কোনো প্রশ্নই উঠতো না আমার

অবস্থার জীবনে। আজ সতেরোই বৈশাখ। উনিশ তারিখ আর আটাশ তারিখ, ছুটো বিয়ের দিন আছে। উনিশ তারিখটাই মনে-মনে ঠিক ক'রে আমি তোকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। আর-কিছু না, শুধু সকলের সামনে ওর মাথায় তুই সিঁদুর তুলে দিয়ে যা, এ-বাড়িতে ওর একটা জায়গা হোক। সসম্মানে বাস করুক।'

'মা চুপ করো, চুপ করো।' ছুই হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারের উপর ব'সে পড়লো সোমনাথ, 'এ হয় না, হয় না, হ'তে পারে না।'

তরঙ্গিণী মুখে-মুখে উচ্চারণ করলেন, 'হয় না! হ'তে পারে না!'

তারপর স্তব্ধ হ'য়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠোঁট নাড়লেন, 'হয় খোকা, হয়। হ'তেই হবে। হ'তেই হবে।'

১২

বলাই বাহুল্য, সেই রাত্তিরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়া সোমনাথের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। পথের ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে এলো বটে, কিন্তু মনের অশান্তিতে ছু-চোখ ছেড়ে ঘুম যে কোথায় মিলোলো!

মা-র হাতে পাতা পরিষ্কার নিভাঁজ বিছানা, ধোপ দিয়ে তুলে রাখা চমৎকার নেটের মশারি, ঢাকা থেকে শখ ক'রে এই মশারি তৈরি করিয়ে আনিয়েছিলেন তরঙ্গিণী ছেলের জন্য। বারো মাস তোলাই থাকে, কেবল সে এলেই টাঙিয়ে দেওয়া হয়, ছুধের মতো ধবধব করতে থাকে। জোড়া বালিশ, বালিশের ওয়াড়ে ফুল তোলা।

অমন সুন্দর বিছানায় শুয়ে শুধু এ-পাশ আর ও-পাশ। লাল শালুর ঝালর দেওয়া তাল পাখাটি তুলে অপটু হাতে বাতাস দিলো নিজেকে, ঠক ক'রে তিনবার গুঁতো খেলো নাকের ডগায়। কমানো লণ্ঠন বাড়িয়ে

দিয়ে উঠে বসলো এবার। কী বিশ্রী! কী বিশ্রী এই রাত্তিরের ঝিঁঝিঁ-ডাকা শেয়াল-ডাকা গ্রাম।

বালিশ দুটো কোলে নিয়ে মশারির ভেতরই ব'সে রইলো চুপচাপ, তাকিয়ে রইলো সিল্কের সুতোয় আঁকা দুটি ময়ূরের লম্বা পুচ্ছের উপরে। কে করলো? অনেক আগে মা-ই এ-সব করতেন দুপুরে ব'সে-ব'সে। মুখ নিচু ক'রে ছোটো-ছোটো ঝকঝকে শাদা দাঁতে সুতো কাটতেন, অসম্ভব গরমে কপালে ঘাম ফুটতো বিন্দু-বিন্দু, শেলাই-নিবিষ্ট সেই মেয়ে-মুখ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতো সোমনাথ। মুগ্ধ হ'য়ে যেতো। আজকের এই লতাপাতা-ডাল-পাখি-আঁকা বালিশের ওয়াড় কতদিন আগেকার সেই পাংলা নীল শির-তোলা বাদামি মুখখানা মনে পড়িয়ে দিলো।

মেয়েরা কেউ শেলাই করছে দেখলেই আজো তার সেই পাংলা বাদামি মুখখানা মনে প'ড়ে যায়। ছবির মতো। ভালো লাগে। মনে হয় এ-রকম সময়েই মেয়েদের যেন সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে। নিচু হ'য়ে ঘর ঝাড়ছে, বিছানা পাতছে হাঁটু ভেঙে, ব্যস্ত হ'য়ে ধোপার হিশেব মিলোচ্ছে। চিরুনি চালাচ্ছে লম্বা চুলে, আয়নায় তাকিয়ে মুখ মুচছে ভেজা গামছায়, এমনকি, ঠাকুমা যে ঠাকুমা, তিনিও যখন তাঁর কালো আর মোটা শরীর নিয়ে খই বাছতেন কুলোয় ক'রে, চাল ঝাড়তেন হাতে টোকা দিয়ে-দিয়ে, ছেলেবেলায় তা-ই দেখেই বা কত সময় কাটিয়ে দিয়েছে সোমনাথ।

কেন? কেন এই ভালো লাগা? এর মূল কোথায়? অভ্যাস? বহু পুরুষ ধ'রে মেয়েরা এই ক'রে আসছে, এই তাদের কাজ, এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিশ্বাসে? আমরা পুরুষেরা, স্বার্থপর নিষ্ঠুর অত্যাচারী জীবেরা, সমাজের প্রধানতম অধিকারীরা মেয়েদের কাছে এ-ই চাই

ব'লে? তাই কি এই নিয়ম যে আমরা লিখবো, পড়বো, শিখবো, পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে ছুটে বেড়াবো, অর্থোপার্জনের জন্য ডুববো জলে, পুড়বো আগুনে, তারপর রাজত্ব ছিনিয়ে এনে ঢেলে দেবো মেয়েদের পায়ে, আর মেয়েরা ঘরের কোণে ছোট্ট শরীরে আরো ছোট্ট হ'য়ে রাঁধবে, বাড়বে, ছেলে কোলে নেবে, সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালবে, প্রণাম করবে তুলসীতলায়, মাত্র একটা মানুষের এক গণ্ডূষ ছোট্ট সুখদুঃখের গণ্ডিতে কূপমণ্ডূক হ'য়ে মনে-মনে ভাববে এই তো আমার পৃথিবী, ঐ তো ঐ মানুষই তো পৃথিবীর সব লোক, আর এই যে কোলে, যাকে আমি দশমাস গর্ভে ধারণ করেছি, লালন করেছি, এই তো আমার জলবায়ু।

স্বার্থপরতা বৈ কি। ঘোর স্বার্থপরতা। এই তো মা, সেই সৌন্দর্যের চর্চা ক'রেই তো জীবনটা কাটালেন, কী হ'লো? কৃষ্ণদাস আরাম পেলেন, তাঁর স্ত্রী পায়ের উপর পা তুলে ব'সে থাকলেন, বাবা বেঁচে থাকলে তিনি সুখী হ'তেন, আমি সুখী হয়েছি, কিন্তু তিনি নিজে? নিজে পেলেন কতটুকু? একটা ভীরু শশকের মতো এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়েই চ'লে গেলো দিন।

তাই কি? এই সংসার ছেড়ে তরঙ্গিণী যখন তাঁর নিজের সংসারে যাবেন, তাঁর ছেলের কাছে ছেলের ঘরে, তখনো কি এই কাজগুলো তাঁকে নতুন আস্বাদ দেবে না? নতুন আনন্দ দেবে না? সারাদিন পরিশ্রম ক'রে যেটুকু খুদকুঁড়ো সে মাসের শেষে উপার্জন ক'রে এনে তুলে দেবে তার মা-র হাতে, তা তো রাজ-ঐশ্বর্য নয়, তাই ব'লে তিনি কি হাঁটবেন না? খাটবেন না? কষ্ট হ'লেও নিজের হাতের অমৃততুল্য রান্নাটুকু এনে ঢেলে দেবেন না ছেলের পাতে? সেই সমর্পণে ভালোবাসার আকুলতায় তাঁর হৃদয়ও কি আপ্লুত হবে না? তিনিও কি সুখী হবেন

না? কাজ কি তখন শুধু কাজ থাকবে? আনন্দের হবে না? তৃপ্তির হবে না?

সহসা বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে উঠলো। সেই আনন্দ, সেই তৃপ্তি যে তার দুঃখিনী মায়ের ভাগ্যে কোনোদিনই জুটবে না এ-কথাটা যেন বিদ্যুতের অক্ষরে লেখা হ'য়ে ফুটে উঠলো বিছানায় বালিশে দেয়ালে দরজায় সবখানে। তরঙ্গিণীর আশৈশব ব্যর্থ জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় যে সুরু হ'য়ে গেছে এ-বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না। না, আর তাঁর কোনো আশা নেই, আলো নেই। বাবার মতো সে-ও ফাঁকি দিয়েছে তার মাকে। বাবা দিয়েছিলেন মৃত্যু দিয়ে, সে দিয়েছে জীবন দিয়ে। হতভাগিনী।

কিন্তু কী করবে সে? হে ঈশ্বর, এ আমার কী হ'লো? এ তুমি কী করলে? কী করলে? একটা বেড়াল কাঁদছিলো বাইরে, চমকে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো। টিপটিপ করতে লাগলো বুকের ভেতরটা।

সময় গড়ালো ধীরে-ধীরে, ধীরে-ধীরে রাত নিশুতি হ'লো। আর সেই নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে গোয়ালপাড়া শ্মশান থেকে বাতাসে হরিধ্বনির আওয়াজ ভাসলো।

তন্দ্রায় জাগরণে ভয়ে ভাবনায় কেমন ক'রে রাত কাটলো তা নিজেও বুঝতে পারলো না সোমনাথ। একসময় পুবের আকাশ লাল হ'য়ে উঠলো, জানলা দিয়ে সূর্যের প্রথম স্পর্শ ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে।

পাশাপাশি শুয়ে আরো দু-জন মানুষের রাত্রিও তন্দ্রায় জাগরণে আর দুর্ভাবনায় ন'ড়ে-চ'ড়ে আর এ-পাশ ও-পাশ ক'রেই কাটলো। ভোর না হ'তেই আবার উঠতে হ'লো দু-জনকে। দু-জনেরই কত কাজ।

প্রায় অন্ধকার থাকতে-থাকতে কৃষ্ণদাসকে চা ক'রে দিতে হয় তরঙ্গিণীকে, তিনি খুব সকালেই আদা দিয়ে দুধ ছাড়া চা খেয়ে

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেন, তারপর ছ'টার মধ্যেই তিনপো দুধে আধপো মিছরি ফুটিয়ে সেই এক-বলকের দুধ খেয়ে দপ্তরে চ'লে যান দু-মাইল হেঁটে। আজ নাতির সুবাদে একটু দেরি করলেন। রাত্তিরে ভালো ক'রে দেখাশোনা হয় নি, সকালের চায়ের আসরে তাই ডাক পড়লো সোমনাথের।

রাত্রিজাগরণক্লান্ত লাল-লাল চোখে এলোমেলো চুলে উঠে এলো সে দাদুর ঘরে। জোড়া তক্তপোশের উপর পাটি পাতা। গুটোনো বিছানা পর্বতপ্রমাণ উঁচু হ'য়ে আছে। তক্তপোশের উপর এক ধার ঘেঁষে গোটা দশেক ট্রাঙ্ক, রেলিঙের মতো সারি-সারি, আর মাথার কাছে জানলার তাকে তামাকের সরঞ্জাম, মালিশের ওষুধ। কাচের দরজা বসানো দেয়াল-তাকে চিনেমাটির গ্লাশ, পরির ছবি আঁকা পেয়ালা, লম্বা লিলি বিস্কুটের টিন, কড়ির বৈয়ম, মাথায় প্রদীপ নিয়ে ন্যাংটো পুতুল, শ্বেতপাথরের থালাবাটি, আজীবন সোমনাথ দেখে আসছে এই বাড়ির এই শৌখিন সম্পত্তি, ওখানেই তাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কচিৎ কদাচ কুটুম্ব জাতীয় কিংবা জামাই-বেয়াই কেউ এলে ওগুলো নামানো হয়। ফটিকের গ্লাশে মিছরির পানা দেয়া হয়, শ্বেতপাথরের রেকাবিতে জলখাবার। আর খাওয়া হওয়া মাত্রই সেগুলো ধুয়ে তুলে রেখে দেন তরঙ্গিণী। তার ব্যতিক্রম ঘটলে আর রক্ষা রাখেন না কৃষ্ণদাস।

ঘরটিতে মেঝে ব'লে কোনো জিনিস নেই, খাট থেকে নেমে ওদিকে বাইরের সিঁড়ি, নয়তো এদিকে এ-ঘরের দরজা। এ-ঘরটি তার চেয়েও ছোটো। সেখানেই তরঙ্গিণী ব'সে-ব'সে ছোটো উনোনে চা করেন। শীতকালে স্নানের গরম জল ক'রে দেন, তা নইলে রান্নাঘর থেকে আনতে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবার ভয়। কৃষ্ণদাসের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাই আছে। এই পাকা দালানটুকুতে এখন শুধু তিনি আর তাঁর স্ত্রীই থাকেন। পুবের ভিটেতে

বড়ো টিনের ঘর তৈরি হয়েছে, সেখানে থাকেন তরঙ্গিণী। সোমনাথ বড়ো হবার পর থেকেই এই ব্যবস্থা। কৃষ্ণদাস অবিশ্যি বলেছিলেন, বৌমা ছেলেমানুষ, সোমাকে নিয়ে দালানেই থাকুন, আমরা বড়ো ঘরে যাই। তরঙ্গিণী রাজি হন নি। অসুবিধে তো কিছু নেই, বরং বড়ো ঘরেই সুবিধে। সেখানেই তো সব। রান্নাঘর সেখানে, কাজের জিনিসপত্র সেখানে, কাপড়ের আলনা সেখানে। দুটি বেড়ার পার্টিশন করা ঘরে সোমনাথ আর তাঁর খুব ভালোভাবে কুলিয়ে যায়। এক ঘরে সোমনাথের পড়াশুনো, (যখন ছিলো) অন্যঘরে শোওয়া। তার পাশেই একটু নিচু ভিটিতে রান্নার ব্যবস্থা। নিরিমিশ রান্না অবিশ্যি ঢেঁকিঘরের পাশে। তা নিরিমিশ আর কীই-বা রান্না হয়। বেশির ভাগ দিনই তো ভাতে-ভাত।

তরঙ্গিণী চা করছিলেন, হাতে-হাতে সাহায্য করছিলো অরুন্ধতী। তার কালো কুচকুচে চুলে ঘেরা গালের একটা পাশ লক্ষ্য ক'রে সোমনাথ স'রে বসলো, আর সোমনাথের আগমন টের পেয়ে অরুন্ধতীও যথাসম্ভব নিজেকে গুটিয়ে নিলো দরজার কোণে। ঠাকুরমা দাদু অভ্যর্থনা করলেন নাতিকে। উপযুক্ত নাতি, কলকাতা শহরে থাকে, এম. এ. পাস চাকুরে। একটু সমীহ করতে হয় বৈকি।

'এসো ভাই, এসো। হাঙাল-বাঙাল দাদুর সঙ্গে ব'সে নেটিভ হ'য়ে একটু চা খাও। তোমরা হ'লে সব সাহেব মানুষ—'

সোমনাথ হাসলো। তক্তপোশ থেকে তার ঝোলানো পা চৌকাঠ ডিঙিয়ে এই ঘরে ঝুলে পড়লো।

তরঙ্গিণী কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে সোনার মতো কাঁসার বাটিতে সুগন্ধি ঘিয়ের গরম হালুয়া নামালেন, হালুয়াটা ভারি প্রিয় সোমনাথের, সে এলেই এই ব্যবস্থা হয়। অরুন্ধতীর সোনার বালা-পরা দুটি কুণ্ঠিত

হাত এইমাত্র-নামানো পরি-আঁকা পেয়ালায় চা ঢাললো। তার মুখ দেখা গেলো না।

'তারপর ?' চায়ে চুমুক দিয়ে আলাপ করলেন কৃষ্ণদাস, 'কেমন লাগছে চাকরি-বাকরি ?'

'এই একরকম।'

'একরকম কেন ? খুব ভালো না কেন ? সবাই তো বলছে এমন চাকরি মানুষ ভাগ্যগুণে পায়।'

'হ্যাঁ, চাকরিটা ভালোই।'

'তবে ?'

সোমনাথ মাথা চুলকালো।

'এবার আর কী। বাড়ি-টাড়ি ক'রে মাকে নিয়ে যাও, আমরাও কলকাতা শহর দেখে তীর্থ ক'রে আসি। আর খবর সব তো শুনেইছো।'

সোমনাথের হাতের চায়ের পেয়ালা ছলকালো।

'বৌমা যা ভালো বিবেচনা করলেন তাই করলেন, আমি আর কী বলবো।' কৃষ্ণদাসের গলায় রাগ। 'যাক, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তা তোমার ছুটি ক'দিনের ?'

'দু-সপ্তাহ।'

'তাহ'লে তো তোমার তাড়াহুড়ো হবে অনেক। একটা বিয়ের হাঙ্গামা তো নেহাৎ কম নয়।'

সোমনাথ বিষম খেলো, তার তলায় কথা ডুবে গেলো কৃষ্ণদাসের, ঠাকুরমা পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'একটা পাখা আন না, মাথায় হাওয়া দে না একটু।' অপ্রস্তুত অরুন্ধতী পাখা এনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কোণে, ভেবে পেলো না কেমন ক'রে হাওয়া দেবে।

১৩

দিন নিস্তব্ধ হ'লে দুপুরের কাজকর্ম মিটলে ছেলের কাছে এসে দাঁড়ালেন তরঙ্গিণী। বেলা হয়েছে, এখনো খান নি তিনি, স্নান ক'রে পুজো সেরে কথা বলতে এসেছেন ছেলের সঙ্গে। একটা বইয়ে চোখ রেখে মন কোথায় পাঠিয়ে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত সোমনাথ বসেছিলো চুপচাপ, মা-র দিকে চোখ তুলে তাকালো। সোনা-রঙের মটকার কাপড় পরেছেন তিনি, মিশে গেছে গায়ের রঙের সঙ্গে। এই শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে ছেলেবেলার স্মৃতি। কতকাল ধ'রে যে এই কাপড়টি সে মাকে স্নান ক'রে উঠে পুজো করবার জন্য পরতে দেখেছে তার হিসেব নেই। স্নান করেন তিনি দু-বার, একবার ভোর ছ'টায়, আরেকবার সব কাজকর্ম সেরে। এই সময়টাতেই একটু নিরিবিলি বসেন আসনে, চোখ বুজে থাকেন, বোজা চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, কী ভাবেন, কী করেন, কাকে ডাকেন, কার জন্যে কাঁদেন, ছেলেবেলায় ভেবে পেতো না সোমনাথ, শুধু তাকিয়ে থাকতো মোহাবিষ্ট হ'য়ে।

তরুণী মা-র স্মৃতি তার ঝাপসা, কিন্তু মনে হ'লো শাড়িটার যেন স্মৃতি নেই, সেটা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। তরঙ্গিণী বললেন, 'তোকে একবার ঢাকা যেতে হবে জিনিসপত্র কিনতে। আমি সব ফর্দ ক'রে রেখেছি। যত নমোবিষ্ণু ক'রেই হোক তবু তো কিছু তার অনুষ্ঠান আছে?'

'মা—' প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো সোমনাথ। তরঙ্গিণী একটু চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে, তারপর বললেন, 'সমস্ত দিক ভেবেই আমি এমন তাড়াহুড়ো করছি— নইলে মনকে প্রস্তুত হবার জন্য সময় আমি তোমাকে দিতে পারতুম।'

'না মা, না—'

'কী না ? বোকা ছেলে।' স্নেহে আর্দ্র হ'য়ে উঠলো তাঁর গলা, 'কিছু ভাবিসনে তুই, সুখী করবার যোগ্য মানুষই আমি তোর জন্য নির্বাচন করেছি।' ছেলের মাথায় গাল রাখলেন, 'পঁচিশ বছর আগে তোর বাবার পঁচিশ বছর বয়স ছিলো।' একটু থেমে, 'আমার অপূর্ণ জীবন তোর মধ্যেই আজ সম্পূর্ণ হ'তে চলেছে, সমু। তুই ছাড়া আর আমার কী আছে ?' সোমনাথ দাঁতে দাঁত চেপে চুপ।

'তবু দুটো দিন পিছোলো, ঠাকুরমশায় বললেন একুশে একটা দিন আছে, সেটাই নাকি এ-মাসে প্রশস্ত। ভালোই হ'লো, তবু একটু সময় পাওয়া গেলো হাতে।'

সোমনাথ অস্থির হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো, হাত মুঠো ক'রে ঐটুকু অপরিসর টিনের ঘরের পাকা মেঝেতেই খাঁচায় আবদ্ধ বাঘের মতো বেগে পায়চারি করতে-করতে বললো, 'তুমি খেয়েছো ?'

'খাবো।'

'খেয়ে এসো।'

'তাহ'লে এই ফর্দটা রাখ তুই। বৌর জন্য যে বেনারসিখানা লেখা আছে সেটার রং টুক্‌টুকে না এনে বরং ফিকেই আনিস, পরতে পারবে অনেক দিন। সন্ধে সাতটায় গয়নার নৌকো ছাড়বে, তোর দাদু ঘাটে ভিড়তে ব'লে দিয়েছেন।'

'তুমি আগে খেয়ে এসো, তারপর কথা হবে।'

'খেয়ে এসে তোর কাছে বসবো এমন সময় আর আজ আমার নেই। দক্ষিণের বাড়ির ঢেঁকিঘরে গিয়ে চিঁড়ে কুটতে হবে সন্ধে পর্যন্ত, দু-দিন বাদে বিয়ে। কত-কিছু বাকি! তোর ঠাকুমা আবার জ্ঞাতি-নিমন্ত্রণে বেরিয়েছেন খেয়ে উঠে।'

'জ্ঞাতি-নিমন্ত্রণে ?' মা-র মুখোমুখি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো সোমনাথ,

রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'এ-সব বন্ধ ক'রে দাও মা, বন্ধ ক'রে দাও। এ-বিয়ে হ'তে পারে না, হ'তে পারে না।'

'হ'তে পারে না?'

'না।'

'না!'

'না মা, না, কিছুতেই না।'

'কিছুতেই না?'

'না, না।' সোমনাথ পাগলের মতো মাথার চুল টানতে লাগলো, তরঙ্গিণী পাথরের মতো চোখে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

'কী বলছিস তুই?'

'যা সত্যি তাই বলছি, মা।'

'এই তোর সত্যি?'

মা-র কাঁধের উপর হাত রেখে সোমনাথ ব্যথিত গলায় বললো, 'মাগো, এই আমার সত্যি।'

'তবে আমার সত্য কী?'

'উপায় নেই, আমার উপায় নেই।'

'উপায় নেই?'

'না।'

'ঠিক বলছিস?'

'তুমি আমার সব কথা শোনো—'

'তুই আমাকে মৃত আত্মার কাছে মিথ্যাবাদী হ'তে দিবি? আমাকে ধর্মচ্যুত করবি, হাস্যাস্পদ করবি সকলের কাছে? একটা ফুলের মতো মেয়ের সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রে দিবি?' আস্তে-আস্তে তরঙ্গিণীর বেতের

মতো ছিপছিপে রোগা ফর্শা নমনীয় শরীর যেন লোহার পুতুলের মতো শক্ত হ'য়ে উঠলো।

'যদি কোনো উপায় থাকতো, মা—'

'এতদিন যা শুনেছি— সব তাহ'লে সত্যি? আমাকে তুই এমন ক'রেই ঠকালি?' কাঁধের উপর থেকে আস্তে সোমনাথের হাত সরিয়ে দিলেন তিনি। সোমনাথ চমকে উঠলো।

'আমাকে বলিস নি কেন? আমি কি তোর সুখে বাধা হতাম? তোর সুখ আর আমার সুখ কি আলাদা? তোর বৌ সে যে জাতেরই হোক যে ধর্মেরই হোক, আমি কি সব ছেড়ে তাকে বুকে তুলে নিতাম না?'

'মা, মা—' প্রায় কেঁদে উঠলো সোমনাথ।

তরঙ্গিণীর নিশ্বাস দ্রুত হ'লো, অশেষ যন্ত্রণার ছাপ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো তাঁর মুখের প্রত্যেক রেখায়, দুটি হাত বুকে চেপে সহসা ধড়াশ ক'রে প'ড়ে গেলেন তিনি মেঝের উপর। সোমনাথ সাপটে জড়িয়ে ধরলো তাঁকে, তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'জল, জল! জল নিয়ে এসো কেউ।'

আর কে আসবে? নিঃঝুম নিশুতি দুপুরে কাঁপা-কাঁপা রোদ্দুরে আর কে আছে আশে-পাশে? অরুন্ধতীই আরক্তমুখে জল নিয়ে ছুটে এলো। পিঠ-ছাওয়া মেঘের মতো চুল লুটিয়ে পড়লো দু-পাশে, সোমনাথের কোলের উপর এলিয়ে-পড়া তরঙ্গিণীর চোখে-মুখে জল ছিটোলো নিচু হ'য়ে। তারপর দু-জনে মিলে ধরাধরি ক'রে তাঁকে তুলে দিলো বিছানায়।

এর পর সোমনাথ যে-ক'দিন দেশে রইলো, অনেক সাধ্যসাধনা, কান্নাকাটি, অভিমান, অনুরোধ, কিছুতেই কিছু হ'লো না, মা-র মুখ থেকে আর একটি কথা বার করতে পারলো না সে। সেই যে বিছানা নিলেন আর উঠলেন না। আঁচলে মুখ ঢেকে প'ড়ে রইলেন নিস্পন্দ

হ'য়ে। অরুন্ধতী লজ্জায় সংকোচে কোথায় গুটিয়ে রইলো শামুকের মতো। কৃষ্ণদাসের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো— তাঁর স্ত্রী বিরক্ত হলেন, কথা শোনালেন, তরঙ্গিণীর বাড়াবাড়িকে নিন্দে করলেন, কিন্তু তিনি আজ সব-কিছুর অতীত। পার্থিব জীবনের যত আশা, যত লোভ, যত কিছু কামনা, সবই তো আজ ফুরিয়ে গেছে, তবে আর ভয় কী? কর্তব্যের আর প্রশ্ন কই জীবনে। তিনি তো নেই, তিনি তো ম'রে গেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও তাঁর জীবন ছিলো, সোমনাথ ছিলো। কিন্তু সোমনাথের পরে আর তাঁর কী আছে? সোমনাথ অভিভূত হ'য়ে কাঁদলো, কাঁদতে-কাঁদতে চ'লে গেলো কলকাতায়, তরঙ্গিণীর একটা নিশ্বাসপাতের শব্দও শোনা গেলো না।

তার ঠিক তিনমাস পরে মারা গেলেন তিনি। মারা গেলেন বললে ভুল হয়, দেহত্যাগ করলেন বলা উচিত। কেননা এ-তিনমাস তিনি একমাত্র জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করলেন না, দিনে রাত্রে নেহাৎই জৈব প্রয়োজনের জন্য একবার দু-বারের বেশি শয্যা ত্যাগ করলেন না, অরুন্ধতী ছাড়া আর কারো দিকে তাকালেন না, তারপর কোনো-এক রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে, অরুন্ধতীকে অন্ধকারে হাৎড়ে-হাৎড়ে তার মাথায় হাতটি রেখে চুপে-চুপে নিঃশব্দে কখন বিদায় নিলেন সংসার থেকে। যাবার আগের দিন সন্ধেবেলা সকলের সামনে তাঁর গয়নার থলিটি তিনি অরুন্ধতীকে দিয়ে গেলেন, কন্যা হিসেবে তাঁর শ্রাদ্ধেরও একমাত্র উত্তরাধিকারী ক'রে গেলেন তাকে। একবারের জন্যও ছেলের নাম উচ্চারণ করলেন না। কৃষ্ণদাস আর তাঁর স্ত্রীর পায়ের ধুলো নিলেন মাথায়। কথা বলবার শক্তি ছিলো না, দুই চোখ ভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন শেষবারের মতো।

টেলিগ্রাম পেয়ে আবার ছুটে এলো সোমনাথ। বলাই বাহুল্য, এ-আঘাত তার পক্ষে সহনীয় ছিলো না। মা-র শূন্য তক্তপোশে আছাড় খেয়ে প'ড়ে আকুল হ'য়ে কাঁদতে লাগলো মেয়েদের মতো, ছু-দিন পর্যন্ত কেউ তাকে শান্ত করতে পারলো না।

ধর্মচ্যুত ব'লে মা-র কোনো কাজও শেষ পর্যন্ত করতে পারলো না সে। শ্রাদ্ধ হ'লো এগারো দিনে, সমস্ত খুঁটিনাটি, নিখুঁত নিয়মে অরুন্ধতীই পালন করলো। এ-ক'দিন সে তেল দিলো না মাথায়, একবারের বেশি ছু-বার আহার করলো না, এক কাপড়ে রইলো, কম্বল পেতে শুলো। সন্তানের সমস্ত কর্তব্য সে-ই পালন করলো।

তারপর সমস্ত চুকে-বুকে গেলে এইবার প্রশ্ন উঠলো অরুন্ধতী কোথায় থাকবে। কৃষ্ণদাস বিরস মুখে বললেন, 'আমি বুড়ো মানুষ, বলো দেখি এত বড়ো এক বাগ্‌দত্তা মেয়ে নিয়ে এখন কী করি ?'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'লোকেরা তো থুতু দিচ্ছে গায়ে।'

'বৌমা যে কী ক'রে গেলেন !'

'কারো বুদ্ধি-পরামর্শ কিছু কি নিলো নাকি তোর মা ? আমি তো তখুনি বললাম, এত বড়ো যুগ্যি ছেলে, কী সাহসে তুমি তাকে না জানিয়েই সব ঠিকঠাক ক'রে অমন আইবুড়ো মেয়েটাকে এনে ঘরে তুললে ? যত্‌তো কেলেঙ্কারি। এখন এই মেয়ের তো আর বিয়েই হবে না। কে না জানে যে ও সোমনাথের বৌ ? গ্রামে আমার মুখ দেখাবার জো রেখে গেলেন না বৌমা।'

'আমিই ওকে বিয়ে করবো, দাদু।' সোমনাথ মুখ তুলে পরিষ্কার গলায় বললো।

'তুমি !' স্বামী-স্ত্রী ছু-জনেই চমকালেন।

'হ্যাঁ। ওর সব ভারই আমার, আপনাদের নয়।'

'তুই বিয়ে করবি কী?' ঠাকুরমা অবাক চোখে তাকালেন নাতির মুখের দিকে, একটু বা অপ্রস্তুতভাবে, 'তুই তো বিয়ে করেছিস!'

'পুরুষের দু-বার বিয়েতে নিষেধ নেই।'

'তবে তাকে এমন দুঃখু দিলি কেন, এত বড়ো আঘাত দিয়ে কেন তাকে মেরে ফেললি হতভাগা—' ঠাকুরমা সজল হ'য়ে উঠলেন।

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো সোমনাথ, 'নিজের সুখটাকেই আমি বড়ো ক'রে দেখেছিলাম ঠাকুমা, তাঁর সম্মানটুকুর কথা পর্যন্ত আমি ভাবি নি। আমার জীবিত মা-র যে-ইচ্ছে আমি পূরণ করতে পারি নি মৃত মা-র কাছে এই আমার তার প্রায়শ্চিত্ত। নিজের জন্য এর চেয়ে আর আমি কী বেশি শাস্তি নিতে পারি।'

খবরটা সবাই শুনলো, অরুন্ধতীও বাদ গেলো না। ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলো, হাত ধুলো, উঠোনে জলের ছিটে দিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিলো ঘরে-ঘরে, তারপর চিলকুঠির ছাতে এসে বসলো চুপচাপ।

নলখাগড়ার বাঁক পর্যন্ত, যেখানে বেঁকে গেছে খালটা, অরুন্ধতী তাকিয়ে রইলো সেদিকে। একটা-দুটো নৌকো যাচ্ছে জল ছপছপ ক'রে, টিমটিমে কুপির ছায়া পড়ছে জলে, আবার সেই ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। একটা বোবা যন্ত্রণায়, কান্নার বেগে ব্যথা ক'রে উঠলো চোয়াল দুটো। একটা অপমান অসম্মানের গ্লানিতে ইচ্ছে করলো ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে। মস্ত বকুল গাছের ঝাপসা অন্ধকারের ফাঁকে-ফাঁকে ঝিকিরমিকির আলোর বুনোট। হঠাৎ মনে হ'লো কে যেন শাদা কাপড়ে গা মুড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, মুখ ঘোমটায় ঢাকা, তবু অরুন্ধতী অনুভব করলো সে-মুখ তরঙ্গিণীর। সে-মুখ বড়ো করুণ, বড়ো শীতল, বড়ো দুঃখী। দুই হাত বুকে চেপে অস্ফুটে কেঁদে উঠলো সে, 'মা, মা গো!'

এ-কয়দিন এমন একটা দণ্ডও কি তার কেটেছে যেখানে এই দুঃসহ কষ্ট থেকে তিলমাত্র নিষ্কৃতি পেয়েছে সে? চোখের ঘুম পর্যন্ত তাকে প্রবঞ্চনা করেছে। আর শুধু এ-কয়দিন কেন, এই তিনমাস ধ'রেই তো এই একই দুঃখ ভোগ করছে সে, এই একই ভাবনা অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে। তরঙ্গিণী যে-অধিকার দিয়ে একদিন তাকে নিয়ে এসেছিলেন ঘরে, সে-অধিকারের দাবি যেদিন থেকে চুকেছে সেদিন থেকেই এই গ্লানি। কিন্তু কী করবে? কোথায় যাবে? তা ছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত তরঙ্গিণী ছিলেন, কোথাও যাবার কথা এমন আকুল হ'য়ে ভাবে নি। কিন্তু আজ? আজকের অসম্মান সে রাখবে কোথায়?

তরঙ্গিণীর সঙ্গে কি তার মাত্র এই তিন মাসেরই সম্বন্ধ? আজ তিন বছর তিনি তাকে মাতৃস্নেহে ভ'রে রেখেছেন। এ-বাড়ির সঙ্গে তার দাদামণির বাড়ির মাত্র এক পুকুরের ব্যবধান। ঠাকুরপাড়া পেরিয়ে, আম-কাঁঠালের ছায়ায়-ছায়ায় একটু ঘুরে সরু হাঁটাপথও আছে একটি। নিতান্ত গ্রাম, বিবাহযোগ্য মেয়েদের ভারি পর্দা, তারা বড়ো-একটা বেরোয় না, এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘোরে না। বিশেষত যে-বাড়িতে বড়ো-বড়ো ছেলে আছে, যে-সব ছেলেরা কোনো-একদিন তাদের মাথায় সিঁদুর লেপে হাতে শাখা দিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে পারে সে-সব বাড়ির মাটি মাড়ানো তো অসম্ভব। হয়তো এমন জলের গ্রাম ব'লেই এমন পর্দা রক্ষা সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছে থাকলেই তো সব সময় সব জায়গায় যাওয়া যায় না। নৌকো চাই। সকলের ঘাটে-ঘাটেই ডিঙি বাঁধা, সকলের বাড়ির আনাচ-কানাচ পেরিয়েই তন্বী খাল এঁকে-বেঁকে চ'লে গিয়েছে পদ্মার দিকে। হাঁটাহাঁটির পাটই নেই। তবু কী জানি কেমন ক'রে হঠাৎ-হঠাৎ কোনো-কোনো বাড়ির সঙ্গে কোনো-কোনো বাড়ির একটা গভীর সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে। তাও হয়তো, যত ঘুর-পথেই হোক, একটি হাঁটাপথের সংযোগ থাকে ব'লে।

এত বড়ো ঘোমটা টেনে, সিল্কের চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে এই হাঁটাপথটুকু দিয়ে কত দুপুরের অবকাশে তরঙ্গিণী চ'লে গিয়েছেন তাকে দেখতে। সোমনাথ যখন কলকাতা থেকেছে কতদিন তাকে নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে, খাইয়েছেন যত্ন ক'রে, পরিপাটি ক'রে চুল বেঁধে দিয়েছেন, শুয়ে থেকেছেন কাছে নিয়ে। এ-বাড়িতে যে একদিন সে আসবে এ-কথা কোনোদিন মুখ ফুটে বলেন নি তরঙ্গিণী, তবু তাঁর মনের এই একান্ত গোপন বাসনা কেমন ক'রে যেন জেনে ফেলেছিলো তারা, সে-ও, তার দাদামণিও।

প্রথম-প্রথম অরুন্ধতীর মনে অবিশ্যি এ-রকম সম্ভাবনা উঁকিও মারে নি। ষোলো বছরের মাতৃহীন ক্ষুধিত হৃদয়ে এই মাতৃত্বের উত্তাপই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু কখন একদিন অনুভব করলো ধীরে-ধীরে তিলে-তিলে তরঙ্গিণী শুধু তাঁর মাতৃত্বের আস্বাদ দিয়েই তাকে ভ'রে রাখেন নি, তাঁর ছেলের প্রতি ছোট্ট একটি অনুরাগের বীজও ছড়িয়ে দিয়েছেন বুকের ভেতরে। তাকে তৈরি করেছেন, যোগ্য করেছেন। চোখের আড়ালে থেকেও একটি যুবক রং ধরিয়েছে তার প্রথম যৌবনের প্রথম বসন্তে।

সোমনাথ যখন ছুটিতে আসতো, খালের ও-পিঠে তার দাদামণির বাড়ির একটি ঘরের কোণে ব'সে সে যেন কাঁপতো, পায়রার বুকের মতো ধ্বকধ্বক করতো বুকের ভেতরটা। ভ'রে থাকতো হৃদয়। সে এসেছে, এইটুকু জেনেই পরিপূর্ণ সুখে আকুল হ'য়ে উঠতো। সোমনাথের নৌকো এসে যেদিন নির্দিষ্ট তারিখে ভিড়তো খালের ঘাটে, সিং-দরজা পেরিয়ে, কাছারি-ঘরের পেছনে এসে সে দাঁড়াতো নিঃশব্দে। থরোথরো বুকে। নৌকো থেকে সাঁকোর উপর দিয়ে খেজুর গাছের গুঁড়ির সিঁড়ি ভেঙে যতক্ষণ সোমনাথ বকুল-তলায় উঠে দাঁড়াতো, ঐটুকু দৃশ্যই এ-পারের ঘাট থেকে এইখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেতো সে। আর সেই পাওয়াটুকুর মূল্যের তখন কোনো পরিমাপ থাকতো না তার হৃদয়ে।

১৪

মুন্সীগঞ্জ থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েই অরুন্ধতী এখানে চ'লে এসেছিলো। পীতাম্বরবাবু নিজের শরীরের অক্ষমতা ক্রমশই এত বেশি টের পাচ্ছিলেন যে একা-একা আর কর্মস্থলে থাকতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। তাই নিজের দেশে, নিজের গ্রামে, জ্ঞাতিগোষ্ঠী বন্ধু আত্মীয় সকলের মধ্যে চ'লে এলেন তাড়াতাড়ি নাৎনিকে নিয়ে। পাত্রস্থ করবার ইচ্ছেতেই অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন তখন, কিন্তু এখানে এসে যে-পাত্রে ন্যস্ত করতে মন গেলো সে-পাত্র তখনো স্বাবলম্বী নয়। সোমনাথ সবে এম. এ.-তে ভর্তি হয়েছে। কথায়-কথায় কপাল-পর্যন্ত-ঘোমটা-ঢাকা তরঙ্গিণী একদিন অরুন্ধতীকে নিতে এসে বললেন, 'এই তো একফোঁটা মেয়ে, এখুনি বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন, কাকা। যাক না আর দু-একটা বছর। পাত্রের কি অভাব হবে?'

পীতাম্বর তামাকের নলে সুগন্ধি ধোঁয়া তুলে হাসলেন, 'তা এমন কথা যদি তুমি দাওই যে দু-বছর পরে আমার নাৎনির পাত্রের জন্য আমার আর কোনো ভাবনা থাকবে না, তাহ'লে কি আর আমার চোখের মণিটিকে এই ষোলো বছর বয়সেই আড়াল করি?'

কপালের ঘোমটা আর-একটু নামলো, একটু হাসি ফুটলো, তারপর অরুন্ধতীকে হাতের আলিঙ্গনে বুকের কাছে টেনে নিলেন তরঙ্গিণী। 'নয়নের মণি ব'লেই তো বলছি। এমন পূর্ণিমার চাঁদের মতো মুখখানা কে কবে চোখের আড়াল করতে চায়?'

তিন বছর কখন কেটে গেলো। সোমনাথ এম. এ. পাস করলো, চাকরি পেলো, মারা গেলেন পীতাম্বর বাঁড়ুজ্যে, ষোলো বছরের মেয়ে উনিশে পা দিলো। তারপর। তারপর কী? কেন এমন হ'লো? কেন হ'লো? হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো অরুন্ধতী।

নিস্তব্ধ ঘুঘু-ডাকা দুপুর। পশ্চিমের জানলা দিয়ে আড় হ'য়ে রোদ পড়েছে ঘরের মেঝেতে লম্বা হ'য়ে, দক্ষিণের বাতাসে উঠোনের কোণে অতসী গাছের ফুলে পাতায় ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার ঝকঝকে নীল আকাশ, চিল ভাসছে মাছের মতো। অরুন্ধতী মনের সমস্ত কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে ধীর পায়ে এ-ঘরে এলো।

সোমনাথ চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিলো একটি। অন্তত চোখ ছিলো বইয়ের পাতাতেই, কিন্তু মন ছিলো না, মাকে মনে পড়ছিলো তার। টুকরো-টুকরো, ছেঁড়া-ছেঁড়া কত কথার ভিড়। কত ছবি। কত স্মৃতি। এই বাড়ি, এই ঘর, এই বালিশ, এই বিছানা কত কথা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এই ঘরের এই জানলার শাড়ি-কাটা নীল পর্দা, বেড়ায় গোঁজা পুরোনো চিঠির গোছা, টাঙানো ফোটো, পাকানো পল্‌তে, শিশি-বোতলের সারি, ট্রাঙ্কের উপর ভাঁজ-করা কাঁথা, সব-কিছুতেই তো তার মা-র হাতের স্পর্শ লেগে আছে। এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে তার মা, অণু-পরমাণুতে তার মা। আর এই যে সে, এই যে সোমনাথ নামক শিক্ষিত বিবাহিত চাকুরে ভদ্রলোকটি, সেও তো তাঁরই রচনা।

সহসা তার সব ভাবনা ছিঁড়ে দিয়ে একটি ছায়া লম্বা হ'লো ঘরের মেঝেতে, তারপর সেই ছায়া ছোটো হ'য়ে-হ'য়ে আস্তে দরজার চৌকাঠ মাড়িয়ে ঘরে এসে থামলো। সেদিকে তাকিয়ে চকিত হ'য়ে উঠে বসলো সোমনাথ, তারপর অদ্ভুত একটা অস্বস্তিতে, আতঙ্কে অস্থির বোধ করলো মনে-মনে।

'আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিলো।' অত্যন্ত মৃদু কিন্তু খুব স্পষ্ট গলা অরুন্ধতীর।

'ও।'

'ব্যস্ত আছেন ?'

'না, আসুন।' সোমনাথ বইয়ের ভাঁজে আঙুল রেখে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো। অরুন্ধতী একটু এগিয়ে এসে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ঠিক ছবির মতো দাঁড়ালো। 'শুনলুম আপনি দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ।'

'ছুটি বোধহয় ফুরিয়ে গেছে ?'

'ছুটির জন্য কিছু নয়। যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি ততই আমার ভালো। কিন্তু সমস্যাটা অন্য রকম।'

কী রকম তা অরুন্ধতী জানে। তার শাদা কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম চিকচিক করলো, একটু লাল হ'য়ে উঠলো গালের কাছটা। দ্রুত গলায় বললো, 'আমার কথা ভাবছেন ? আমার জন্যে আপনি ভাববেন না। আমি দু-একদিনের মধ্যেই চ'লে যাবো এখান থেকে।'

'কোথায় ? কোনো আত্মীয়স্বজন কি—'

'না। আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। থাকলেও আমি তাদের চিনি না। চিনলেও যেতাম না।'

সোমনাথ সোজাসুজি ওর মুখের দিকে তাকালো। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'তাহ'লে কোথায় যাচ্ছেন ?'

'সে আমি ঠিক করেছি।'

'আমার জানা দরকার।'

একদিকের ভুরু ধনুকের মতো বাঁকালো একটু, কী-একটা কথা ঠোঁটের উপর এসেও নিঃশব্দে মিলিয়ে গেলো বুকের মধ্যে, বললো, 'হরিণডাঙা।'

'হরিণডাঙা ? সেখানে কে থাকে ?'

'চিনি না।'

'তবে ?'

'কাজ পেয়েছি।'

'কী কাজ ?'

'একজন ভদ্রমহিলার পরিচর্যা করা আর তাঁর ছোটো দুটি বাচ্চার দেখাশুনো—'

'ছি।'

অরুন্ধতী চোখ তুললো। সোমনাথ বললো, 'এ-সব কাজ আপনি কেন করবেন ? এ-কাজ তো খুব সম্মানের নয়।'

'জানি।'

'তবে ?'

অরুন্ধতী চুপ।

'আপনি বসুন, কয়েকটা কথা বলবো আমি।'

মস্ত তক্তপোশে বিছানা ওল্টানো। ঘরে ঐ একমাত্র আসন। সেই আসনে সোমনাথ নিজেই সমাসীন। আর মাথার কাছে বনাত-ঢাকা, বোধহয় সোমনাথের বাবার, একটি পুরোনো টেবিল।

'এখানেই বসুন।' হাতের বইটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে স'রে বসলো নিজে। একটু ইতস্তত করলো অরুন্ধতী, তারপর বসলো জড়োসড়ো হ'য়ে।

'আমার মা আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এমনকি মৃত্যুর সময়ে তিনি আপনাকেই তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী ক'রে গেলেন। কিন্তু আমি তো তাঁরই, তিনি আমাকে ক্ষমা করুন বা না করুন তবু আমি তাঁরই। তাঁর সমস্ত দায়িত্বও একান্তভাবেই আমার।'

'অন্য কোনো দায়িত্ব থাকলে তার কথা আমি জানিনে। আমার কথা ভেবে যদি এ-কথার উল্লেখ ক'রে থাকেন তাহ'লে সে-দায় তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই চুকে গেছে।'

'বরং তিনি বেঁচে থাকলেই এ-কথা কখনো উঠতো না আমার জীবনে। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে আপনার সমস্ত ভার আমার। আমি ন্যায়ত ধর্মত সে-ভার প্রতিপালনে বাধ্য।'

ঢোঁক গিললো অরুন্ধতী, পাটির উপর লাল-লাল চাঁপার কলির মতো আঙুলে রেখা কাটলো— কাঁপা-কাঁপা হাতে। সোমনাথ আবার বললো, 'তাই এমন কোনো কাজ আপনাকে আমি করতে দিতে পারি না যা আপনার যোগ্য নয়, এমন কোনো জায়গাতেও আপনাকে যেতে দিতে পারি না যেখানে সসম্মানে থাকা অসম্ভব। শুনুন—' ঝপ ক'রে জলে ডুব দিলো সোমনাথ, 'আমি আমার মা-র শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করবো ব'লেই মনস্থির করেছি, সে-কথা আমার ঠাকুমা-দাদুকেও জানিয়েছি আমি। আশা করি আপনার—'

যেন একটা বাজ পড়লো ঘরে এমন ভাবে চমকে উঠে স্থির হ'য়ে গেলো অরুন্ধতী। কতক্ষণ পর্যন্ত একটা ছুঁচ পড়ার শব্দ রইলো না। টিপিটিপি পায়ে একটা বেড়াল এসে চুপচাপ এলিয়ে শুলো রোদ্দুরটুকুতে, তারপর থাবা চাটতে লাগলো লাল জিব দিয়ে।

ঝিনুকের বুকে সমুদ্রের গর্জন। কিন্তু দমিত হ'লো। অনেক কষ্টে অরুন্ধতী ফিরিয়ে দিলো ঢেউ। আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে সহজ গলায় বললো, 'পয়লা তারিখেই আমি আমার কাজে গিয়ে পৌঁছবো লিখেছি। কিন্তু তার আগে হ'লেও ওদের আপত্তি নেই, বরং ভালো। তাই বলছি আপনার সঙ্গে যদি কলকাতা পর্যন্ত যেতে পারি—'

সোমনাথ আকর্ণ লাল হ'লো। একটা দুরন্ত লজ্জা, রাগ, অসম্মান সব মিশে বিদ্যুতের মতো ছুটে গেলো বুকের এ-পাশ থেকে ও-পাশ। মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ কঠিন হ'য়ে বললো, 'তাহ'লে কাজ নেওয়া আপনি স্থিরই করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ।'

'আমার সঙ্গে জিনিসপত্র বলতে গেলে খুবই কম। আপনার বোধহয় খুব অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক আছে।'

'আপনি তাহ'লে—'

'আমি কালই যাবো।' পরিত্যক্ত বইটা চোখের উপর তুলে নিয়ে কথা শেষ ক'রে দিলো সোমনাথ।

দ্বি তী য়

ত র ঙ্গ

১

কেতকী সোমনাথের টেলিগ্রাম পেয়েছিলো আগের দিন দুপুরবেলা। অতএব সে প্রস্তুতই ছিলো। ভোরবেলা ট্যাক্সি থামতেই ধড়মড়িয়ে উঠে এসে সহাস্যে দরজা খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করলো অরুন্ধতীকে। তখনো সকালের স্নিগ্ধতা কাটে নি, ভোর-ভোর গন্ধ লেগে আছে বাতাসে। কেতকীর উত্তরমুখো ফ্ল্যাটে সেই বাতাস এক-ঝলক ঠাণ্ডা হাত বুলোলো। সামনে একটু জমি, সেই জমিরই এক কোণে সিঁড়ি ঘেঁষে মালতীলতার ঢেউ উঠে গেছে দেয়াল বেয়ে। হাওয়া লেগে শিরশিরিয়ে উঠলো লতাপাতা, আন্দোলিত হ'য়ে সুবাস বিলোলো।

সোমনাথ গাড়ি থেকে নেমে পরিচয় করিয়ে দিয়েই সোজা চ'লে গেলো ভেতরে। যেতে-যেতে একমুহূর্তের জন্য চোখোচোখি হ'লো স্ত্রীর সঙ্গে, মনে হ'লো একটু যেন মেঘ জমেছে সেখানে, বাতাস যেন থমকেছে একটু।

আর অরুন্ধতী নেমে এদিক-ওদিক তাকালো অসহায়ের মতো। তার ক্লান্ত, দুঃখের কারুণ্যে আনত মুখশ্রীতে একটা চকিত হরিণের ভাব ফুটলো। একখানা নীলাম্বরী শাড়ির আঁচলে সমস্ত গা ঢেকেছে ভালো ক'রে, শাদা পায়ে লাল স্ট্র্যাপের জুতো পাড়ের মতো রেখা টেনেছে। চুলের কালো আর শাড়ির কালোর ফ্রেমে মুখখানা ফুটে আছে ফুলের

মতো। কেতকী কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সেই সুন্দর মুখের দিকে। তারপর হাত ধ'রে তাকে ঘরে নিয়ে এলো।

'শুনেছি ঢাকা মেইলে বড্ড ভিড় হয়, রাত্তিরে নিশ্চয়ই ঘুমুতে পারো নি, না? কাপড়-চোপড় বার ক'রে নাও, আমি আসছি।' কিন্তু একটু পরেই ফিরে এলো, 'ঘরটা ছোটো, তোমার খুব অসুবিধে হবে?'

'না, না।' অরুন্ধতী অস্থির হ'য়ে উঠলো সংকোচে।

'এবার চলো হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে চা খাবে।'

শাড়ি আর তোয়ালে হাতে নিয়ে ট্রাঙ্ক বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ালো অরুন্ধতী, বড়ো-বড়ো চোখ স্থির হ'লো কেতকীর মুখের উপর। পদ্মা-পারের মেয়ে, এখানকার এই কলকাতা শহরের হালচালের সে জানে কী! কেতকীর বিষয়ে তার কুণ্ঠার অন্ত ছিলো না। স্টেশন থেকেই ট্রেন ধ'রে চ'লে যেতে চেয়েছিলো হরিণডাঙা। সোমনাথ বললো, 'তা কী ক'রে হয়? এটা তো শেয়ালদ', হরিণডাঙা যেতে হ'লে আপনাকে যেতে হবে হাওড়া। পথ চেনেন? কখন ট্রেন তা জানেন? সেখানকার লোকদের খবর দিয়েছেন যে আজ যাবেন?'

'না তো।'

'তবে?'

অরুন্ধতী যতক্ষণ ভাবলো, সোমনাথ ততক্ষণে ট্যাক্সিতে মাল তুলে বললো, 'উঠুন।'

কিন্তু কাকে ভয় এখানে? শ্যামবর্ণ লাবণ্যে ঢলোঢলো এই হাসিখুশি মানুষটিকে? এলোমেলো শাড়িতে, পায়ের আধো-ঢোকানো কাজ-করা চটিতে, সহৃদয় ব্যবহারে, সব মিলিয়ে বরং কেমন নির্ভরই পেলো সে মনে-মনে। একটু পরে দৃষ্টি নামিয়ে পা বাড়ালো।

স্বামীর স্ত্রী হবার জন্যে নির্বাচিত মেয়েকে একটুও কৌতূহলের চোখে

দেখবে না, ঈর্ষার পিঁপড়ে একটুও কামড় দেবে না, এত বড়ো দরাজ বুক আর ক'জন মেয়ের হয়? শাশুড়িকে কেতকী ত্থাখে নি, কিন্তু এত শুনেছে যে তাঁর চলন-বলন স্বভাব-চরিত্র পছন্দ-অপছন্দ সবই তার নখদর্পণে। আর সেই শাশুড়ির মনোমতো মেয়ে। কাল সোমনাথের টেলিগ্রাম পেয়ে থেকে আজ ওকে না-দেখা পর্যন্ত দিন-রাত কত কথাই ভেবেছে সে। ট্রাঙ্কে বাক্সে আলনায় জুতোয়, বাজে জিনিসে ঠাসা এই পুব-কোণের ছোটো ঘরটি এই মেয়ের জন্য পরিষ্কার করতে-করতে কতবার বিরক্ত বোধ করেছে মনে-মনে, হাত ঝেড়ে চ'লে গেছে নিজের ঘরে, আবার ফিরে এসেছে। কতবার অকারণ অভিমানের একটি পাৎলা আবরণ কুয়াশার মতো ঝাপসা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে মনের আনাচে-কানাচে। কিন্তু এই কি সেই? আঠারো উনিশ বছরের কাঁচা মেয়েটি? ভয়ে বিহ্বল দুটি চোখ, আত্মসমর্পণে উদ্যত অসহায় একটি ঘরছাড়া স্বজনবিহীন মানুষ। কেতকীর তেইশ বছরের, আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় স্নেহকোমল হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে উঠলো। কাছে স'রে এসে আস্তে হাত রাখলো পিঠে, 'এত সংকোচ কিসের? আমাকে দেখে কি তোমার ভীষণ একটা ভয়াবহ কিছু মনে হচ্ছে নাকি?' শাদা দাঁতে ঝিরঝিরিয়ে হাসলো। 'ওঠো, তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে চা খেয়ে চাঙ্গা হও।'

বাধ্য মেয়ের মতো পায়ে-পায়ে চলতে-চলতে অরুন্ধতী হঠাৎ কেতকীর উষ্ণ হাতের পাতায় নিজের ভয়ে-ঠাণ্ডা-হ'য়ে-যাওয়া হাত দুটি চেপে ধরলো, আর এই সামান্য স্পর্শটুকুতেই ভারা সম্পর্কের সমস্ত বিরোধিতা লঙ্ঘন ক'রে, অপরিচয়ের বাধা ডিঙিয়ে, অনাত্মীয়তার সংকোচ কাটিয়ে মুহূর্তে কাছের মানুষ হ'য়ে উঠলো। অরুন্ধতীর শুকনো চোখ ঝাপসা হ'লো পলকের জন্য।

সোমনাথ ততক্ষণে জামাকাপড় না-ছেড়েই বেডকভার ঢাকা যুগল-শয্যায় গা এলিয়ে শুয়ে ছিলো। নানাদিক থেকে মনটা যেন একটা ফাঁপা, ফাঁসা বেলুনের মতো চুপসে গেছে তার। গ্রামের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিঁড়ে এসে কেমন শূন্য লাগছিলো সব। তার উপর কেতকীর গম্ভীর মুখের অর্থটা আন্দাজ ক'রে আরো অসহায় লাগলো নিজেকে।

'এ কী, শুয়ে পড়েছো কেন?' একটু পরে অত্যন্ত সহজভাবে কাছে এসে মাথার চুলে হাত ডোবালো কেতকী। দেখা গেলো তার মুখের ভাব দিব্যি মেঘহীন আকাশের মতো স্বচ্ছ। সোমনাথ চোখে-চোখে তাকিয়ে সবেগে কাছে টেনে নিলো তাকে। তারপর কোমল গলায় বললো, 'রাগ করেছো?'

হেসে উঠলো কেতকী, 'কেন? রাগ করবো কেন?'

'তবে গম্ভীর যে?'

'কোথায় গম্ভীর। নাও, ওঠো, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো যে—'

'ভালো ছিলে?'

'খুব।'

'তা তো থাকবেই। আমি না-থাকলেই ভালো, না?'

'আর তুমি বুঝি খুব খারাপ ছিলে?' দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ কামড়ালো কেতকী, তারপর স্বামীর আলিঙ্গন থেকে স'রে এসে সহাস্যে বললো, 'তা যাই বলো, তোমার চাইতে তোমার মা-র পছন্দ কিন্তু অনেক ভালো।'

'কেকা!'

'ভাগ্যটা নেহাৎই মন্দ, কী আর করবে বলো!'

সোমনাথ চুম্বন ক'রে মুখ বন্ধ ক'রে দিলো তার, 'ওরকম বোলো না, বোলো না। আমার মন এখনও বড়ো অস্থির, বড়ো ব্যাকুল, নিষ্ঠুরের মতো

কথা বোলো না তুমি।' কয়েক ফোঁটা চোখের জল তার গড়িয়ে পড়লো কেতকীর হাতের পাতায়। অপ্রস্তুত হ'য়ে কেতকী চুপ করলো। শার্টের বোতাম ক'টা খুলে দিয়ে বুকের উন্মুক্ত অংশে সস্নেহে হাত বুলিয়ে একটু হাসলো। 'কী তুমি। একটা সামান্য ঠাট্টা সইতে পারো না! চলো, চা খাবে, সব তৈরি ক'রে রেখেছি।'

২

ছোটো ফ্ল্যাট। মাত্রই তিনখানি ঘর। যেখানা একটু বড়ো আর খোলা সেটাকে কেতকী শোবার ঘর করেছে, মাঝখানের ঘরটি তার চেয়ে ছোটো, কিন্তু চৌকো। বেতের চেয়ার টেবিল পেতে, রঙিন পর্দা লাগিয়ে, মেঝেতে ফুল তোলা মস্ত মাদুর বিছিয়ে বেশ ছিমছাম একটি বসবার ঘর, আর ও-পাশের ঘরটা প্রায় গুদোম। সংসারের যত অচল পদার্থ আর ট্রাঙ্ক-বাক্সের বসবাস সেখানে। সেটাকেই ধুয়ে-মুছে সংস্কার ক'রে জিনিসপত্র সরিয়ে অরুন্ধতীর থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ-পাশে, ভেতর দিকে তিনঘর-সংলগ্ন লম্বা সরু কাচ-ঢাকা বারান্দা। তারই খানিক অংশে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা।

রান্নাঘরটুকু বৃন্দাবনের দখলে। ঢিলে মানুষ, একটা করে তো আর-একটা প'ড়ে থাকে, একবারের বেশি দু-বার ডাকলে দিশেহারা হ'য়ে যায়। একগ্লাশ জল চাইলে চারটা গ্লাশে হাত বুলোয়। কাজেই ক্রমাগত কেতকীকেই ছুটোছুটি করতে হয় সব সময়। চা দিয়ে একবার গেলো দুধ আনতে, একবার ডিমের গোলমরিচ, মাখনের বাটি, আর যতবার কেতকী উঠে-উঠে গেলো, অরুন্ধতীর ততবারই এত অস্বস্তি লাগলো যে ইচ্ছে হ'লো সে নিজেই উঠে গিয়ে সমস্তটা একেবারে ঠিক

ক'রে নিয়ে আসে। বিপত্নীক দাদামশায়ের ঘরের পাকা গিন্নি সে, আর এতদিন তরঙ্গিণীর শিক্ষাও তো তার উপর দিয়ে কম যায় নি, উপরন্তু, স্বভাবতই সে অত্যন্ত কাজের। কখন যে একসময় উঠে গেলো সে কেতকীর পেছন-পেছন, নিয়ে এলো টোস্ট-করা রুটি, হাত ধোবার জলের বাটি, যতক্ষণ চা ঢাললো কেতকী, মাখন লাগালো রুটিতে। গোলমরিচের পাত্রটির অচল ফুটোগুলো সচল করলো সেফটিপিন ফুটিয়ে-ফুটিয়ে।

একটু আলাপের চেষ্টা করলো সোমনাথ, 'আপনি কি এই প্রথম কলকাতায় এলেন ?'

'খুব ছেলেবেলায় এসেছিলুম, তখন বাবা বেঁচে ছিলেন।'

'আপনার মাকে আমার ধুধু মনে পড়ে।'

'আমার মা!' মা বলতে অরুন্ধতীর তরঙ্গিণীকেই মনে পড়লো। মুহূর্তের জন্য বিমনা হ'য়ে গেলো সে।

কেতকী বললো, 'হরিণডাঙায় তোমার কী কাজ ? কোনো স্কুলে ?'

অরুন্ধতী মাথা নাড়লো, 'না, না, ওখানকার জমিদারের স্ত্রী অসুস্থ। বাচ্চা আছে দুটি, সকলের দেখাশুনো করা—'

'ও মা, এ-কাজ তুমি নিচ্ছো কেন ? না না—'

সোমনাথ বললো, 'আমি তো তাই বলছিলাম। বরং আপনি পড়াশুনো করুন না। অন্তত ম্যাট্রিকটা তো পাস করুন।'

'ম্যাট্রিক !' মুখ তুলে অবাক চোখে তাকালো অরুন্ধতী।

সোমনাথ আবার বললো, 'তাতে আপনার কাজকর্মের অনেক সুবিধে হবে।' কেতকী যোগ দিলো, 'তাই তো। সেটাই তো ভালো।'

'আমি— আমি তো—'

'আপনার যদি স্কুলে ভর্তি হ'তে খারাপ লাগে, বাড়িতেই পড়তে পারেন।'

'মাস্টারও মজুত আছে বাড়িতে।' স্বামীর সঙ্গে পলকের জন্ম চোখোচোখি করলো কেতকী। আর সোমনাথ তৎক্ষণাৎ কিন্তু-কিন্তু হ'য়ে পড়লো।

অরুন্ধতী বললো, 'আমি তো ম্যাট্রিক পাস করেছি।' একটু থেমে, ঈষৎ দৃঢ় গলায় আবার বললো, 'স্কলারশিপও পেয়েছিলুম।' হঠাৎ কোথায় যেন একটু অপমানিত বোধ করছিলো সে।

'স্কলারশিপ! স্কলারশিপ পেয়েছিলেন!' অবাক হ'লো সোমনাথ, তার পরেই উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো, 'বাঃ তাহ'লে তো আর কথাই নেই।'

কেতকী বললো, 'কী আশ্চর্য! এ-কথাটাও তুমি জানতে না নাকি?'

'আমি কী ক'রে জানবো?'

'এক গাঁয়ের ছেলে মেয়ে— এতদিন তোমাদের বাড়ি রইলো—'

'হয়তো শুনেছিলেন, ভুলে গেছেন।' কেতকীর মুখে চোখ রাখলো অরুন্ধতী। এক ফোঁটা হাসি চোখের কোলে ঝিলিক মেরে উঠলো, 'তা ছাড়া চেহারায় নিশ্চয় এমন কোনো বোকামি আছে যাতে ওটা ভাবাই যায় না।'

'না, না, তা মোটেও নয়—' চেয়ার ছেড়ে উঠলো সোমনাথ, 'কিন্তু আমাকে যে উঠতে হচ্ছে। আবার আপিশ আছে।'

'আজ আপিশে যাবে নাকি?'

'না গেলে চাকরি থাকবে না।'

'ও মা। তাহ'লে তো আমাকেও উঠতে হয়। বাজারই যে বাকি।'

অতএব সকালবেলাকার চায়ের আসর সেখানেই ভাঙলো।

এ-সময়টাতে ভারি একটা তাড়াহুড়ো লাগে। সোমনাথ অনেক চেষ্টা ক'রেও দুপুরের ভাতটা ছাড়তে পারে নি, নইলে এ-হাঙ্গামটা বাঁচতো।

যা হোক, রুটি, মাখন, ডিম, কলা এ-সব দিয়ে যদি ব্রেকফাস্ট ক'রে যেতো আর আপিশে একটার সময় আরো-অনেকের মতো লাঞ্চ খেতো তাহ'লেই সবদিকে ভালো ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু তার ভীষণ ভাতের অভ্যেস। ঝোল-ভাতটি তার চাই-ই। অথচ রান্নার ব্যাপার এ-বাড়িতে যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই সুবিধে, কেননা, কটকনিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র রাঁধুনি হিসেবে তো বটেই, কাজেকর্মেও দুরন্ত আনাড়ি। আজ আরো বাড়লো। বোধহয় এতদিন পরে দাদাবাবুকে দেখে আর তার সঙ্গে অমন সুন্দরী দিদিমণিটির যোগাযোগে সে আরো ঘাবড়ে গেছে। বাজারে গিয়ে সেই যে লেগে রইলো আর ফেরবার নামটি নেই। অস্থির পায়ে ঘর বার করতে লাগলো কেতকী। বারে-বারে বলতে লাগলো, 'আজই শেষ। ওকে আর আমি কিছুতেই রাখবো না, যেমন ক'রে হোক আর-একটা আনবোই আনবো।' তারপর সোমনাথ যখন দাড়ি কামিয়ে স্নানে গেলো, ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে-আট ছাড়িয়ে প্রায় ন-এর ঘর ধরো-ধরো তখন এসে উপস্থিত একগাল হেসে। 'আজ-অ বজারে কী হয়থেলো মা জান-অ।'

'আজ বাবুর আপিশ তা তুমি জানো?' এক ধমক দিলো কেতকী, 'বাজারে কী হয় না-হয় তা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

ধমক খেয়ে লজ্জিত তরুণীর মতো সে গা মোচড়ালো, এতখানি জিব কাটলো, তাড়াতাড়ি থলি থেকে মাছ বার ক'রে ঝুড়িতে তরকারি সাজাতে বসলো।

'আরে বাপু, তরকারিটা না-হয় পরেই সাজিয়ো।' কেতকীর অস্থিরতা প্রায় রাগে পৌঁছলো— 'দয়া ক'রে আগে মাছটার আঁশ ছাড়িয়ে দাও। মশলা করেছো? না তাও বাকি?' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেলো তার। বৃন্দাবন অমনি মশলা খুঁজতে লাগলো এ-কৌটো থেকে ও-কৌটোয়।

'ওঃ; গড্!' কেতকী করাঘাত করলো কপালে, 'এখন তুমি মশলা খুঁজছো?'

'থেল তো মা সবি।'

'ছিলো তো গেলো কোথায়? যাও, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। দাও উমুন নিবিয়ে, ইডিয়ট কোথাকার।'

'আমার কাছে দাও।' কখন এসে অরুন্ধতীও দাঁড়িয়েছে পেছনে, গলা শুনে ফিরে তাকালো কেতকী।

'আলু-পেঁয়াজ তো আছে, তাহ'লেই হবে।' উবু হ'য়ে বৃন্দাবনের হাত থেকে মাছটা নিতেই সনির্বন্ধ হ'য়ে উঠলো কেতকী, 'ও কী, না, না, ছি, তুমি কেন?'

অরুন্ধতী মাছটা ধুয়ে নিলো, 'বা রে, তাতে কী হয়েছে?' সদ্য-সাজানো ঝুড়ি থেকে আলু-পেঁয়াজ নামিয়ে নিয়ে কুচোতে বসলো বঁটিতে। 'এক্ষুনি হ'য়ে যাবে।'

'না, না, তুমি ওঠো। হাঁ ক'রে দেখছিস কী? যা, ছুটে যা, মশলা নিয়ে আয়। দাও, আমাকে দাও।'

'বৃন্দাবন—' ঘর থেকে সোমনাথের গলা পাওয়া গেলো, 'মাকে একবার শিগ্‌গির পাঠিয়ে দাও তো—'

'ওই রে, স্নান ক'রে এসেছে। কী হবে বলো দেখি!' কাঁদো-কাঁদো কেতকী ছুটলো ঘরের দিকে। সেই অবসরে গুছিয়ে নিলো অরুন্ধতী। হাওয়া দিয়ে গন্‌গনে ক'রে নিলো উমুন, কড়াইতে তেল চাপিয়ে দিলো। বৃন্দাবন অপরাধীর মতো বললো, 'মশলা আনি দিব-অ?'

'একটু হলুদ আছে?'

'হলুদ?'

'এই যে, এতেই হবে।' শেল্‌ফের উপর মশলার থালাটি আবিষ্কার

করলো অরুন্ধতী। শুকনো হলুদ লেগে আছে খানিকটা। পেঁয়াজ-কুচো, আলু, মাছ, হলুদ মাখিয়ে সব একসঙ্গে ছেড়ে দিলো কড়াইতে। কাঁচা লঙ্কা আস্ত দিলো, ভেঙেও দিলো দুটি, নুন মিষ্টি দিয়ে ভাজা-ভাজা ক'রে সাঁৎলে নিয়ে ছিটে-ছিটে জল দিয়ে চমৎকার সুগন্ধ বার করলো। কেতকী ফিরে আসতে-আসতে নামিয়ে নিলো কড়াই।

'ও কী, হ'য়ে গেলো ?'

'ভাত বেড়ে দিই ?'

'সে কী !' আশ্চর্য চোখে নিচু হ'য়ে নিরীক্ষণ করলো শুকনো-শুকনো মাছের লালচে চেহারাটি। 'কিচ্ছু মশলা দিলে না আর হ'য়ে গেলো ? বা, বেশ তো।'

'বৃন্দাবন, ভাত আনো।'

'এই যাউচি।' বাবুর গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাকুলভাবে থালা প্লেট হাৎড়াতে লাগলো বৃন্দাবন।

পরিপাটি ক'রে অরুন্ধতীই বেড়ে দিলো ভাত।

বৃন্দাবন নিয়ে গেলো, কেতকী গিয়ে বসলো খাবারের কাছে।

খেতে ব'সে মাছ মুখে দিয়ে একটু অবাক হ'লো সোমনাথ। এ-আস্বাদ তার চেনা। এ-রান্না তরঙ্গিণীর হাতের বিশেষত্ব। বুকের কোথায় মোচড় খেলো একটি। মন্তব্য করলো না কোনো।

কিন্তু দুপুরবেলা খেতে ব'সে মন্তব্য করলো কেতকী, 'ও মা, কী চমৎকার হয়েছে। মশলা ছাড়া এমন সুন্দর হয় ? কী সুন্দর রাঁধো তুমি। আর কী তাড়াতাড়ি।'

অরুন্ধতী লজ্জিত হ'য়ে প্রসঙ্গটা বদলালো, 'আপনি কখনো গ্রামে গিয়েছেন ?'

'গ্রাম ? না ভাই। কত যে শুনেছি ওঁর কাছে, প্রায় চিনে

ফেলেছি। আচ্ছা—' একটা প্রশ্ন গলার কাছে এসে আটকে গেলো কেতকীর।

কয়েক মুহূর্ত মনোযোগ দিয়ে ভাতের গরাসটা পাকালো আর ভাঙলো, তারপর হঠাৎ জিগেস করলো, 'সোমনাথকে তো তুমি অনেক আগে থেকেই চেনো, না?'

'না তো।' অরুন্ধতী বড়ো-বড়ো চোখে তাকালো কেতকীর মুখের দিকে। কেতকী ঈষৎ আরক্ত হ'লো। কিন্তু কৌতূহল দমন করতে পারলো না। 'বাঃ, এক গাঁয়ে থেকেছো, তোমার দাদামশাই এঁর ঠাকুরদার বন্ধু, আর গ্রামে তো সবাই সকলকে চেনে।'

'আমি ওঁকে এই প্রথম চিনলুম।'

'ও। তা ওঁর মাকে তো তুমি বহুদিন থেকে চেনো, না?'

'মা!' চোখের পাতা দুটি কেঁপে উঠলো অরুন্ধতীর। 'এই তিনবছর তো তাঁরই কাছে ছিলুম বলতে গেলে। যতদিন থেকে গ্রামে এসেছি মায়ের অভাব আমার মিটে গিয়েছিলো।'

'তখনো ত্যাখো নি সোমনাথকে?'

'আপনি তো পূর্ববাংলায় যান নি। জলের দেশ। আর আমাদের গ্রাম তো একেবারেই জল। কোনো বাড়ির সঙ্গে কোনো বাড়ির মাটির যোগ নেই, কেবল নৌকো, নৌকো আর নৌকো। পর্দাও তো খুব। আর তা ছাড়া—' কী ভেবে থেমে গেলো অরুন্ধতী, কেতকীও মাথা নিচু ক'রে খেতে মন দিলো। হঠাৎ একটা গুমোট নামলো দু-জনের মধ্যে।

খেয়ে উঠে কেতকী দুটো মিঠে পান আনতে পাঠালো, হেসে বললো, 'আজকাল আমার এই এক বদভ্যেস হয়েছে, ভাত খেয়েই একটা পান খেতে ইচ্ছে করে।'

'বাড়িতে ব্যবস্থা রাখলে তো বেশ হয়। যখন খুশি তখন খেতে পারেন।'

'হ্যাঁহ্‌। তুমিও যেমন, বাড়িতে আবার ব্যবস্থা না হাতি। ঝামেলা ভালো লাগে না আমার। সত্যি বলতে এই বদভ্যেসের জন্য সোমনাথই দায়ী। বেরুলেই বলবে— এসো একটা মিঠে পান খাই। তারপর ছুটিছাটার দিন হ'লে তো কথাই নেই। মাঝখান থেকে আমার অভ্যেস খারাপ হয়েছে।'

'এবার থেকে আমি সেজে দেবো। দাদামণি খুব পান খেতেন। আমি ডিবে ভ'রে-ভ'রে সেজে রাখতাম।'

'তুমি আর ক'দিন।'

'তাই তো।' না-ভেবে এমন একটা কথা ব'লে অপ্রস্তুত হ'লো অরুন্ধতী।

তবে কি মনে-মনে তার এখানেই বরাবর থাকবার ইচ্ছে নাকি? জানলা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলো চোখ।

পান নিয়ে এলো বৃন্দাবন। কেতকী অরুন্ধতীকে একটা দিয়ে আর-একটা নিজে খেলো। তারপর অরুন্ধতীকে তার ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়ে বললো, 'এবার একটু বিশ্রাম করো তুমি। আমিও গড়িয়ে নিই।'

৩

ছোট্ট লোহার খাটে চুপচাপ শুয়ে রইলো অরুন্ধতী। ঘরটি ছোটো হ'লেও আলো আছে, বাতাস আছে। পুবদিকে মস্ত একটি দরজার মতো জানলা দিয়ে অনেকটা আকাশ ঘরে আসতে পেরেছে। চারপাশে তাকিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগলো নিজের এই স্রোতে ভাসা জীবনটাকে। অদ্ভুত ভবিতব্য। মা, বাবা, দাদামণি, তরঙ্গিণী কোথায় মিলিয়ে গেলো ভোজবাজির মতো। তরী এসে এখানে ঠেকলো, এই সোমনাথের

সংসারে। হাসিতে ঠোঁট বেঁকলো তার। কিন্তু এই শেষ নয়। আরো আছে। আছে সেই জমিদারের অসুস্থ স্ত্রী, ছোটো-ছোটো দুটি বাচ্চা। হরিণডাঙার মাটি। কোথায় হরিণডাঙা? কেমন দেশ। নামটা তো সুন্দর। বাচ্চা দুটো কেমন? তাদের মা? তাদের বাবা? না-কি হরিণডাঙা না। কলকাতাতেই। এই ঘরেই। এই বাড়িতেই। কেতকী তো তার জন্য সাজিয়েই রেখেছে সব। কেমন সুন্দর। ছোটো খাট, বড়ো জানলা, দেয়ালে ব্রাকেট, ব্রাকেটে তোয়ালে। টেবিলে আয়না, আয়নার তাকে পাউডার, পুবের জানলায় আকাশে-আকাশে মেঘ, মেঘের মধ্যে চিলের ডানা। কেতকী সব ঠিক ক'রে রেখেছে, সব গুছিয়ে রেখেছে। আর নিজে কী ভালো। কী ভালো। আর ওই যে আর-একজন মানুষ। যার নাম সোমনাথ। যে-সোমনাথ তার স্বপ্ন, তার কল্পনা। যাকে সে একটু-একটু ক'রে ভালোবেসেছে, ধীরে-ধীরে তিলে-তিলে যে-মানুষ তার সব চাইতে কাছের মানুষ হয়েছে, সব চাইতে আপন, সব চাইতে সুন্দর, মধুর, প্রিয়, সেই সোমনাথ— সোমনাথ— সোমনাথ—

গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে গেলো অরুন্ধতীর ক্লান্ত শরীর আর ক্লান্ত মন। ছেঁড়া-ছেঁড়া কথা, ছেঁড়া-ছেঁড়া ছবি, টুকরো-টুকরো চিন্তা কোন তিমিরে ডুবে গেলো আস্তে-আস্তে।

সেই ঘুম ভাঙলো বেলা পাঁচটায় কেতকীর ঠেলাঠেলিতে। অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে লাল-লাল চোখে উঠে বসলো তাড়াতাড়ি।

সোমনাথ এসে গেছে আপিশ থেকে। চা প্রস্তুত। শুধু অরুন্ধতী গিয়ে বসলেই হয় টেবিলে।

সোমনাথ বললো, 'আপনার হরিণডাঙার বিষয়ে আজ অনেক খবর এনেছি।'

অরুন্ধতী চোখ তুললো।

'কিন্তু আশাপ্রদ নয়।'

'মানে?' কেতকী নিচু হ'য়ে চা ঢালছিলো, ভুরু কুঁচকালো।

'মানে যে-ভদ্রমহিলাকে ওঁর সেবা করতে হবে তাঁর অসুখ বোধ করি শরীরের নয়, মস্তিষ্কের।'

'ওরে বাবা, পাগল নাকি গো?'

'তাই তো মনে হ'লো।'

'এত সব বললো কে?'

'আমাদের ব্যাঙ্কে নতুন একটি ছেলে এসেছে কেরানি হ'য়ে। আজ হঠাৎ কথায়-কথায় জানলাম তার দেশও হরিণডাঙা।'

'বাঃ, বেশ তো যোগাযোগ।'

একটু যেন বাঁকা লাগলো কেতকীর কথা, সোমনাথ সহসা সচেতন হ'য়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো। তারপর একেবারে চুপ হ'য়ে গেলো।

'তাহ'লে তো আমার মনে হয়—' চায়ের পেয়ালাটা ঠেলে দিয়ে গুছিয়ে বসলো কেতকী, 'এ রকম ক্ষেত্রে না-যাওয়াই ভালো। আর তা ছাড়া সকালে তো এ-কথাই হ'লো যে আপাতত ও হরিণডাঙা যাচ্ছে না। সাত-তাড়াতাড়ি তুমিই বা অত খবরাখবর করতে গেলে কেন?'

সোমনাথ ঘন-ঘন গরম চায়ে চুমুক দিতে লাগলো।

অরুন্ধতী চুপ। কেতকীই আবার কথা বললো, 'কিছু বলছো না যে, এর পরেও কি তোমার ওই হরিণডাঙার উন্মাদিনীকে সেবা করতে যাবার সাধ আছে?'

অরুন্ধতী মৃদু হাসলো। 'সাধ আর কী, দেখে আসি না ক'দিন। তারপর তো আমার একটা জায়গাই হ'লো চ'লে আসবার।'

'মাস শেষ হ'তে আরো তো সাতদিন দেরি আছে—' সোমনাথ বললো, 'তার মধ্যে আমি আপনাকে সমস্ত খবর এনে দিতে পারবো, তারপর একেবারে আপনি পয়লা তারিখেই যেতে পারবেন।'

'কেন, জলে পড়েছে নাকি যে পাগল-ছাগল যা-ই হোক যেতেই হবে? পড়াশুনো করুক না।'

অরুন্ধতীর কৃতজ্ঞ দৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে রইলো কেতকীর মুখের উপর। এত অল্প সময়ে এমন আপন ক'রে নিতে আর কাউকে ছাখে নি সে। গ্রামের চেয়ে শহর অনেক ভালো, শহরের মানুষেরা তার চেয়েও ভালো, আর এই কেতকী, সোমনাথের স্ত্রী, সে আরো, আরো, আরো ভালো। তাই বুঝি সোমনাথ সব-কিছুর চেয়েও এই মেয়েকেই বেশি ভালোবেসেছিলো। যার চেয়েও—

'তাকিয়ে কী দেখছো? কাল থেকে মনস্থির ক'রে পড়াশুনোয় লেগে যাও, বুঝলে?'

মাথা নাড়লো সোমনাথ, 'সে তো ভালো কথা। লেখাপড়ায় এত ভালো ছিলেন আপনি—'

'তুমিও মনোযোগ দিয়ে মাস্টারিতে লেগে যাও, সবদিক থেকে এমন যোগ্য ছাত্রী আর কোথায় পাবে, কী বলো?' চেয়ার ঠেলে কেতকী উঠে পড়লো হঠাৎ, 'তোমরা বোসো। আমার একটু কাজ আছে।'

অরুন্ধতী সরল চোখে তাকিয়ে রইলো তার চ'লে যাওয়ার দিকে। সোমনাথ বুঝতে পারলো না চ'লে যাবার মতো সহসা এমন কী জরুরি কাজ পড়লো কেতকীর। কেমন অপ্রস্তুত বোধ করলো মনে-মনে।

রাত্রিবেলা একটু যেন থমথমে লাগলো শোবার ঘরটা। সুন্দর হাওয়া দিয়েছে বাইরে, পর্দা কাঁপিয়ে তারই ছিঁটে-ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের

আনাচে-কানাচে। নীলচে আলোটা জ্বলছে টেবিলে। ছায়া-ছায়া ঘরটিতে কেমন যেন একটা বিষণ্ণ ভাব। পুরো উনিশ দিন পরে স্বামী-স্ত্রীর এই নিভৃত মিলন। এর চেয়ে উষ্ণ হওয়া উচিত ছিলো, এর চেয়ে উন্মুখ। কেতকী পাশ ফিরে শুয়ে আছে চুপচাপ। সোমনাথ আলো নিবিয়ে আস্তে হাত রাখলো পিঠে। সমস্ত জীবন থেকে, জগৎ থেকে আজ মুছে গেছে তরঙ্গিণী। সোমনাথের মা, সোমনাথের আত্মার সঙ্গিনী মা। এত বড়ো শোক উপশমের পক্ষে উনিশ দিন একটা পলকমাত্র। গ্রাম ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, মায়ের সমস্ত স্মৃতি মুছে দিয়ে আজ একান্ত হ'য়ে সোমনাথ হাত পেতেছে স্ত্রীর কাছে, আজ কি কেতকীর মুখ ভার করা উচিত ছিলো? আর কেন এই ভার? কী করেছে সোমনাথ? ধরা-ধরা গলায় বললো, 'ঘুমুলে?'

'না।'

'এদিকে ফেরো।'

'কেন?'

'রাগ করেছো?'

'না।'

'তবে কথা বলছো না যে?'

'কী বলবো?'

'এতদিন পরেও কি তোমার আমার সঙ্গে কোনো কথা নেই?'

'ঘুম পেয়েছে।'

'অনেক তো ঘুমিয়েছো উনিশ দিন।'

'ঘুমের শেষ আছে নাকি? আমার শরীর ভালো লাগছে না।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করলো সোমনাথ। ছেলেমানুষের মতো কেমন কান্না পেলো তার। কেতকী অনায়াসে আজ এই কান্না তার জুড়িয়ে

দিতে পারতো, দিলো না। কেন? কেন? স'রে শুয়ে বালিশের নরমে মুখ গুঁজলো।

ইচ্ছে হ'লেই যাকে পাওয়া যায় তাকে তৎক্ষণাৎ না-পেলেও ক্ষতি নেই। ইচ্ছে করলেই যাকে ছোঁয়া যায় তাকে দু-দণ্ড না-ছুঁলেও চলে। ইচ্ছেমেতা যাকে দেখতে পাই তাকে না-দেখে বছর ভ'রে পরীক্ষার পড়ার অছিলায় কলকাতা থাকা যায়, কিন্তু যে-মুহূর্তে সে তোমার সকল চেষ্টার অতীত হ'য়ে পুড়ে গেলো আগুনে, উড়ে গেলো ছাই হ'য়ে, অত বড়ো বিশাল আকাশের কোনো কোনায় কোনো একটি ছোটো তারা হ'য়ে ফুটে রইলো নাগালের বাইরে— তখন নিষ্ফল বেদনার যে-দুঃসহ দুঃখ পাগল ক'রে দেবে তোমাকে. তার কি কোনো সান্ত্বনা আছে? মৃত্যু! মৃত্যু! কী ভয়ংকর এই মৃত্যু। কী ভয়ংকর এর শক্তি। মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর কি আর-কিছু?

মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর কি আর-কিছু?

মাঝখানকার চৌকো বসবার ঘর ডিঙিয়ে পুব কোণের ছোটো ঘরে ছোট্ট লোহার খাটের নিঃসঙ্গ বিছানায়— নির্ঘুম চোখে জানলা দিয়ে মস্ত কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতীরও ঠিক এই কথাই মনে হ'লো। অথচ এই মৃত্যু তো স্বতঃসিদ্ধ। হবেই। কারো নিস্তার নেই এর হাত থেকে। তোমার হবে, আমার হবে, তার হবে, এমনকি সোমনাথেরও হবে। কথাটা মনে হ'তেই বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো। তাহ'লে মৃত্যু থেকে সোমনাথেরও মুক্তি নেই? হায়! হায়!

এইটুকু বয়সে কত মৃত্যুই তো তাকে বঞ্চনা করলো জীবন থেকে। ব্যাকুল হাতে যখন যাকে আঁকড়ে ধরতে গেছে মৃত্যুর নিষ্ঠুর মুঠি তৎক্ষণাৎ থাবা মেরেছে তাকে। কবে জানি কাজলে চন্দনে সিঁদুরে শাড়িতে

ঝলমলিয়ে খাটে শুয়ে আকাশের তলা দিয়ে মা চ'লে গেলেন, জানতেই পারলো না সে।

তারপর কোন-এক মধ্যরাত্রে হঠাৎ বাবা। যাবার আগে বড়ো-বড়ো চোখে তিনি যে কেমন ক'রে তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে, সে-দৃষ্টি আজো ভুলতে পারে নি। সেই দাড়ি-না-কামানো শীর্ণ ফর্শা মুখ, ঘন কালো চোখ, মোটা কাচের চশমা-পরা মানুষটিকে মনে পড়লে এখনো আবার দেখবার ইচ্ছে প্রবল হ'য়ে ওঠে। তারপর দাদামণি। বুকের মধ্যে তিনি ভ'রে রেখেছিলেন নাৎনিকে। ঠাণ্ডা শীতল আশ্রয়। কোন সাধ, কী আকাঙ্ক্ষা তিনি বাকি রেখেছেন পূরণ করতে? চোখের দিকে তাকিয়ে সব ইচ্ছে বুঝে নিয়েছেন পলকে। আর তারপর তরঙ্গিণী। তার জ্ঞান-বয়সের মা। তার অতৃপ্ত মনের ক্ষুধার আহার। স্নেহভরা বুকের প্রথম মেয়ে-উত্তাপ। আহা। কী সুন্দর ছিলেন তিনি। কী নরম! কী মধুর। আঃ, মা। মাগো।

অস্ফুটে কেঁদে উঠলো অরুন্ধতী। সব, সবই গ্রাস করলো এই মৃত্যু। তার কান্নাকাটি, আবেদন-নিবেদন কিছুই কোনো কাজে লাগলো না? যারা যাবার তারা ঠিক চ'লে গেলো, তাকে ফেলে-থুয়ে। একবার ভেবেও দেখলো না তার কী হবে? সে কোথায় যাবে?

যেমন দিনের বেলা সব ভাবনা ঠেলে দিয়ে ক্লান্তি এসে বাসা নিয়েছিলো চোখে, তেমনি সমস্তটা রাত ভাবনার কাছে সেই ঋণ শোধ করতে হ'লো অরুন্ধতীকে। সমস্তটা রাত একবিন্দু ঘুম এলো না। কত কথা, কত স্মৃতি, কত দুঃখের পাথার তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো কোথায় কোন নাম-না-জানা এক ভীষণ জগতে। খালি ঘরের একা শয্যায় শুয়ে শেষে কেমন যেন ভয় করলো তার। একটা অশরীরী ভয়। আমি কোথায়? কোথায়? কোথায় চলেছি? কোন স্রোত কেবলই আমাকে

ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে এর পর কী। কী। ঘরের মধ্যে ছায়ারা কিলবিল ক'রে উঠলো দেয়ালে। থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো আকাশের আলো। ভয়ে বুকে বালিশ আঁকড়ে মুখ থুবড়ে চোখ টিপে প'ড়ে রইলো অরুন্ধতী।

৪

সকালবেলা কেতকী বললো, 'চোখ লাল হয়েছে কেন? ঘুম হয় নি রাত্তিরে? ঘরটা যা ছোটো, নিশ্চয়ই গরম হয়েছিলো।'

অরুন্ধতী কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লো, 'না, না, আমার তো কিছু অসুবিধে হয় নি। সুন্দর ঘর।'

'সুন্দর না ছাই!' বাঁ-হাতে ঝাঁকড়া চুল সরিয়ে দিলো, 'তুমি যদি থাকো তাহ'লে বসবার ঘরটাকে তোমার শোবার ঘর ক'রে দেবো। চলো।'

দুপুরে খেতে ব'সে কেতকী বললো, 'আজ সোমনাথ তোমার হরিণডাঙার সব খবরই নিয়ে আসবে বোধহয়। তারপর নিশ্চিন্তি।'

অরুন্ধতী ভাতের থালায় দাগ কাটলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমি ভাবছি কালই চ'লে যাই। অত খোঁজ-টোজ করার আর কী দরকার?'

'কালই?'

'শেষে যদি কাজটা না থাকে?'

'তাই তো,' চোখ বড়ো করলো কেতকী, 'ভারি তো বিপদ! একেবারে তো অগাধ জল। শোনো, আমি বলি কী, ও-সব ঝামেলা বাদ দাও। এখানে থাকো। আই. এ.-টা পাস করো। ওর চেয়ে ঢের ভালো কাজ জুটবে।'

'কিন্তু—'

'কে জানে কেমন লোক, শেষে একটা বেঘোরে প'ড়ে যাবে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে। তুমি তো ওর মা-র কাছেই ছিলে, এখন তবে ছেলের কাছেই থাকো না কেন ?'

অরুন্ধতী চোখ তুলে নামিয়ে নিলো।

'তিনি যখন নেই, দায়িত্ব নিশ্চয়ই সোমনাথের।'

'দায়িত্ব ?'

'অবশ্যই।'

চুপ ক'রে রইলো অরুন্ধতী। বলবার কথা ছিলো, বলতে পারলো না। সে-সব বলা যায় না। সোমনাথের মা তাকে যে-দায়িত্বে আশ্রয় দিয়েছিলেন তা পালন করতে গেলে সোমনাথকে যা করতে হয় তা সে কেমন ক'রে তাকে বোঝাবে যদি-না নিজে থেকেই সে বোঝে। ও কি তবে শোনে নি কোনো কথা, জানে না কিছু ?

'আর তা ছাড়া—' কেতকী জল খেয়ে নিলো, 'আর সেই একই কারণে আমারও তো কর্তব্য আছে তোমার উপর ?'

'আপনার স্নেহ-যত্ন আমি কখনো ভুলবো না।'

'ঈশ্। এইটুকুতেই এই !' কেতকী ঝিরঝিরিয়ে হাসলো, 'তাহ'লে তো আমার যোগ্যতা তোমাকে আরো না দেখিয়ে ছাড়বোই না। আমার মা কী বলতেন জানো—' মা-র কথাটা উচ্চারণ করতে-করতে সহসা বিমনা হ'লো একটু। মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে বললো, 'মানুষ ভারি স্বার্থপর, না ?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ-পরিবর্তনে অরুন্ধতী অবাক হ'য়ে বললো, 'কেন ?'

'মা বলো, ভাই বলো, বন্ধু বলো, সবাই নিজেরটাই আগে ছাখে, তারপর আর-সব।'

'হয়তো।'

'আচ্ছা, তুমি ধর্ম মানো? অর্থাৎ জাতিভেদ?'

'এ-সব আমি ভাবি নি।' কথাটা এড়াতে চাইলো অরুন্ধতী।

কেতকী বললো, 'ভাবো নি? সোমনাথের মা-র কাছে ছিলে, এত কাণ্ড দেখলে, তবুও ভাবো নি?'

এ-কথায় অরুন্ধতী ব্যথিত হ'লো। তার মনে হ'লো কোথায় যেন তরঙ্গিণীকে ভুল বোঝা হচ্ছে, অকারণে দায়ী করা হচ্ছে। চোখ না-তুলেই বললো, 'ওঁর তো জাতিভেদ নিয়ে কোনো আপত্তি ছিলো না?'

'ছিলো না! ছেলেকে উনি তবে ত্যাগ করলেন কেন? নিজের দেহত্যাগ করলেন কেন? এই ধর্মই তো। আমার ধর্ম। যেহেতু আমি খৃস্টান। যেহেতু তাঁর ছেলে সেই খৃস্টান মেয়েকে বিয়ে করেছে।'

অরুন্ধতী অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো কেতকীর উত্তেজিত দুঃখিত মুখের দিকে। তারপর আবার বললো, 'না, সেজন্যে নয়!'

'তবে ওঁর আপত্তিটা কী ছিলো? কিসের আক্ষেপে ছেলের মুখ দেখা পর্যন্ত বন্ধ করলেন, বলো?'

'সব আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। তবে এটুকু জানি ধর্ম-ভেদ নিয়ে তিনি দুঃখ পান নি। তাঁর নিজের বিশ্বাস বা মতামত সেটা কেবলমাত্র তাঁরই ছিলো। অন্যের উপর ছায়া ফেলা তাঁর অভ্যেস ছিলো না।'

'তবে কি সেই চিরাচরিত শাশুড়ি পুত্রবধূর বিরোধিতা? যাকে শাদা ভাষায় বলে ঈর্ষা?'

এ-কথা শুনে অরুন্ধতীর বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলো, 'ছি।'

এমনিতেই খেতে বসতে দেরি হয়েছিলো, কথায়-কথায় আরো দেরি

হ'য়ে গেলো। সহসা নিস্তব্ধতা নামলো একটা দু-জনের মধ্যে। কাচের পাট-খোলা জানলায় একটা কাক বসেছিলো, কেতকী তার দিকে তাকিয়ে হুস্ ক'রে তাড়ালো। তারপর হাসলো, 'আসল কথাটা কোথায় তলিয়ে দিয়ে যত আজেবাজে ব'কে সময় নষ্ট করলুম। চলো, ওঠা যাক।' চেয়ার ঠেলে উঠতে-উঠতে অরুন্ধতীর কাঁধে হাত রাখলো, 'বিয়ে করেছি ছ'মাস, এর মধ্যে অভিজ্ঞতা হ'লো অনেক। অনেক জানলুম, শিখলুম। সোমনাথের মা-র কথা আমি বলতে চাই নি, নিজের মা-র কথা ভাবতে গিয়েই এত কথা। আমার মা-ও আমাকে ত্যাগ করেছেন। সকল মা-দের বিরুদ্ধেই আমার মনে একটা অভিযোগ জমা হ'য়ে গেছে।'

আঁচিয়ে এসে কালকের মতো আজও দু-জনে পান খেলো দুটি। কেতকী তার স্বভাবসুলভ হাসিখুশিতে উড়িয়ে দিলো মুখ-মলিন-করা বিমর্ষ গম্ভীর হাওয়া। অরুন্ধতীর নরম হাতে চাপ দিয়ে বললো, 'যাও এবার, নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করো গে। হরিণডাঙা যদি যেতেই হয়, পয়লা তারিখের আগে তো না। তার এখনো ঢের দেরি।'

৫

কী আর দেরি। তেইশ তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ। দেখতে-দেখতে কেটে গেলো সেই দিন ক'টা। কিন্তু এ-ক'দিনেই কেতকীর সংসারে নিজেকে প্রায় মিশিয়ে দিলো অরুন্ধতী। কেতকীর প্রত্যেক পদক্ষেপের অবিরাম সঙ্গী হ'লো।

ভাবী সন্তানের মাতৃত্বভার বহন করার দায়িত্বে কেতকীর শরীর একেবারেই ভালো ছিলো না। তার সেবার দরকার ছিলো, সঙ্গীর

দরকার ছিলো, দরকার ছিলো অপরিমিত আলস্যের সস্নেহ প্রশ্রয়। সেই সব ভার অরুন্ধতী সাগ্রহে তুলে নিলো নিজের হাতে। বড়োই হোক আর ছোটোই হোক, সংসার সংসারই। ঘুম ভেঙে উঠেই তার একটা অভদ্র তাগিদ আছে জৈব জীবনের। হাট-বাজার, টাকা-কড়ি, অভাব-অভিযোগ, খিটিমিটি, কী নেই! চিরদিন পড়াশুনো করেছে, বোর্ডিং-এ থেকেছে, এই উহ্য ঝামেলাগুলোকে ডিঙোতেই সে অভ্যস্ত। তবু নতুন-নতুন কর্ত্রীগিরি মন্দ লাগছিলো না। অন্তঃসত্ত্বা হবার পরে, শরীর খারাপের ধাক্কায় সেই ভালো লাগা প্রায় বিন্দুতে গিয়ে ঠেকেছিলো। চেতনার অজান্তে কখন তিলে-তিলে একটা অভাববোধ ঘন-ঘন মনে পড়িয়ে দিচ্ছিলো নিজের মাকে। একটা আত্মসমর্পণের ইচ্ছেতে ছটফট করছিলো ভেতরে-ভেতরে। অরুন্ধতী যেন ঠিক সেই ইচ্ছের পরিপূরক হ'য়ে কাছে এলো তার। কর্মনিপুণ অনলস স্বভাবের মাধুর্যে মুগ্ধ ক'রে দিলো তাকে। সংসারের বিশৃঙ্খল অবস্থাটা যে কখন দূর হ'য়ে গেলো কে জানে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকির পাট চুকে গেলো, বৃন্দাবনও যেন বদ্‌লে গেলো সেই সঙ্গে-সঙ্গে। তার ঢিলেমি আর চোখে পড়ে না কারো। এলোমেলো বিছানা সর্বদাই পরিপাটি, ঘর ঝাঁট দিতে সারা সকাল কেটে যায় না, চায়ের জন্য ব'সে থাকতে হয় না হা-পিত্যেশ ক'রে। যাবার বেলায় যেমন আপিশের ভাত ঠিকমতো এসে পৌছয়, ফিরে এলেও তেমনি তৈরি খাবার প্রস্তুত। কেতকীর অরুচির জিবে নতুন স্বাদ আসে ভালোমন্দ নানা খাদ্যের বৈচিত্র্যে। দেরি ক'রে ঘুম ভাঙলে অসুবিধে নেই, দুপুরের নিটোল বিশ্রামে ব্যাঘাত নেই, ভালো না-লাগলে সঙ্গী আছে, শরীর খারাপ হ'লে স্নেহ-হাতের স্পর্শ আছে। অরুন্ধতী মায়ের মতো সজাগ হ'য়ে আছে সব-কিছুতে। কেতকী অনুভব করলো, এ-অবস্থায় স্বামীর চেয়ে মায়েরই প্রয়োজন বেশি।

অরুন্ধতীর ঘুম ভাঙে সাড়ে-পাঁচটায়। এটা তার বরাবরের অভ্যেস। আর ঘুম ভাঙা মাত্র বিছানা ছাড়ে। ছেলেবেলায় শীতের দিনে বাবা বকতেন, চেপে রাখতেন লেপের তলায় বুকের কাছে। কখন ফুট ক'রে উঠে আসতো বাইরে, ব'সে-ব'সে ভোর দেখতো, ভোরের গন্ধ নিতো বুক ভ'রে। পাখির কাকলি শুনতে-শুনতে বেলা বেড়ে উঠতো। ভোর তার বড়ো ভালো লাগে। তারপর দাদামশায়ের কাছেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। বড়ো হয়েছে তখন। ঘুম ভেঙে উঠে ফুল তুলেছে পুজোর জন্যে, নিজের হাতে ঘর-দোর পরিষ্কার করেছে, দাদামশায়ের প্রত্যেক অভ্যাসের খুঁটিনাটি জুগিয়েছে হাতের কাছে। তারপর পড়া।

যে-তিন মাস তরঙ্গিণীর কাছে ছিলো সেখানেও এই। আর তার পটুতায় স্নেহে আপ্লুত হয়েছেন তিনি। স্ব-নির্বাচিত ভাবী পুত্রবধূর যোগ্যতায় অবাক হ'তে-হ'তে সহসা জলে ভ'রে উঠেছে চোখ। আদর ক'রে বুকে টেনে নিয়েছেন।

সেই অভ্যাস এখানেও কার্যকরী হ'লো। ভোর না-হ'তে উঠে ডেকে দিতো বৃন্দাবনকে, উনুনে আঁচ হ'তে-হ'তে ঝকঝকে হ'য়ে উঠতো ঘরবাড়ি। আগুন ধরলে প্রথমে ডাল, তারপর ভাত। ভাত হ'তে-হ'তে সোমনাথ উঠেছে, চা হ'তে-হ'তে কেতকী। মুখ ধুতে-না-ধুতেই ধোঁয়া-ওঠা সোনালি-রং চা, লালচে টোস্ট, পরিষ্কার পেয়ালা প্লেট বুকে নিয়ে ধবধবে চাদর-ঢাকা টেবিল।

যাবার দিনে দুঃখিত হ'য়ে কেতকী বললো, 'তাহ'লে চললে ?'

শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়িয়ে অরুন্ধতী বললো, 'জেনে তো গেলাম দুঃখের দিনে কেউ আছে।'

'আমি আর তোমার কে!'

'আপনি আমার দিদি, আমার মা বোন সব। আমার আর কে আছে!' ব্যাকুল হাতে কেতকীকে সে জড়িয়ে ধরলো।

ট্যাক্সি নিয়ে এলো বৃন্দাবন। সোমনাথ তাড়া দিলো। সময় আর বেশি নেই। কথা ছিলো কেতকীও সঙ্গে আসবে স্টেশনে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এলো না। একা সোমনাথই নিয়ে এলো তাকে। স্টেশনে এসে ইণ্টার ক্লাশের মেয়ে-কামরায় বসিয়ে দিলো যত্ন ক'রে। চাদর বিছিয়ে দিলো নিজের হাতে, তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, 'তাহ'লে আমি যাই?'

গাড়িতে যাত্রিণীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিলো, দু-জন প্রায়-বৃদ্ধা আর কয়েকটি শিশু। মস্ত কামরায় হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে তারা, তার চেয়েও ছড়িয়ে বিছানা পেতে রেখেছে। বলা যায় না, যদি-বা কেউ দখল নেয়। অরুন্ধতী একবার তাদের দিকে তাকালো, তারপর উঠে দাঁড়ালো সোমনাথের মুখোমুখি। 'একটা কথা,' গলার স্বর যত দ্রুত ততই মৃদু। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কিছু-বা অবাক হ'য়ে সোমনাথ তার মুখের দিকে তাকালো। করুণ, বিধুর, অসহায় একটি মানুষ।

'এটা রাখুন। দিদি নিলেন না।' আঁচলের তলা থেকে লম্বা লাল শালুর উপর সিল্কের সুতোয় কাজ করা একটা থলি বার করলো। আর থলিটি দেখেই চমকে উঠলো সোমনাথ। তরঙ্গিণীর গয়নার থলি। মুহূর্তের জন্য অরুন্ধতীর চোখে চোখ রাখলো সে, তারপর বললো, 'এটা দিয়ে আমি কী করবো?'

'এটা মা-র।'

'মা তো আপনাকেই দিয়ে গেছেন।'

'আমি ছাড়া আর কে তাঁর কাছে ছিলো?'

মা-র এই স্মৃতিচিহ্ন সোমনাথের হৃদয়কে মথিত করলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'থাকলেও আপনাকেই দিতেন। ওটা আপনারই।'

গাড়ি হুইসিল্ দিলো। ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো অরুন্ধতী, 'নিন', থলিটা সে গুঁজে দিলো সোমনাথের হাতে, 'এই ভার আমি কোথায় ব'য়ে নিয়ে বেড়াবো ?'

সোমনাথ চুপ। সহসা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নিচু হ'য়ে সোমনাথকে প্রণাম করলো অরুন্ধতী। তারপর নিজেই লজ্জায় লাল হ'য়ে স'রে গেলো।

স্তম্ভিত সোমনাথ নিচে নেমে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই রইলো। আস্তে-আস্তে ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে মিশে গেলো অন্ধকারে, শুধু তার গর্জন শোনা গেলো খানিকক্ষণ। তারপর সব চুপ।

৬

অরুন্ধতী চ'লে গেলে সত্যি-সত্যি ভারি কষ্ট হ'লো কেতকীর। বাড়িটা যেন শূন্য হ'য়ে গেলো। অনেকক্ষণ চুপচাপ খালি বাড়িতে ব'সে ভাবলো তার কথা। বঞ্চিত বিড়ম্বিত মানুষ আর কাকে বলে। আঠারো উনিশ বছরের একটা নিতান্ত গ্রাম্য মেয়ে, কোথায় চললো আশ্রয়ের জন্য। সে বরং আর-একটু জোর করলেই পারতো। হয়তো বা থেকে যেতো। আর থাকলে সবদিক থেকেই সুবিধে হ'তো কেতকীর।

ব'সে থাকতে-থাকতে এক-সময় চিরুনি হাতে তুলে নিলো। এই সময়ে অরুন্ধতী চুল বেঁধে দেয় তার। ক'দিনেই অভ্যেস হ'য়ে গেছে। প্রথমে কেতকী হাসতো, 'এই, করছো কী ? ওইটুকু-টুকু ঘোড়ার ল্যাজ তার আবার—'

অরুন্ধতী নরম হাতে আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বলতো, 'কী সুন্দর পশমের মতো। বড়ো করেন না কেন?'

'বড়ো করবো কী রে? কম্বলের মতো পিঠ কুটকুট করুক আর কি।'

'ঈশ্! কী যে বলেন! শাড়ির সঙ্গে ও-রকম কিন্তু আমার ভালো লাগে না। ওটা ফ্রকের।'

'তা হোক বাপু, সুবিধেটাই আসল।'

'বাঃ, সৌন্দর্য বুঝি কিছু নয়?'

'যা চেহারা!'

অরুন্ধতী খুব সরলভাবে খুব ছেলেমানুষের মতো বলতো, 'কী সুন্দর।' সেই 'কী সুন্দর' বলাটুকুর মধ্যে যে তার এতটুকু ভেজাল থাকতো না, সেটা বুঝতে পারতো কেতকী। যত-না খুশি হ'তো ভালো লাগতো তার চেয়ে বেশি। আর তারপর চুল বাঁধা হ'য়ে গেলে শরীরটা যেন হালকাও লাগতো অনেক। এই তো এখুনি বিরক্ত লাগছে ঘাড়ের কাছে। বিকেলে গা ধুয়ে এলেই লেবুর গন্ধওলা ঠাণ্ডা পানীয়টি হাতের কাছে। ডাক্তার বলেছে প্রত্যেক দিন একগ্লাশ চিনির জল খেতে। শোবার আগে মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া খাবার জন্য পেয়ালা চামচে জল, সব ঠিক। আবার একটি ছোট্ট মিঠে পান কাচের প্লেটে।

সাধে কি আর সোমনাথের মা মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সোমনাথটা কী? এমন মেয়েটাকে ওর চোখে পড়ে নি? হঠাৎ কোথায় কামড় পড়লো— পড়ে নি ব'লেই কি আমি? যদি পড়তো তবে— তবে—

তবে কী?

বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুতে-ধুতেও এ-কথাটাই ভাবলো সে। ফিরে এসে ঘাড়ে গলায় পাউডার বুলোতে-বুলোতেও তা-ই ভাবলো। কী হ'তো

তাহ'লে ? কী হ'তো ? কেতকীর কি তবে জায়গা হ'তো না এই ঘরে ? এখানে ? বুকের তলায় কাঁটা খচখচ করলো। তার পরেই মনে হ'লো, সোমনাথ এখনো ফিরছে না কেন ? সে তো জানে কেতকী একা আছে, কেতকীর শরীর খারাপ, তবু এত দেরি করছে কেন ? অস্থির পায়ে জানলায় এলো, জানলা থেকে এ-ঘরে, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। শেষে দরজা খুলে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়ালো। মাথার উপর কলকাতার ফিকে রঙের একফালি আকাশ ঝুলে রইলো পর্দার মতো।

ফিরে এসে সোমনাথ অবাক। 'এ কী, এখানে দাঁড়িয়ে ?'

দুই চোখ ছাপিয়ে জল এলো কেতকীর, 'তুমি এতক্ষণে এলে ?'

'দেরি হয়েছে ?'

'হয় নি ?'

'কিন্তু আমি তো দেরি করি নি। গাড়ি ছাড়তেই চ'লে এসেছি।'

কেতকী ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে ফিরে দাঁড়িয়ে চোখ টান করলো, 'ও ! গাড়ি ছাড়লো তবে তুমি রওনা হয়েছো ?'

'মাত্র ছ' মিনিট—'

'ছ' মিনিট কেন, ছ' ঘণ্টা, ছ' দিন হ'লেও তাই করতে।' গমগম ক'রে কেতকী নিজেকে যেন আছড়ে ফেললো বিছানায়, 'একেবারে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলে না কেন ?'

কী বলবে সোমনাথ। চুপচাপ পাঞ্জাবিটা খুলে লটকে দিলো ব্র্যাকেটে। তারপর সিগারেট ধরালো একটা। মনটা তার স্বতই ভার ছিলো, আরো ভার হ'লো। ক্ষুব্ধ কেতকী অনেকক্ষণ গজগজ করলো আপন মনে। তারপর উঠে বসলো, 'আমি কাল মা-র কাছে যাবো।'

'মা-র কাছে ?' অবাক না হ'য়ে পারলো না সোমনাথ, 'কেন, উনি কি কোনো খবর পাঠিয়েছেন তোমাকে ?'

'খবর আবার পাঠাবেন কী? নিজের মা-র কাছে যাবো তার অত খবরাখবরের দরকার দেখি না। তাঁর সঙ্গে কি আমার মান-অপমানের সম্বন্ধ?'

'ও!'

'এখানে থাকার তো আর কোনো মানেই হয় না আমার।'

'এ-সব তুমি কী বলছো, কেকা?'

'যা ঠিক তা-ই বলছি।'

'এই তোমার ঠিক?'

'হ্যাঁ। এই আমার ঠিক। তুমি জানো আমার কেউ নেই, কিছু নেই, তাই দয়া করো। আমি কি তোমার মনের কথা বুঝি না?'

'ছিঃ।' সোমনাথ কাছে এলো, 'অকারণে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। আমিও আর সইতে পারি না এ-সব কথা।'

দু-হাতের ব্যাকুল আলিঙ্গনে স্বামীকে কাছে টেনে নিলো কেতকী, 'তবে তুমি এতক্ষণ কী করলে, কী করলে আমাকে ফেলে গিয়ে?'

'বোকা নাকি?' সস্নেহে হাসলো সোমনাথ, সান্নিধ্যের ঘনতায় অকৃত্রিম প্রেমের উত্তপ্ত স্রোতে ভাসিয়ে দিলো স্ত্রীকে।

কিন্তু কয়েকদিন বাদে আবার অশান্ত হ'য়ে উঠলো কেতকীর হৃদয়। মেঘে ভ'রে গেলো তার মনের আকাশ। সেদিন ফিরে এসে অবস্থা দেখে গয়নার থলিটি স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে আর ভরসা পায় নি সোমনাথ। রেখে দিয়েছিলো তার কাজ করবার টেবিলের দেরাজে। ভেবেছিলো, ওর মন শান্ত হ'লে কোনো-এক সময় বুঝিয়ে-শুনিয়ে রেখে দিতে বলবে। তারপর ভুলে গেলো একেবারে। দেরাজটা সর্বদা ব্যবহার না হ'লেও ব্যবহার হয়। কোনো কারণে সেটি খুলে কেতকী অবাক হ'য়ে গেলো।

ভেবেই পেলো না এটা কোথা থেকে এলো। কে আনলো? মনে পড়লো, যাবার আগের দিন দুপুরে অরুন্ধতী ঠিক এই থলিটি নিয়েই কুণ্ঠিত মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলো কাছে। কেতকী শাশুড়ির উপর অভিমানবশত গ্রহণ করে নি। কেন করবে? ভদ্রমহিলা তো তাকে দিয়ে যান নি, যাকে দেবার যোগ্য ভেবেছেন, তাকেই দিয়েছেন। সে কেন যেচে এই অপমান মাথা পেতে নেবে। অরুন্ধতী কোলের উপর ফেলে দিয়েছিলো, 'উনি তো আপনাকে ছাখেন নি, এই ওঁর শেষ চিহ্ন।'

কেতকী শক্ত মুখে বলেছিলো, 'না।'

'হয়তো অনেক যত্ন ক'রে আপনাদের জন্যেই রেখেছিলেন,' বলতে-বলতে অরুন্ধতীর গলা ধ'রে এলো, 'আমি খুলেও দেখি নি আপনার হাতে দেবো ব'লে।'

উঠে আসতে-আসতে কেতকী জবাব দিলো, 'ভুল করেছো। ওটা আমি কক্ষনো নিতে পারি না।'

তবে সেই থলি সোমনাথের দেরাজে এলো কী ক'রে? ও-ই কি রেখে গেছে কোনো সুযোগে? তা তো মনে হয় না। আর যেখানেই রাখুক, সোমনাথের দেরাজে সে হাত দেবে না। সোমনাথের ছায়াও সে মাড়ায় নি যে-ক'দিন ছিলো। তবে এলো কী ক'রে? আবার তার ছটফটানি আরম্ভ হ'লো। সোমনাথের সঙ্গে কখনো একা দেখা ক'রে কি দিয়ে গেছে? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস? কিন্তু কখন? কখন দেখা করলো? ওরা কি তাকে বোকা ঠকিয়ে দেখাশুনো করেছে তবে?

বলাই বাহুল্য এর পরে আর কুচিন্তার মাত্রাজ্ঞান রইলো না। মনেও রইলো না, এই কালই অরুন্ধতীর চিঠি এখনো কেন এলো না দেখে কত ব্যাকুল হয়েছে। ঝগড়া করেছে সোমনাথের সঙ্গে, সে কেন ভালো ক'রে থাকতে বললো না তাকে। কেন মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলো

অমন একটা অজানা জায়গায়। ভেবেছে, ওখান থেকে ওকে নিয়েই আসতে হবে। মনে হয়েছে, দিন আর কাটছে না ওকে বিদায় দিয়ে। আরো কত স্নেহ-মমতায় সিক্ত হয়েছে মন। একটা আবদ্ধ ইঁদুরের মতো সে ছুটোছুটি করতে লাগলো সারা বাড়ি। আর সোমনাথ আপিশ থেকে ফিরে ঘরে পা দেয়া মাত্রই মুখোমুখি দাঁড়ালো একেবারে।

'আজকাল কি তুমি আমার সঙ্গে লুকোচুরি করো ?'

'লুকোচুরি ?' গলার টাইটা খুলতে গিয়ে হাত থমকালো তার।

'হ্যাঁ। আমাকে অসম্মান করতেও বোধহয় তোমার আটকায় না, না ?'

'কী বলছো তুমি ?'

'যা বলছি ঠিক বলছি। বলো, আমার উপর আজকাল তোমার মনের ভাবটা কী ?'

'পাগলামি কোরো না। হয়েছে কী ?' ক্লান্ত সোমনাথ জামা-জুতো সুদ্ধ ব'সে পড়লো চেয়ারে।

'এটা কোথা থেকে এলো জানতে পারি ?'

বুকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো লাল শালুর থলিটা, সঙ্গে-সঙ্গে সোমনাথের রক্তে একটা হিমস্রোত ব'য়ে গেলো। মা-র হাতে এমব্রয়ডারি করা থলি। কী সুন্দর। কী ভালোবেসেছে একদিন মা-র হাতের এই শেলাইয়ের কাজ। মা-র সেই নীল শিরা-ওঠা বাদামি মুখের নিবিষ্টতাকে। আজ সেই কাজ-করা থলিটিই কি শেষে এই দুঃখের মূল হ'লো ? জবাব দিলো, 'ওটা আমার মা-র। মা-র শেষ চিহ্ন।'

'তা আমি জানি। এলো কোথা থেকে সেটাই জানতে চাইছি।'

'অরুন্ধতী আমার হাতে দিলো। আমি ফেলে আসতে পারি নি। দোষ হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। একশো বার হয়েছে। তুমি জানো আমাকেও সে এটা দিতে চেয়েছিলো?'

'জানি।'

'ও। কথাবার্তা তাহ'লে অনেক হয়েছে? ট্যাক্সির অন্ধকার, স্টেশনে নীরব মিলন— সবই সার্থক হয়েছে তাহ'লে সেদিন?'

'হা ঈশ্বর!'

'ঈশ্বর বেচারাকে আর টেনো না। শুধু তুমি আমাকে এ-কথাটা বলো যা আমাদের নয়, যা আমি নিতে পারি নি, যা নিলে আমার অপমান হয় তা তুমি আনলে কী ক'রে হাত পেতে?'

'হাত পেতে আনি নি। কিন্তু আনতেই হ'লো। এত গয়না নিয়ে ওঁর চলাফেরা করা উচিত নয় ব'লেই আনলুম।'

'ওঃ। ওর জন্য তো ভারি দরদ। ওর ভালোমন্দের কর্তা তুমি কবে থেকে হ'লে?'

ঈষৎ উষ্ণ হ'লো সোমনাথ, 'এত লেখাপড়া শিখেছো, তোমার এর চেয়ে ভদ্র হওয়া উচিত ছিলো, কেকা।'

জ্ব'লে উঠলো কেতকী, প্রায় উঁচু গলায় বললো, 'এখন যে লেখাপড়া-জানা মেয়েদের তোমার অভদ্র লাগবেই তা আমি জানি।'

'না, জানো না। জানবার মন নেই তোমার।'

'যত মনের বালাই তো এখন তুমি একজন মানুষের ভেতরেই দেখতে পাবে। কিন্তু তাকে তুমি যতই বড়ো ভাবো না কেন, সত্যি সে তত বড়ো নয়।'

'আমি কিছুই ভাবি না।'

'কেন ভাববে না? খুব ভাবো। দিনরাত ঝিয়ের মতো শরীর খাটাতেই যারা ওস্তাদ তাদের জন্যই তোমাদের পুরুষদের ভালোবাসার

অন্ত নেই। মগজ কম থাকলেই শরীরে শক্তি থাকে এ-কথাটা জেনে রেখো তুমি।'

সোমনাথ নোংরা ঘরের চারদিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, 'অবিরাম শুয়ে-ব'সে মগজের চর্চা না-ক'রে শরীরকে যদি একটু খাটাতে তাহ'লে আর-কিছু না হোক, অসৎ চিন্তার কষ্ট থেকে অন্তত রেহাই পেতে।' বলতে-বলতে সোজা সে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। আর কেতকী লুটিয়ে পড়লো বিছানায়। চোখের জলের ধারা নামলো গাল বেয়ে, বুক বেয়ে। এতক্ষণে তার ভেতরকার আসল মানুষটি যেন ফিরে এলো সম্বিৎ পেয়ে। কাঁদতে-কাঁদতে নিজেকে ধিক্কার দিলো— ছী-ছি, এ আমি কী করলাম! কী করলাম! আমি কী হলাম? এমন তো ছিলাম না আমি। এই বিষদাঁত কোথায় লুকিয়ে ছিলো এতদিন?

রাস্তায় বেরিয়ে পথে-পথে এলোমেলো ঘুরতে-ঘুরতে সোমনাথের হৃদয়ও অনুতপ্ত হ'লো। কেতকীকে কঠিন কথা বলতে সে অভ্যস্ত নয়। এমন কোনো কারণও অবিশ্যি ঘটে নি জীবনে। ঝগড়াঝাঁটি, মান-অভিমান তো কতবার কতরকম ক'রে হয়েছে, কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ-ভাবে কথা কাটাকাটি ভাবতেও পারে না সোমনাথ। কেতকীর মন যখন খারাপই হয়েছে, অবুঝ হয়েছে, তখন তার তো সেটা মেনে নেওয়া উচিত ছিলো? সোমনাথ উল্টো দিক থেকে ভেবে দেখলো ব্যাপারটা। যদি তার না হ'য়ে এই ঘটনাটা কেতকীর হ'তো, কেতকীকে ভালোবাসে এমন একটি পুরুষের সঙ্গে তার দেখা হ'তো?

ভালোবাসে? বিদ্যুতের মতো কথাটা এই প্রথম হঠাৎ ধাক্কা দিলো সোমনাথকে। অরুন্ধতী কি ভালোবাসে তাকে? অরুন্ধতীর কার্যকলাপে কখনো কি ধরা দিয়েছে সেই চারটি অক্ষর? এই যে সাতদিন ছিলো,

এর মধ্যে কি তার এতটুকু আভাস চোখে পড়েছে কখনো ? কেতকীর মতো শান্ত ভদ্র পরিচ্ছন্ন মেয়ে কি সেইজন্যেই এমন পাগলের মতো ব্যবহার করছে ? কিন্তু কই ? সে তো কোনোদিন কিছু লক্ষ্য করে নি। প্রথম দিন থেকে ভাবতে চেষ্টা করলো মেয়েটিকে, এমন কিছুই প্রমাণ জোগাড় করতে পারলো না, যা থেকে এই শব্দটি প্রয়োগ করা চলে তার উপরে। একটু কি হতাশ হ'লো সোমনাথ ? তার চব্বিশ বছরের উদ্দাম যৌবন কি একটু ব্যথিত হ'লো ? সে কাউকে তাকিয়ে দেখুক বা না দেখুক, তাকে কোনো সুন্দরী মেয়ে প্রাণপণে চাইছে, এ-চিন্তাটা নিতান্ত মন্দ কী ? অরুন্ধতী যদি তাকে ভালোবেসেই থাকে, বাসুক না, ক্ষতি কী ? সে তো আর বাসছে না। কিন্তু যাবার আগের মুহূর্তে, ঠিক ট্রেনটা যখন ছেড়ে দিলো, জানলা দিয়ে দুটি জলভরা ব্যাকুল চোখে কী ভাষা ছিলো ? যখন নিচু হ'য়ে প্রণাম করলো, কী কথা ছিলো তার মনে ? তরঙ্গিণী বলেছিলেন, 'প্রণাম করো। স্বামীই মেয়েদের সব।' অরুন্ধতী কি তবে মনে-মনে সেদিনও সেই আদেশই পালন করেছিলো ?

ছি ! এ-সব কী ভাবছে সে ? দিক্‌ভ্রান্ত ঘোড়াকে যেমন চাবুক মেরে ফিরিয়ে আনে, সোমনাথ ঠিক তেমনি চাবুক মারলো মনকে। কেতকীর প্রতি কি এতে বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে না ? যে-কেতকী আমার একমাত্র, আমার সব, আমার সকল সুখদুঃখের চিন্তা-ভাবনার একচ্ছত্র অধিকারিণী, যে আমার জন্য সব ভাসিয়ে নিঃসংকোচে চ'লে এসেছে, যে আমাকে ভালোবাসে ব'লেই এত ভয় পেয়েছে, কষ্ট পেয়েছে, সন্দেহের আগুনে পুড়ে মরছে অহরহ। ছী-ছি। তাকে ছাড়া এ-সব আমি কী ভাবছি আজ ? কেন ভাবছি ? কেকা, আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। আমার অদ্বিতীয়া, আমার চোখের আলো, জীবনের আনন্দ, আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। দ্রুত পা চালালো সে বাড়ির দিকে।

ততক্ষণে নিজের মনকে শান্ত ক'রে গা ধুয়ে এসেছে কেতকী। নিচু হ'য়ে বিছানা করছিলো, আস্তে সোমনাথ এসে দাঁড়ালো পেছনে। খাটো ঘন চুল লুটিয়ে আছে এলোমেলো, সাবানের মৃদু গন্ধে ঘরের বাতাস সুরভিত। টেবিল-ল্যাম্পের নীলচে আলো পরিবেশটিতে শান্তি ছড়িয়ে দিয়েছে। কাপড়ের আঁচল দিয়ে কানের পিঠের জল মুছতে-মুছতে এদিকে মুখ ফেরালো কেতকী। স্বামীকে দেখে থমকে রইলো অনেকক্ষণ।

একটু রাত হয়েছে। একটু নিবিড়তা নেমেছে ঘরে। সোমনাথ তাকিয়ে রইলো স্ত্রীর দিকে। একটু ভারি হয়েছে শরীর, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সবেতেই মাতৃত্বের আভাস। একটা অদ্ভুত ভালো লাগায়, ভালোবাসায় বুকটা টনটন ক'রে উঠলো। এ-কথা ভাবতে আরো ভালো লাগলো, ওরই সন্তান আপন রক্তমাংস দিয়ে আজ কেতকী লালন করছে নিজের মধ্যে। আস্তে-আস্তে কাছে এগিয়ে এলো, দুই কাঁধের উপর হাত রেখে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে কেতকীর ভেজা-ভেজা শ্যামল গালে দুর্বার আবেগে প্রণয়চিহ্ন এঁকে দিলো সোমনাথ।

৭

জোনাকি *টিপটিপ*, *টিমটিম* আলো, রাত আটটার নিশুতি রাতের হরিণডাঙা স্টেশনে নামলো এসে অরুন্ধতী। লণ্ঠন আর লাঠি হাতে জমিদারের সরকার দাঁড়িয়েই ছিলো অপেক্ষায়। সঙ্গে কালো কস্তাপাড় শাড়িপরা তাগা হাতে ঝি। অরুন্ধতীকে চিনে নিতে তাদের দেরি হ'লো না, কেননা ওই স্টেশনে ওই ট্রেনটির এক মিনিটের অবস্থানে একমাত্র অরুন্ধতীই নামলো। আর তাকে নামিয়ে দিয়েই হুস্ ক'রে আবার চ'লে

গেলো কোথায়, কত দূরে। বোকার মতো শূন্য দৃষ্টিতে চকচকে লাইনটার উপর তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অরুন্ধতী।

গাড়ি আসার সম্মানার্থে একটু যেন আড়মোড়া ভেঙেছিলো স্টেশনটা, তারপরই চুপ। নীরবতার কোনো অতল তিমিরে ডুব দিলো সব। কেবল মশার ভন্‌ভন্‌ আর মাঝে-মাঝে চটাপট হাতের আওয়াজ, কুলিরা ঘুমুচ্ছে মুড়ি দিয়ে। ঝি লণ্ঠনটা তুলে ধরলো মুখের উপর, 'হ্যাঁ গা, আপনিই কলকাতা থেকে আসছেন ?'

অরুন্ধতী সচেতন হ'য়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

'জমিদার-বাড়ি যাবে তো ?'

'হ্যাঁ।'

'এই তোমার সব জিনিস ?'

'এই।'

'কই গো সরকারবাবু—'

'এই যে—' ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে আধবুড়ো মানুষটি এগিয়ে এলো, কুলিকে ডেকে বললো, 'এই, মাল তোল, মাল তোল। আর-কিছু নেই তো, মা ?'

'না, আর-কিছু নেই।'

'তাহ'লে চলুন।'

'চলো গো।' অরুন্ধতীর দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে গেলো ঝি, আর তাদের পিছনে-পিছনে দম-দেওয়া-কলের পুতুলের মতো অরুন্ধতীও এগুতে লাগলো। পায়ে-পায়ে লণ্ঠনের রেখা ধ'রে চলতে-চলতে, সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি স্ত্রী-পুরুষের দিকে তাকিয়ে কেমন অজানা ভয়ে বুক কেঁপে উঠলো তার।

দিনের বেলায় আসাই উচিত ছিলো, নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন জীবনের প্রথম প্রবেশদ্বার। সকাল থেকে ট্রেনও তো কম ছিলো

না। কিন্তু মনের অগোচর পাপ নেই। দিনে এলে আসবার সময়টুকুতে সে দেখতে পেতো না সোমনাথকে। আজ সোমবার, তার আপিশ ছিলো। শুধু সেই লোভটুকু, সেই ইচ্ছেটুকু। তা নইলে গ্রামের সন্ধ্যা-রাত্রি যে শহরের গভীর রাত্রির চেয়েও গাঢ় তা কি সে অনুমান করে নি? অনেকবার ভাবে নি সেই কথা? তবু পারে নি মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে। সেই ছোট্ট ইচ্ছের কামড়টুকু এড়াতে পারে নি। মনে হয়েছিলো এই তো শেষ, একটু না-হয় দীর্ঘই হোক এই বিদায়। আর-একটু সান্নিধ্যের কাঙাল অনুভূতি।

'এই যে, এখান দিয়ে এসো। ইঁদারা আছে।' ঝি সাবধান করলো; হোঁচট খেতে-খেতে অরুন্ধতী সামলে নিলো নিজেকে। ঘুমে নিবিড় কালো-কালো লোহার রেলিং ঘেরা ইস্টিশন পার হ'য়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। মাথার উপর তারা-ভরা আকাশের তলায় মশারির মতো প্রশস্ত ছায়া ফেলেছে বুড়ো বাদামের পাতা। আরো অন্ধকার। গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, একটা কুকুর ঘুরে-ঘুরে তার চাকাটা শুঁকছিলো, একটা লাথি মারলো কে, আর্তনাদ ক'রে স'রে গেলো কুকুরটা। ওই অন্ধকারেও অরুন্ধতী তার জীবনের ব্যর্থ করুণ দুটি চোখ দেখতে পেলো মনে-মনে। গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি কাচের বাক্সে কুপি জ্বালিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দিলো। সরকারমশাই সহৃদয় গলায় বললেন, 'এবার আপনি উঠে বসুন তো মা, গোরু জুতে দিক।'

একটু থমকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে এলো অরুন্ধতী, তারপর ভিতরের অন্ধকারে খড়ের গদির বিছানায় একেবারে ডুবিয়ে দিলো নিজের অস্তিত্ব।

আঁকাবাঁকা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধ'রে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চললো গোরুর গাড়ি। গাড়োয়ানের জিবের গরু-খেদানো টকটক আওয়াজ

ছু-পাশের ঝোপঝাড়, আমবাগান, জামবাগান, ধানখেত, বাঁশবন, সব-কিছু সচকিত ক'রে তুললো। আর-সব চুপ। কেবল লক্ষ-লক্ষ জোনাকির সবুজ আলো, আর ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা কর্কশ ডাক।

অরুন্ধতীর মনে হ'লো অন্ধকারের অনন্ত যাত্রায় চলেছে সে, যে-অন্ধকার আজ তার কাছে মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ, তার চেয়েও নিস্তাপ। কিন্তু খানিক পরে লোকজনের বসতির আভাস পাওয়া গেলো। আলোর বিন্দু দেখা গেলো মাঝে-মাঝে। আরো পরে শাদা চুনকাম-করা থানা। ঝি চিনিয়ে দিলো। ঘোড়ার ডাক শোনা গেলো সেখান থেকে। গৃহপালিত কুকুর পাহারা দিলে ঘেউ-ঘেউ ক'রে।

অবশেষে দেখা গেলো জমিদারবাড়ির উদ্ধত হ্যাজাকের কড়া আলো। হয়তো আজ তার উপলক্ষ্যেই জ্বালিয়েছে, নাকি রোজ জ্বলে, কে জানে! ফটকের সামনে এসে থেমে গেলো গাড়ি। ভেতরকার মস্ত হাতা পেরিয়ে সদর, তারপর ছোটো বাঁধানো চাতালের ওপারে অন্দরমহল। বৈঠকখানা ঘরে ঝাড় জ্বলছিলো। জমিদার স্বয়ং অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। গৌরকান্তি চেহারা, বয়সের তুলনায় একটু বেশি বলিষ্ঠ, গ্রামের তুলনায় বিশেষ শৌখিন। কোকিলপাড়ের ধুতির ঝিরিঝিরি কোঁচা ভাঁজ ক'রে কোমরে গোঁজা, গায়ে গিলে-করা চুড়িহাতা পাৎলা পাঞ্জাবি, গলার সোনার বোতাম সোনার চেনে আটকানো, হাতে সোনার রিস্টওয়াচ। চুল পাৎলা, কিন্তু খুব যত্ন ক'রে আঁচড়ানো হয়েছে কপাল লেপটে। ঠোঁটে অবিশ্রান্ত পানের কষের কালচে দাগ। এক-পলক তাকিয়ে অরুন্ধতী চোখ নামিয়ে নিলো।

'এই যে, কোনো কষ্ট হয়নি তো আসতে?' অরুন্ধতীর দিকে অনেকক্ষণ প্রায় পলকহীন চোখে তাকিয়ে থেকে জমিদার অভ্যর্থনায় অস্থির হলেন। 'নিতান্ত পাড়াগাঁ, দেখে-শুনে প্রথমটা হয়তো ভালোই

লাগবে না, কিন্তু শেষে দেখবেন গ্রাম আমাদের চমৎকার। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন সুন্দর। ওরে, এই, কে কোথায় আছিস, দিদিমণিকে নিয়ে যা না ভেতরে, একেবারে দোতলার ঘরে নিয়ে যা।'

নিজেই পিছনে-পিছনে এলেন অন্দরে, দোতলার সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত, 'আজ আর কোনো কথা নয়, একেবারে বিশ্রাম। এই সদি, বুঝলি? দিদিমণিকে একেবারে হাত মুখ ধোবার ব্যবস্থা ক'রেই খাবার দিয়ে দিবি। ট্রেনের ধকল কি কম?'

কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে-আসতেও অরুন্ধতী জমিদারের মনোযোগ অনুভব করলো। লম্বা টানা বারান্দা বেয়ে ডানদিকে খানিক খোলা ছাদ বেঁকে গেছে, তারপর আবার ঘুরে গেছে তেমনি লম্বা বারান্দা তেতলার সিঁড়ি পর্যন্ত। আসলে এই একফালি ছাদটিই যুক্ত করেছে দুটি বাড়ি। নিচে তাকালে চৌকো আঙিনা। বোঝা গেলো গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এ-বাড়িটিও চকমেলানো।

ঠিক ছাদের সামনের ঘরটিই তার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। বারান্দার তিন-খানা ঘরের প্রথম ঘর। পশ্চিমের জানলায় ধুধু বাগান, অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দক্ষিণে খানিক খোলা ছাদ, একপাশে ছোটো স্নানের ঘর। ঝি দেখালো, 'হুই আমাদের পুকুরঘাট। দেখছো না, কেমন জল চিকচিক করছে।'

বলাই বাহুল্য অরুন্ধতী দেখতে পেলো না, অনুমানে বুঝে নিলো।

সেই রাত্রে কেবলমাত্র জমিদার আর দু-একজন পরিচারিকা ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হ'লো না। তাতে খানিক স্বস্তিই পেলো অরুন্ধতী। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে পারলো।

রাত্রি কাটলো তন্দ্রা আর জাগরণের এক অদ্ভুত সমাবেশে। একটা নাম-না-জানা ভয় যেন আবরণের মতো অণুক্ষণ ঘিরে রইলো তাকে। যে-কোনো শব্দেই চমকে-চমকে উঠতে লাগলো।

সে যে হতভাগ্য তা সে জানে, কিন্তু হতাদরে মানুষ হয় নি। যেমন মা ছিলো না, তেমনি বাবার আশ্চর্য স্নেহ ছিলো। বাবা যখন মারা গেলেন দাদামণির অপরিমিত ভালোবাসা সব শূন্যতা ভ'রে দিলো; আর দাদামণির পরে যেখানে সে আশ্রয় পেলো সে তো সিংহাসন। মনে-মনে অরুন্ধতী সেই অতুলনীয় ভাগ্যের কোনো হিসেব পায় নি, কেবল কৃতজ্ঞতায় বুক ভ'রে উঠেছে। ঈশ্বর যেমন একদিকে তাকে বঞ্চিত করেছেন তেমনি আর-এক দিকে হয়তো পূরণ ক'রে দিচ্ছেন। তা নইলে এমন মাতৃস্নেহ সে পেলো কেমন ক'রে? কেমন ক'রে সোমনাথের মতো স্বামী পেলো? এ তো তাঁরই দান! দাদামণির বিচ্ছেদের অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে-জ্বলতে, বুক-ভাসা কান্নায় রাত্রির অন্ধকারে গ'লে যেতে-যেতে সব দুঃখ ছাপিয়ে এই অনুভূতিই তাকে শান্তি দিয়েছিলো যে, আছে, আছে। অনেক গিয়েও অনেক আছে সংসারে যার তুলনা নেই।

কিন্তু এখন? এখন আর কী রইলো তার? এখানে, এই স্বজনবিহীন মরুভূমিতে? এই যে একলা ঘরে প'ড়ে আছে, কে দেখছে তাকে? কে চাইছে? প্রাণপণ শক্তিতে নিজের মুখটা সে বালিশের মধ্যে চেপে ধরলো।

৮

ভোর হ'লো, আস্তে-আস্তে আশীর্বাদের মতো ছড়িয়ে পড়লো আলো, জানলায় তাকিয়ে উঠে বসলো অরুন্ধতী। আর ব'সেই মনে পড়লো কালকেও ঠিক এমনি ক'রেই ভোর হয়েছিলো। এমনি ক'রেই সূর্য তার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলো সারা পৃথিবীতে। সোমনাথের ফ্ল্যাটে। ভালো লাগছিলো না, মুখ ধুয়ে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো রান্নাঘরের

দরজায় ঠেস দিয়ে। শোবার ঘর থেকে সোমনাথ বেরিয়ে এলো হঠাৎ। কে জানে এত ভোরে সে কেন উঠেছিলো। তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, 'আপনি! এখানে?' চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো অরুন্ধতী, মৃদু গলায় বললো, 'বৃন্দাবনকে ডেকে দেবো।'

'আপনি কেন?'

'ডেকে না-দিলে ও উঠতে দেরি করে।'

'ও,' একটু যেন দ্বিধা করলো সোমনাথ, তারপর সহজ হ'য়ে বললো, 'আপনার বোধহয় খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস?'

'হ্যাঁ।'

'সময়টা সুন্দর, কিন্তু আমি পারি না। কখনো যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহ'লে আকাশের দিকে তাকিয়ে খুব ভালো লাগে আর ভালো লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হয়, ঈশ, একটু চা পেতাম যদি তাহ'লে ভোরের দৃশ্যটা আরো কত মধুর লাগতে পারতো।'

অরুন্ধতী মুখ নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, একটু অপেক্ষা ক'রে সোমনাথ চ'লে গেলো আবার। আর এই এক পলক নিভৃত দর্শন, একটু কথা, এ-ই যেন তাকে ভ'রে দিলো, ভাসিয়ে নিলো।

অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি আঁচ দিতে বসলো উনুনে, বৃন্দাবনকে ডাকা পর্যন্ত তর সইলো না। পাছে দেরি হ'য়ে যায়। হাওয়া ক'রে-ক'রে জল ফুটোলো, তারপর বৃন্দাবনকে ডেকে চা তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দিলো ঘরে। ভালোবাসার জনকে তার ভালো লাগার সুখটুকু দিতে পারার মতো আর কী আছে জীবনে? আর যেটা এত সহজেই দেওয়া যায়।

অরুন্ধতী উঠে পিছন দিককার ছাদে এসে দাঁড়ালো। আম জাম জামরুলের রাত্রি-ধোয়া নরম রঙে ঢেউ তুলেছে হাওয়া, সেই হাওয়ার

ঝাপটা অরুন্ধতীর মুখেও হাত বুলোলো। ভালো লাগলো। পাখি ডাকলো চেনা স্বরে, চারদিকে তাকিয়ে আর অপরিচিত লাগলো না কিছু। এই তো গ্রাম। এর সঙ্গেই তো তার আবাল্যের বন্ধন। ওই তো দিগন্ত-জোড়া মাঠ, খালি পায়ে খালি গায়ে হেঁটে যাচ্ছে চাষিমজুরের দল, ভোর না-হ'তে পান্তা খেয়েছে কানা-উঁচু থালায়। সারাদিন ধান কাটবে, ফিরে আসবে সন্ধ্যাবেলায়। স্ত্রী তাড়াতাড়ি লাল-লাল মিষ্টি আর মোটা চালের ভাত এনে দেবে এক কাঁসি। এক দণ্ডে ফুরিয়ে যাবে সেই ভাত। সারাদিনের ক্লান্তির পরে গার্হস্থ্য আরাম। তারপর তামাক টেনে গভীর ঘুম।

কাল রাত্তিরের ব্যাকুল হৃদয় শান্ত হ'য়ে এলো, মন আবার সে স্বরে বেঁধে নিলো।

পর্দা সরিয়ে নতুন মুখ উঁকি দিলো একটি, 'এই যে, আপনি উঠেছেন। গিন্নিমা ডাকছেন আপনাকে।'

ছ্যাৎ ক'রে উঠলো বুকটা। এত সকালে। পাগলের খেয়াল না তো? কালো-কালো চোখের তারায় আবার আশঙ্কার ছায়া ঘন হ'লো।

'এখুনি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি তো—'

'হাত-মুখ ধোন নি? আচ্ছা, তাড়াতাড়ি ক'রে নিন। আমি বরং দাঁড়াই একটু।' মেয়েটির কথাবার্তা বেশ ভদ্র। চেহারা এবং শাড়ি পরার ধরনও মার্জিত, বোঝা গেলো কোনো আশ্রিত আত্মীয় মেয়ে।

অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হ'য়ে নিতে-নিতে মনের কেঁপে-কেঁপে-ওঠা পর্দাগুলোকে সংযত করতে লাগলো। তারপর ধীরে-ধীরে সামনের খোলা ছাদ পেরিয়ে এ-পাশের বারান্দায় দাঁড়ালো এসে। মেয়েটি বললো,

'আমার নাম আন্নু, আমিই উপরে থাকি, জ্ঞাতিসম্পর্কে উনি আমার কাকিমা হন। আমিই দেখাশোনা করি, এখন আপনি এলেন, ভালো হ'লো। যা বাড়ি!'

চকিতে চোখ তুললো অরুন্ধতী। কেন? কেমন বাড়ি?—এই প্রশ্নটি তৎক্ষণাৎ উঠে এসেছিলো মুখের কাছে, কিন্তু চুপ ক'রে রইলো। আন্নুই আবার বললো, 'ওঁর বিশেষ কোনো ঝামেলা নেই। শান্ত মানুষ।' দরজার সবুজ রঙের পর্দা সরিয়ে তাকে নিয়ে সে ভেতরে ঢুকলো।

মস্ত উঁচু খাটের উঁচু কার্নিশের অন্তরালে মস্ত বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে প্রায় ডুবে ছিলেন মৃন্ময়ী। তাদের দেখে বড়ো-বড়ো নিষ্প্রভ চোখে তাকালেন একবার। একটু পরে গাঢ় গলায় বললেন, 'এসো। ওখানে চেয়ারটায় বোসো।'

অরুন্ধতী লক্ষ্য ক'রে দেখলো তাঁকে। এই ভদ্রমহিলাকে স্ত্রী হিসেবে কাল রাত্তিরে ক্ষণিক দেখা মসলিন পাঞ্জাবি গায়ে, পাম্পশু পরা, বেঁটে, বলিষ্ঠ জমিদারের সঙ্গে কোথাও মেলাতে পারলো না। পেটো পাড়া কোঁকড়া তেল-চপচপে চুল, আর পান তামাকে দোক্তায় রঙিন ঠোঁট, প্রায়-বুড়ো লোকটির সঙ্গে এঁর যে কখনো কোনো সম্বন্ধ হ'তে পারে এমন কথা ভাবতেও যেন অবাক লাগলো। অতিশয় সুন্দর একখানা মুখ, অতিশয় বিষণ্ণ। সত্যি বলতে, যদিও তিনিই এ-বাড়ির গিন্নি, কিন্তু গিন্নিত্ব নেই কোথাও। মোটা শরীর নেই, মোটা গয়না নেই, মোটা-পাড় শাড়ি নেই, এমন কি সিঁথির সিঁদুরের রেখাটিও অতি সূক্ষ্ম। পুরোনো হাতির দাঁতের মতো হলদেটে গায়ের রং, রেশমের মতো নরম কুচকুচে কালো চুল, হাতখানা এলিয়ে আছে কপালের উপর, যেন মোমের তৈরি।

'তুমি তো খুব ছেলেমানুষ।' আস্তে-আস্তে তিনি চোখ মেললেন, আস্তে-আস্তে তিনি বললেন, 'বয়েস কত ?'

'উনিশ।'

'মা বাপ নেই ?'

'না।'

'কে আছে ?'

'কেউ না।'

'তাই।' ক্লান্ত হ'য়ে থামলেন। 'দুটি মেয়ে আছে জানো ?'

অরুন্ধতী বললো, 'জানি।'

'তাদের দেখাশোনাও তোমাকেই করতে হবে।'

'জানি।'

'পারবে ?'

অরুন্ধতী চোখ তুললো, সেই চোখের সঙ্গে চোখ মিলোলেন তিনি, 'তাদের একটি জড়। বয়স বারো, বিছানায় থাকে, জিব আড়ষ্ট। অন্যটি তার চেয়ে এক বছরের ছোটো। দুটিই মেয়ে। দুটিই এ-বাড়ির দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। আমার নয়।'

অরুন্ধতী মাথা নিচু ক'রে চুপ।

'মায়া লাগছে তোমাকে দেখে।' একটু থেমে আরো আস্তে, 'আমাকে দেখে কী অসুখ মনে হচ্ছে তোমার ?'

কী বলবে অরুন্ধতী ?

ভদ্রমহিলা মৃদু হাসলেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম হৃৎপিণ্ডের অসুখ, তারপর মনে হ'লো মাথার, এখন দেখছি ফুসফুস দুটো ফুটো।'

অরুন্ধতী চুপ।

'আমার কথা শুনতে-শুনতে তোমার নিশ্চয়ই অবাক লাগছে। তা

লাগুক। তোমার মুখখানা দেখে আজকের সকালটাতে আমার মন যেন কেমন ক'রে উঠছে। আন্নু—'

বাইরে থেকে সেই মেয়েটি এসে দাঁড়ালো।

'চা ক'রে দে। ওর চা-ও আজ আমার সঙ্গেই দে। নিচে বামুনদিকে জলখাবার সাজিয়ে পাঠাতে ব'লে আয়।'

'যাচ্ছি।' আন্নু চ'লে গেলো। চোখ বুজলেন তিনি। ঘরে একটা নিস্তব্ধতা নামলো। অনেক পরে চোখ বুজেই বললেন, 'মানুষের মেয়ের মতো অসহায় প্রাণী জীবজগতে আর কিছু নেই, বুঝলে? মনে হচ্ছে সে-বিষয়ে আমার সঙ্গে তোমার একটা মস্ত মিল আছে।'

আন্নু ঢুকলো। তার হাতে জলখাবার। লুচি হালুয়া আর পেঁপের টুকরো। খাটের তলা থেকে জলচৌকিটা টেনে তার উপর রাখতে যাচ্ছিলো, মৃন্ময়ী অস্থির হ'য়ে উঠলেন, 'করছিস কী? আমার চৌকিটায় দিচ্ছিস কেন? বাইরে থেকে একটা তেপায়া নিয়ে আয় না।'

'কেন, আপনার চৌকিটাতে দিলে কী হয়?'

'কী হয় না হয় তা যখন এখন পর্যন্ত সাব্যস্ত হ'লো না তখন না-ই বা দিলি। তার চেয়ে ওর নিজের ঘরেই দিয়ে আয়, যা। দরকার নেই এ-ঘরে ব'সে খেয়ে।'

'ওই আপনার এক ভুল ধারণা।' রীতিমতো বিরক্ত হ'লো আন্নু। বোঝা গেলো এটা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা বহুদিনের বচসা আছে। এটাও বোঝা গেলো মেয়েটির সঙ্গে তার কাকিমার সম্বন্ধটা ঠিক আশ্রিতের মতো নয়, মমতার।

অরুন্ধতী উঠে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত মুখে বললো, 'সকালে এত-কিছু খাওয়া আমার অভ্যেস নেই। তা ছাড়া এখন আমার ইচ্ছেও করছে না। অন্য একটা থালায় সামান্য কিছু দিন। এখানেই দিন।'

মৃন্ময়ী বললেন, 'আমি একাই থাকি, একাই খাই, একা-একাই আমার ভালো লাগে। এই মেয়েটা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। তার উপরে আবার তোমাকে জড়ো করা হ'লো। কী ব্যাপার বলো তো দেখি?'

ততক্ষণে পর্দার বাইরে চা নিয়ে এসে ঝি দাঁড়ালো। আন্থ নিয়ে এলো তার হাত থেকে। ঘরের মেঝেতে থালা রেখে বাইরে গেলো তেপায়া আনতে। অরুন্ধতী নিচু হ'য়ে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে মৃন্ময়ীর মাথার কাছে দাঁড়ালো। বয়স্ক, মায়ের বয়সী, এই সুশ্রী মহিলার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ভালো লাগলো তার। উনি চায়ের জন্য মাথা তুলতেই তাঁকে ঠিকঠাক ক'রে বসিয়ে দিলো, পায়ের চাদরটা টেনে দিলো আস্তে। মৃদু গলায় বললো, 'আপনি বাইরে যেতে পারেন না?'

'বাইরে?'

'এই ছাদটাতে কিংবা খোলা বারান্দায়?'

'নৃনা।' তাঁর পক্ষে যতটা জোরে মাথা নাড়া সম্ভব ততটাই তিনি নাড়লেন, 'যেদিন বাইরে যাবো একেবারেই যাবো। কিন্তু আমি ভাবছি কী, বিজ্ঞাপন দিয়ে আবার আমার জন্যে একজন শুশ্রূষাকারিণী আনা হ'লো কেন? হঠাৎ দু-বছর পরে এত যত্নের অর্থটা কী? আর যেখানে আন্থর মতো একটা মেয়ে স্বেচ্ছায় লেগে রয়েছে সর্বদা।'

আন্থ তেপায়াটা নিয়ে এসে তার উপরে অরুন্ধতীর খাবারটা তুলে দিলো, নম্র গলায় বললো, 'আপনি এবার খেয়ে নিন। কর্তাকাকা বোধহয় খোঁজ করছিলেন আপনার। কাজকর্ম সব উনি নিজে বুঝিয়ে দেবেন।'

কী আর খাবে অরুন্ধতী। খাবার মতো তার মনের অবস্থা ছিলো না। কয়েক চুমুকে অত্যন্ত মিষ্টি, অত্যন্ত বিস্বাদ চা নামক তরল পদার্থটি গলাধঃকরণ ক'রে পেয়ালা রেখে উঠে দাঁড়ালো।

৯

কর্তার ঘর এই বাড়ি থেকে একটু বিচ্ছিন্ন, একটু অভিনব। একটি সেতু দিয়ে খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। মোটা-মোটা পিলারের উপর দাঁড় করানো, উঁচু থেকে যতটা নিচু, একতলা থেকে ততটা উঁচু একটি বিরাট হলের মতো গোল ঘর। চারদিকে বড়ো-বড়ো জানলা। শোনা গেলো এই ঘরটি সম্প্রতি বানিয়েছেন উনি, নিরালা হবার জন্য। সেই ঘরে তাকে আন্নু নিয়ে এলো না, কর্তার খোদ-ভৃত্য যুধিষ্ঠির এসে নিয়ে গেলো সসম্মানে।

অরুন্ধতীকে দেখে তিনি প্রসন্ন হ'য়ে উঠলেন, 'এই যে, এসে গেছেন। তারপর, রাত্রে ঘুম-টুম হয়েছিলো তো? কোনো অসুবিধে হয় নি?'

'না, অসুবিধে আর কী।'

'বসুন না, বসুন। দাঁড়িয়ে কেন?' উনি নিজে এলিয়ে আছেন একটি ফরাশে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে, দূরে-দূরে মস্ত-মস্ত চেয়ার পাতা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারই একটায় বসলো অরুন্ধতী জড়োসড়ো হ'য়ে। তিনি অলসভাবে আলবোলায় আস্তে টান দিতে-দিতে অম্বুরি তামাকের সুগন্ধ ছড়িয়ে জিগেস করলেন, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'লো?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েদের ঘরে বোধ করি এখনো যাওয়া হয় নি?'

'না।'

'আজকের দিনটা দেখে-শুনে নিন। যদি মনে করেন কাজ বেশি তাহ'লে তক্ষুনি আমাকে জানাবেন, আমি অন্য রকম ব্যবস্থা ক'রে দেবো।'

অরুন্ধতী মাথা নাড়লো।

'ঘরটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ইচ্ছে করলে আপনি দুটো ঘরও পাশাপাশি ব্যবহার করতে পারেন।'

'কী দরকার।'

'আর আপাততো একশো টাকা ক'রে দিলেও প্রয়োজন মতো আরো-কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। কী বলেন?'

অরুন্ধতী চুপ।

'আমার স্ত্রীর জন্যেই যদিও আপনাকে আনা, কিন্তু তাই ব'লে যে সারাদিন ওই অসুস্থ মানুষের সঙ্গেই আপনাকে কাটাতে হবে তার কোনো মানে নেই। আপনি নিজের ইচ্ছে মতোই একটা নির্দিষ্ট সময় ক'রে নেবেন, তাহ'লেই হবে। মোট কথা, কাজের জন্য আপনাকে কোনো চাপই এখানে দেবো না আমি। আপন বাড়ির মতোই ঘুরে-ফিরে থাকবেন, দেখাশোনা করবেন। সন্ধেবেলা আমার কিছু জমিদারি-সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখে দিতে হবে, এই।'

'ঠিক আছে।'

'ও।' যেন সহসা মনে পড়লো, 'আপনার বংশটি তো জানা হ'লো না?'

'ব্রাহ্মণ।'

'বাঃ। তাহ'লে তো স্বজাতিই। আচ্ছা, এখন আপনি যেতে পারেন। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তাই আর মিছিমিছি আটকে রেখে কষ্ট দেওয়া কেন। অ্যাঁ—' দুলে-দুলে হাসলেন, শেষে দরজা পর্যন্ত উঠে এসে বিদায় দিলেন।

তারপর মেয়েদের সঙ্গেও দেখা হ'লো অরুন্ধতীর। আর সব-কিছুর পরে তার মনে হ'লো, এ-বাড়িতে আর যারই অভাব থাক কাজের

লোকের অভাব নেই। তাকে কি তবে শোভার জন্য আনা হয়েছে? সম্মানের জন্য আনা হয়েছে? জমিদারি চাল দেখাবার ভদ্র সংস্করণ? রাত্রিবেলা শুয়ে-শুয়ে কত কথা ভাবলো। ভালো লাগলো না। চ'লে যেতে ইচ্ছে করলো সেই মুহূর্তে। কিন্তু কোথায় যাবে? দেশে? কেউ নেই। কলকাতা? কেউ নেই। কোথাও একবিন্দু আশা নেই তার জন্য।

মৃন্ময়ীকে ভালো লেগেছে। এ-বাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে তিনি ব্যতিক্রম। তিনি দুঃখী। এখানকার কিছুর সঙ্গেই তাঁর মিল নেই। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নেই। একতলার আরো অনেক আত্মীয় আশ্রিতের মধ্যে ওই একমাত্র আন্নুই তাঁর বন্ধু। সারাদিনে এটুকু বুঝেছে অরুন্ধতী। আর জমিদার? তিনি কেমন? মন্দ কী? ভালোই তো ব্যবহার। ভালো? না, না, ভালো না। কেন ভালো না? কেন তা মনে-মনে ব্যাখ্যা দিতে পারে না সে। তবু কী জানি তাঁকে ভয়-ভয় করেছে, তাঁর সামনে ব'সে অস্বস্তি লেগেছে। বিকেলে আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি, কত ভালো-ভালো কথা বলেছেন, আশার কথা, অর্থের কথা। বলেছেন নিজের শৌর্যবীর্যের কথা। ধনদৌলতের কথা। কেন বলেছেন? কী দরকার ছিলো? অরুন্ধতী বয়সে তাঁর সমান নয়, মাইনে-করা সামান্য চাকরানি মাত্র। তার সঙ্গে এত কিসের কথা? ব'সে থাকতে-থাকতে ছেলেমানুষের মতো কান্না পেয়েছে। বন্ধ ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে যেন ভয়ের ছায়া নেচে উঠেছে।

আস্তে-আস্তে তন্দ্রা নেমে এলো চোখের পাতায়, তারপর শান্তি।

কয়েকটা দিন কেটে গেলো।

আস্তে-আস্তে বাড়ির সকলের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হ'লো। কলকাতার মাস্টারনি, দর্শনীয় ছিলো বৈকি। নিচের তলার আত্মীয়া

আশ্রিতার দল দোতলায় উঠে এলো দলে-দলে। ঘরের মেয়ে যখন পরের ঘরের কাজে যায় তখন নিশ্চয় চরিত্র হারিয়েই যায়, সেই চরিত্রহীনাকে না জানি কেমন দেখায় এই কৌতূহল তাদের মিটলো। বদ্ধ বাড়ির একঘেয়ে ঝগড়া-কোঁদলের মধ্যে একটু অন্য রকম আলাপের চাটনি জমলো। বারে-বারে এর ঘরে ওর ঘরে নানা প্রয়োজনে ডাক পড়তে লাগলো অরুন্ধতীর। প্রায় অতিষ্ঠ ক'রে তুললো। অবশেষে আন্নু একতলার চৌকো আঙিনায় দাঁড়িয়ে বড়ো গলায় ঘোষণা করলো, 'আপনারা কেউ উপরে যাবেন না, আপনারা কেউ ঐ মেয়েটিকে উত্যক্ত করবেন না, আপনারা যে নানান ছল-ছুতোয় তাকে ডেকে পাঠিয়ে বাজে কথা বলেন এ যেন আর দ্বিতীয় দিন না হয়। কাকিমা আমাকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন সে-কথা।'

ব্যস্। গলা খাটো হ'লো সকলের, ঘরে-ঘরে ফোঁসফোঁসানি উঠলো অক্ষম রাগের। 'ঈশ্! কী আমার খুড়ির অনুগত ভাসুরঝি রে! উনি এলেন ঢোল বাজাতে। ঢং আর কাকে বলে। উপরের কাজে আছেন ব'লে দেমাকে যেন আর পা পড়ে না একতলায়।'

মতিপিসি স্নান ক'রে এসে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় কাপড় নিংড়োতে-নিংড়োতে বললেন, 'ওলো বুঝিস না? দশ হাজার টাকায় কেনা বৌয়ের হুকুম কি সোজা! তবু যদি বারোটি মাস বিছানায় চিৎপটাং হ'য়ে না থাকতো। আর দেখলে দূর-দূর ক'রে না খ্যাদাতো।'

ঢ্যাঙা জেঠি বললেন, 'বলি, দিন তো ঘনিয়ে এলো, এখনো ভাঙবি তো মচকাবি না?'

অন্যান্য পরিজনেরা সকলেই একজোট হ'য়ে মৃন্ময়ীর শ্রাদ্ধ করতে ব্যস্ত হ'লো। তারা এ-ও অনুমান করলো, এই রূপবতী, মায়াবতী মাস্টারনি শেষে তার কাল হবে। জমিদারের সমাদরের ঘটাটা তো দেখছে তারা।

মৃন্ময়ী ঠিকই বলেছিলেন। অরুন্ধতীরও মনে হ'লো, মৃন্ময়ীর বোধ-হয় ফুস্‌ফুসেরই অসুখ। জ্বর তাঁর ছাড়ে না, খুক্‌খুক্‌ কাশি তাঁর লেগেই আছে। অথচ কী আশ্চর্য, এদের এত অর্থ, এত বিত্ত, তবু মানুষটাকে একটা চিকিৎসা করায় না ভালোভাবে। কবিরাজ আসে, কী বড়ি দেয়, মৃন্ময়ী তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেন, চুকে গেলো সব। আমু বলে, 'আমার কাকা কি একটা মানুষ? তার কি কোনো মায়া মমতা আছে? এখন আর-একটা বিয়ের জন্য খেপে গেছে।'

'সে কী?' অরুন্ধতী ব্যথিত হ'য়ে চোখ তোলে।

আমু সারা দুপুর গল্প করে এই পরিবারের রীতিনীতির। এই পরিবারেই খেয়ে-প'রে মানুষ সে, বাবার মৃত্যুর পরে মা তাকে নিয়ে এখানেই আশ্রয়ের জন্য আসেন, এখান থেকেই তার বিয়ে হয়। তখনো বুড়ো কর্তা বেঁচে। বর ছিলো হাঁপানি রোগী, তার উপর বয়স্ক। বছর পাঁচেকের মধ্যেই বিধবা হ'য়ে চ'লে আসে আবার এখানে। এসেই দ্যাখে, দ্বিতীয় বৌ বেঁচে থাকতেই এই কাকা অমরনারায়ণ আর-একটা বিয়ে ক'রে এনেছে। ততদিনে মারা গেছেন বুড়ো দাদু। প্রথম বিয়ে করেছিলো তেরো বছর বয়সে। সেই বৌ মারা যাবার ছ'মাস পরেই পাগল হ'য়ে গিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে। কুমারখালি রায়বাবুদের ঘরের মেয়ে ছিলো সে। সেও ছিলো অসামান্য সুন্দরী। এদের টাকা আছে, কিন্তু বংশের দিক থেকে ছোটো, তা ছাড়া সুন্দরীর উপর ভীষণ লোভ, তাই রায়বাবুরা যখন বিয়ে দিতে নারাজ হ'লো তখন তার বৈমাত্রেয় ভাইকে ছ'হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে কত কৌশলে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলো। কয়েক বছর বাদেই আবার বিয়ে করলো এই কাকিমাকে। কাকিমার বাবা গরিব হ'লেও শিক্ষিত ছিলেন। তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কায়ক্লেশে থাকতেন শহরে। তিনি কিছুতেই রাজি হন না এরকম একটা আকাটমূর্খ

গ্রাম্য জমিদারের সঙ্গে বিয়ে দিতে, যার আর-একজন স্ত্রী তখনো জীবিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকার লোভে মেয়েকে বলি দিলেন। শোনা যায় কাকিমা বিষ খেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধরা প'ড়ে যান। তারপর বিয়ের দিনও কনে সাজানো হবার পরে পালিয়েছিলেন, তাও ধরা পড়েন। চারধারে পাহারা ঘিরে নমো বিষ্ণু ক'রে বিয়ে সেরে নিয়ে আসেন এখানে। তারপর তো একেবারে আটক। সেই বছর এই দোতলা তোলা হ'লো। শুধু ওঁকে আটকাবার জন্য। কাকিমা আর-কিছু বললেন না। কিন্তু কাকার সঙ্গেও তিনি কোনোদিন কথা বলেন নি। অন্তত আনু দেখেছে ব'লে তো তার মনে পড়ে না। কাকা সারাদিন ঘরের মধ্যে তাকে নিয়ে যা-খুশি তাই করেছেন, পুতুলের মতো তিনি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন সেই জবরদস্তির হাতে। জানতেন, বাধা দেবার চেষ্টা বৃথা, আর তা ছাড়া বাধা দেবার উৎসাহও বোধহয় ছিলো না। একটি সন্তান হয়েছিলো বছর দুয়েক পরে, সেও মারা গেলো। এর পরে ঝোঁক কেটে গেলো কাকার, শুধু একপক্ষের ঝোঁক আর ক'দিন থাকে। কাকিমারও স্বাস্থ্য ভেঙে গেলো। একটু বোধহয় মাথারও দোষ হয়েছিলো তখন।

আনু আরও বললো, 'তারপর থেকে তো এই চলেছে। বিছানা নিয়েছেন। বলেন— আমার যক্ষ্মা হয়েছে। আর এই ব'লেই বোধহয় তাড়িয়েছেন কাকাকে, তা নইলে—'

অরুন্ধতী জানলা দিয়ে ধুধু রোদ্দুরের দিকে তাকালো, তারপর বললো, 'কী অদ্ভুত।'

'আলাদা গোল ঘরটাকে তখুনি তোলা হ'লো। যক্ষ্মাকে যে কাকার ভীষণ ভয়, পাছে নিজের হয়।'

'চিকিৎসা করান না কেন?'

'চিকিৎসা করাবেন কী? জানাজানি হবে না? যক্ষ্মা হ'লে কি

তাদের বাড়ির ক্রিয়াকর্মে কেউ আসে ? কেউ জলগ্রহণ করে ? কাকার মেয়ে আছে না বিয়ে দেবার ? জানাজানি হ'লে কি তার বিয়ে হবে ?'

'সে কী !' অরুন্ধতী অবাক হ'লো, 'তাই ব'লে অসুখ করলে তার চিকিৎসা হবে না ? মানুষটা ম'রে যাবে বিনা চিকিৎসায় ?'

'মরাই তো এখন চাইছেন কাকা। ঘরে বৌ বেঁচে থাকলে বিয়েতে ভারি অসুবিধে হয়।'

'আহা রে।' চোখ ছলছল করলো অরুন্ধতীর।

আনু বললো, 'আর তা ছাড়া এই কাকিমাকে কাকা ভীষণ ভয়ও পান, দ্বিতীয় বৌয়ের বেলায় যত তাড়াতাড়ি— ইচ্ছে হ'লো আর বিয়ে ক'রে আনলেন এঁর বেলায় তা পারবেন না। আমার মনে হয় হয়তো ভালোও বেসেছিলেন। কাকিমা যদি অত বিমুখ না হতেন, সমস্ত ঘটনাটা অন্য রকম হ'তে পারতো। এখনো এ-বাড়িতে কাকিমার হুকুম অমান্য করলে তার সাজা হয়।'

অরুন্ধতী চুপ ক'রে রইলো।

হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা সেদিন বৃষ্টি নামলো ঝমঝম ক'রে। গাছপালা ঝাপসা হ'য়ে গেলো মুহূর্তে, বন্ধ হ'য়ে গেলো জানলা-দরজা। অন্ধকার না হ'তেই সব নিঃঝুম।

১০

অরুন্ধতী প্রস্তুত হচ্ছিলো কর্তার ঘরে যাবার জন্য। মনটা বিমুখ হ'য়ে গেলো। এ-ক'দিনে অন্তত এটুকু জেনেছিলো, প্রথম দর্শনে লোকটাকে যত ভয়াবহ মনে হয়েছিলো, আসলে সে ততটা ভয়াবহ নয়। বোকা।

মনে-মনে ভেবেছিলো, এসে যখন পড়েইছি, আর-কিছুর জন্য না হোক অন্তত ভদ্রমহিলার জন্যও না-হয় কিছুদিন থেকে যাই। আসলে আবার কোথায় টান পড়েছে হৃদয়ের। সেই অসুস্থ মানুষটির অসম্ভব সুন্দর মুখ তাকে মায়াডোরে বেঁধেছে। মন কেন কলকাতা যেতে চায় তা সে জানে, জানে ব'লেই যেতে পারে না। জানে ব'লেই সেখানে থাকে নি। আর জানে ব'লেই আজ পর্যন্ত পৌঁছনোর খবরটিও সে জানায় নি তাদের। তাকে তো মুছে যেতে হবে, আর মুছে যেতে হ'লে সম্বন্ধের সব সুতোই ছিঁড়তে হবে আস্তে-আস্তে। ওকে তারা ভুলে যাক, সোমনাথ ভুলে যাক, কেতকীর মনের কোনো জায়গায় যেন এতটুকু আশঙ্কার ছায়া না পড়ে। ভুলুক।

আর কলকাতাতেই যদি না যায় তবে হরিণডাঙার আর অপরাধ কী? যেখানেই যাক একই তো। বরং এখানে নিরিবিলি আছে, দরকার-মতো অবসর ক'রে নেবার স্বাধীনতা আছে, হাজার ইচ্ছে করলেও একটা মানুষকে না দেখবার উপায় আছে। তারপর হয়তো একদিন ভুলে যাবে।

ভুলে যাবে? ভুলে যেতে কি সে চায়? ভুলে গেলে সে থাকবে কী নিয়ে? আর তার আছে কী? না, না, ভুলবে না। সোমনাথকে ভুলতে পারবে না সে। সোমনাথ তো কোনোদিনই তার বাস্তবের নয়। সবই তো মনের। মনে-মনেই তো সে এতকাল বাস করেছে তার সঙ্গে, তবে আজ কী হ'লো? কেন আর পারে না? কেন পারে না?

যুধিষ্ঠির দাঁড়ালো এসে দরজায়। সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত হ'য়ে উঠলো মনটা। না, যাবো না। কেন যাবো? সারা সন্ধ্যা কেন ওই নির্দয় অসৎ মূর্খ লোকটার সঙ্গে সময় কাটাবো আমি?

আজকে এই প্রথম অরুন্ধতীর মনে এ-কথাটা ধাক্কা দিলো যে, সত্যি বলতে, ওই ভদ্রলোকের কাছে তো তার কোনো কাজ নেই, তবে কেন

তিনি তাকে বসিয়ে রাখেন সারা সন্ধ্যা। সে যে একজন মেয়ে সেই অস্তিত্বেরই কি দাম দিচ্ছে লোকটা? নইলে বেশির ভাগ দিনই চিঠিপত্র লেখা থাকে না, যেদিন থাকে সেদিনও অতি সামান্য। শেষে কি একশো টাকার বিনিময়ে তার আত্মার উপর এই উৎপীড়ন চলছে? ছি, ছি। সে-অধিকার তো তার নেই। আমি অনেক সয়েছি, অনেক চুপ ক'রে থেকেছি, কিন্তু আজ তো তাহ'লে আমাকে দাঁড়াতেই হবে এর বিরুদ্ধে।

উত্তেজিতভাবে পর্দা ঠেলে বাইরে আসতেই যুধিষ্ঠির আনত হ'লো, 'কর্তা আজ গ্রামের বাইরে গেছেন। ফিরতে অনেক রাত হবে, আজ আপনাকে তাঁর কাছে যেতে হবে না।'

মেঘ না চাইতে জল। মুহূর্তে অরুন্ধতীর বুক থেকে পাথরের বোঝা নেমে গেলো। মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'লে মনের এই অবস্থায় আজ কী বলতে কী বলতো কে জানে। তার চেয়ে এই ভালো হ'লো। যুধিষ্ঠিরকে বিদায় ক'রে ঘরে এসে লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে ব'সে রইলো চুপচাপ। তারপর কখন অন্যমনস্কভাবে মৃন্ময়ীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। এই সময়ে সে আসে না, এ-সময়ে তাকে কখনো ডাকেনও না তিনি। আধো-অন্ধকারে তার ছায়া দেখে যেন চমকে উঠলেন, 'কে! কে ও!'

ঘন-রং পর্দায় হাত রেখে অরুন্ধতী বললো, 'আমি। আমি আসবো?'

'ও। অরুন্ধতী। এসো।' সঙ্গে-সঙ্গে একটা ব্যাকুল আগ্রহ ফুটে উঠলো মৃন্ময়ীর গলায়।

অরুন্ধতী আস্তে তাঁর মাথার কাছে এসে আলতোভাবে চুলে হাত ছোঁয়ালো, 'ঘুমুচ্ছিলেন?'

'না তো। কিন্তু তুমি আজ এ-সময়ে?'

'আমার এখন কোনো কাজ নেই।'

'ও। হ্যাঁ, শুনেছি শফরে গেছে। তবে বোসো।'

অরুন্ধতী বসলো। ঘরের কোণে টেবিলের উপর গোল আলোটি কমানো, তার নরম ছায়ার দিকে তাকিয়ে কী জানি কেমন করলো তার মন।

মৃন্ময়ী একখানা হাত বিছিয়ে দিলেন তার কোলের উপর, গাঢ় গলায় ডাকলেন, 'অরুন্ধতী।'

'বলুন।'

'কী সুন্দর বৃষ্টি নেমেছে আজ অসময়ে, না?'

'হ্যাঁ।'

'একটু বিছানা ছাড়ি, একটু দেখি পৃথিবীটাকে।'

সোজা হ'য়ে উঠে বসলেন তিনি, 'তুমি কি কখনো কাউকে ভালো-বেসেছো?'

স্তব্ধ হ'লো অরুন্ধতী। বুকের ভেতরটা মনে হ'লো ফেটে যাবে। এতক্ষণ এই বৃষ্টি ঝোড়ো-ঝোড়ো সন্ধ্যায় তবে কী ভাবছিলো সে?

চোখ নামিয়ে নিলো। মৃন্ময়ী একেবারে নেমে দাঁড়ালেন নিচে। 'বৃষ্টি হ'লে কী মনে পড়ে তোমার? কাকে মনে পড়ে?'

অরুন্ধতী এবার তাড়াতাড়ি ইজিচেয়ারটা এগিয়ে বালিশ দিয়ে দিলো মাথার পেছনে। নিজে বসলো মোড়া টেনে পায়ের কাছে। তারপর খানিক সময় কেবল বৃষ্টির একটানা শব্দ।

গুনগুন করলেন তিনি,

> 'অশ্বত্থপল্লবে বৃষ্টি ঝরিয়া
> মর্মর শব্দে নিশীথের অনিদ্রা দেয় যে ভরিয়া
> মর্মর শব্দে।'

অরুন্ধতী আচ্ছন্ন হ'য়ে বসে রইলো চুপচাপ।

'অরুন্ধতী।'

'বলুন।'

'বৃষ্টি হ'লেই আমার মনটা যেন ভ'রে ওঠে। ভালো আমি কাউকেই বাসি না, তবু মনে হয় যদি কেউ থাকতো। আজ, কী আশ্চর্য, মনে-মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

'ডাকেন নি কেন?'

'এই তো ডেকেছি। এই তো তুমি আমার কাছে এলে।' অরুন্ধতীকে কাছে টেনে নিলেন, 'যদি ভালো থাকতাম, যদি সময় ঘনিয়ে না আসতো তোমাকে নিয়ে আমি আলাদা সংসার পাততাম। ভাসতে-ভাসতে যেমন তুমি এই সংসারে এসে ঠেকেছো আমিও তেমনই এসেছিলাম। আমিও এ-বাড়ির কেউ না, এ-বাড়ির কিছুর সঙ্গেই আমার যোগ নেই। তাই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন সত্য হ'তে পারতো। দৃঢ় হ'তো।' জানলা দিয়ে ছাঁট আসছিলো, অরুন্ধতী উঠে এলো বন্ধ ক'রে দিতে, মৃন্ময়ী হাত তুললেন, 'থাক। আজ খুলে দাও সব, আমাকে দেখতে দাও। আমার কাছে এসো তুমি, তোমার আয়নায় আমি দেখি নিজেকে।'

অরুন্ধতী আবার বসলো এসে চুপচাপ। কয়েক মুহূর্ত অতল নিস্তব্ধতা।

'ত্যাখো,' ধীরে-ধীরে আবার চোখ খুললেন মৃন্ময়ী, 'ঠিক তোমার মতো একটি মেয়েকে আমি চিনতাম। সে বড়ো ভীরু ছিলো, বড়ো বোকা ছিলো, এমনিই শান্ত ছিলো। সে ভাবতো কী জানো? নিজের সুখ-দুঃখটাকে দাবিয়ে রাখাটাই জীবনে বড়ো কৃতিত্ব, বড়ো যোগ্যতা। ঠকলো সে। তা নইলে যা চেয়েছিলো, যাকে চেয়েছিলো, তাকে পাবার তো তার কোনো বাধা ছিলো না। এমনকি তার যখন একটা অপদার্থের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে বিয়ে স্থির হ'লো, তার বাবার সেই

দুর্মতির কাহিনী শুনে খামে ভ'রে সে বিষ পাঠিয়ে আশীর্বাদ করেছিলো। এমন আশ্চর্য, জানো অরুন্ধতী, তখনো গিয়ে সে বলতে পারলো না, আমাকে নাও। আমাকে নিয়ে এখন তুমি যা খুশি তা-ই করো। বলতে পারলো না যেখানে খুশি নিয়ে চলো সেখানে, আর আমার কারো জন্যে ভাবনা নেই, কারো কথা ভাববার নেই। চুপ ক'রে অন্ধকার ঘরে ব'সে শুধু কাঁদলো সে। যে-মন ঈশ্বর দিয়েছেন, সেই মন নিয়ে ছিনিমিনি খেললো।'

এত কথা ব'লে তিনি হাঁপাতে লাগলেন, উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'কিছু ছেড়ো না, কারো জন্যে ভেবো না, নিজের চেয়ে বড়ো আর তোমার কে আছে জীবনে ?'

আনু ঘরে এলো, 'ও মা, আপনি উঠে বসেছেন ? কেন ? আজ যে আপনার জ্বর বেড়েছে।' অরুন্ধতীর দিকে তাকালো, 'কখন এলেন ?'

'এই তো—'

'ভালোই হয়েছে। আমি গিয়েছিলাম নিচে পুজো করতে। আজ লক্ষ্মীবার কিনা। হঠাৎ কাকিমার ভীষণ জ্বর এসেছে।'

'জ্বর !' অরুন্ধতী উঠে এসে তাঁর কপালে হাত রাখলো। চোখ বুজে এলিয়ে আছেন, কানের পাশ বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে গেছে চুলের মধ্যে। এক সঙ্গে এত কথা ব'লে বোধহয় পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন। হাত পুড়ে গেলো শরীরের উত্তাপে। আকুল চোখে আনুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এত জ্বর !'

'বেড়েছে কি ?' সে-ও হাত রাখলো কপালে, 'তাই তো। কাকিমা, আপনি খাটে উঠে আসুন।'

মৃন্ময়ী চোখও খুললেন না, জবাবও দিলেন না। আনু আর অরুন্ধতী দু-জনে মিলে ধ'রে এনে শুইয়ে দিলো বিছানায়। মৃন্ময়ী চুপ ক'রেই রইলেন।

নিজের ঘরে এসে সেই রাত্রে অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে-শুয়ে মৃন্ময়ীর কথাই ভাবলো অরুন্ধতী। খোলা জানলা দিয়ে ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিলো শাড়ি, ভিজিয়ে দিলো বিছানা। টোপে ঢাকা ভাত তেমনি প'ড়ে রইলো অস্পৃষ্ট হ'য়ে, ভাবতে-ভাবতে মন কোথায় উধাও হ'য়ে গেলো।

গাঢ় অন্ধকার রাত্রির উতল নির্জনতা, গাছের পাতার টুপটাপ বৃষ্টিঝরা গান, দূরে ফুলে-ফুলে-ওঠা না-দেখা পুকুর, মেঘে-ঢাকা আকাশ। আন্নু, জমিদার, তরঙ্গিণী, সোমনাথ, বাবা, দাদামণি সব এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো মনের দরজায়। আর তারপর? তারপর কী? তারপর মৃন্ময়ী! মৃন্ময়ী আর মৃত্যু! মৃত্যু আর মৃন্ময়ী।

আবার মৃত্যু এসেছে তার পেছনে-পেছনে। তার পেছনে-পেছনে? না তো! মৃত্যু তো কবেই গ্রাস করেছে ওই একমুঠো জুঁইফুলকে। মৃন্ময়ী তো সেদিনই মারা গেছেন যেদিন লজ্জা ভেঙে চাইতে পারেন নি, হাতে পেয়েও মুঠো শক্ত করতে দ্বিধা করেছেন। যা চেয়েছিলেন, যাকে পেয়েছিলেন তার সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ হ'লো তখুনি তো ম'রে গেছেন তিনি। তখুনি? তবে তো অরুন্ধতীও ম'রে গেছে। ম'রে গেছে? যায় নি? সে-ও তো ভীরু। সে-ও তো চাইতে পারে না, কেবলি স'রে দাঁড়ায়। কিন্তু কী চাইবে সে? কাকে চাইবে? যাকে চাইবে তাকে তো আরেকজন চেয়ে নিয়েছে। তরঙ্গিণীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে চাওয়ার জোরে। দুঃখিনী তরঙ্গিণী। হতভাগিনী তরঙ্গিণী। হতভাগিনীর দুঃখের ধন ব'লে কে তার নায্য পাওনা ছেড়ে দিয়েছে? কেতকী? কেন ছাড়বে? তার নিজের চাওয়ার চাইতে কি তরঙ্গিণীর চাওয়া বড়ো? তা হয় কখনো? আমি আমার যত প্রিয় তেমন কি আর কেউ? তবে কেন আমি ছেড়ে দেবো? নিজেকে সুখী না-ক'রে অন্যের সুখ আমি কেন ভাববো? আমার কাছে আমি আগে, তারপর আর সব। তবে?

তবে কী? তবে কী আমিও চাইবো? কেন চাইবো না? হ্যাঁ, সোমনাথকে। সোমনাথকে আমি চাই। চাই। আজো চাই। চিরদিন চাই। আমি সুখ চাই, শান্তি চাই, ঘর চাই, স্বামী চাই, সব চাই। সব। সব। যা-কিছু কেতকী একদিন চেয়েছিলো, পেয়েছিলো, কেড়ে নিয়েছিলো তরঙ্গিণীর কাছ থেকে, আজ আমি সেই সবই চাই। নিজেরই অজান্তে গলায় অদ্ভুত একটা চিৎকার এলো তার, বন্ধ ঘরে সে-চিৎকার বৃষ্টির আর হাওয়ার সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেলো।

১১

পরের দিন যথারীতি আবার সকাল হ'লো। রাত্রির কালো আবরণ ভেদ ক'রে সূর্যের রং ছড়িয়ে পড়লো তেমনি আম জাম জামরুলের কচি পাতায়। পুকুরের জল আবির-গোলা হ'লো, পাখি ডাকলো, দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো সব, কিন্তু অরুন্ধতীর ঘরের দরজা বন্ধ রইলো তেমনি।

ভোরবেলা ফিরে এসেছেন কর্তা। জিতে এসেছেন মামলায়, মন বড়ো খুশি। ভদ্ররকম সকাল হ'তেই তিনি খোঁজ করলেন অরুন্ধতীর। আজ বলবার কথা আছে। মনে-মনে রচনা ক'রে রেখেছেন সেই সব কথা। সমাচার নিয়ে যুধিষ্ঠির বন্ধ দরজার সামনে এসে ফিরে গেলো। আনুও এলো একটু পরে। মৃন্ময়ীও অস্থির হয়েছেন অরুন্ধতীকে না দেখে। ঘুম ভেঙে চোখ খুললেই তো তার মুখখানা, আজ ব্যতিক্রম কেন?

বেলা আর-একটু বাড়লো। আরো বাড়লো। তারপর ধাক্কা পড়লো দরজায়। প্রথমে মৃদু, তারপর একটু জোরে, শেষে রীতিমতো জোরে। ব্যাপার কী? স্বয়ং জমিদার পর্যন্ত কোঁচানো ধুতি লুটোতে-লুটোতে হন্তদন্ত হ'য়ে দাঁড়ালেন এসে। সারা বাড়ি ভিড় ক'রে এলো। হুমকি

খেয়ে ছিটকেও গেলো কিছু, অবশেষে দরজাই ভাঙতে হ'লো লোক দিয়ে। তর্তক্ষণে ঘাম ছুটে গেছে অমরনারায়ণ রায়চৌধুরীর। ভয়ে দুরদুর করছে বুক। হায়, হায়। শেষে কি একটা খুন-টুনের মামলায় জড়াবেন নাকি? মেয়েটা ফাঁসি-টাসি দিয়ে ঝুলে রইলো নাকি? নাকি কোথাও থেকে বিষ-টিষ জোগাড় ক'রে এনে খেয়েছে? যুবতীদের কথা কি কিছু বলা যায়? কিন্তু না। কেবলমাত্র জ্বরে বেহুঁশ হ'য়ে প'ড়ে আছে চোখ বুঁজে। জমিদার একেবারে হাঁটু মুড়ে ব'সে পড়লেন সেখানে। প্রায় চোখে জল এসে গেলো। তিনি যে মনে-মনে একেই তার চতুর্থ গৃহিণীর পদ দিয়ে রেখেছেন। এই সুলক্ষণা মেয়েটিকে। যে ঘরে পা দিতে-না-দিতেই ছ'আনির মহলটি পেয়ে গেলেন তিনি। তাই তো একদিনও এতটুকু ভালোবাসার কথা বলেন নি, স্পর্শ করেন নি, হাজার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দেখা করেন নি নিরালায়। বিয়ের আগে প্রণয় করাকে তিনি ঘৃণা করেন, অশুচি মনে করেন। আজ তো সে-কথা বলতেই ডেকেছিলেন। মৃন্ময়ীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে গেলে তো অনন্তকাল আশাপথ চেয়ে থাকতে হবে। ভেবেছিলেন, অরুন্ধতীর অমত না থাকলে তিনি আর অপেক্ষা করবেন না। কত ছবি এঁকেছিলেন। সেই সব ছবি অরুন্ধতীর মুখের, যখন সে তার এই অপ্রত্যাশিত ভাগ্যের কথা জানবে তখনকার। সে কি ভাবতে পারবে এই সৌভাগ্য। কোথাকার দীনহীন একটা দরিদ্র মেয়ে, মা নেই, বাপ নেই, পরিবার-পরিজন কোথাও কিছু নেই। মাইনে-করা একটা ঝি হ'য়ে এসে হঠাৎ একেবারে স্বয়ং জমিদার অমরনারায়ণের পাটরানী?

সব ভেস্তে গেলো। মনে-মনে কপাল চাপড়ালেন তিনি। শাস্ত্রে কথাই আছে, শুভস্য শীঘ্রম, যদি অপেক্ষা না করতেন তবেই ছিলো ভালো। দু-মাস হ'তে চললো এসেছে, হ'লে তো এর মধ্যে কখন হ'য়ে যেতে

পারতো। যেদিন এসে পৌঁচেছিলো মেয়েটা সেদিনই তো বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠেছিলো তাঁর। তখুনি তো তিনি পছন্দ ক'রে ফেলে-ছিলেন। ব্রাহ্মণের মেয়ে, কোনোদিকে কোনো বাধা ছিলো না। না-হয় বিয়েটা এই বাড়িতে না-ই হ'তো, যেখানে মাছের ভেড়ি, সেখানকার বাড়িতে নিয়ে গেলে কি মৃন্ময়ীর বাপের সাধ্য ছিলো জানতে পারে? আর তার পরে অসুখ করুক বা মরুক। একবার বৌ হ'য়ে গেলে আকাঙ্ক্ষা তো পুরতো? এখন এই উদ্বেল অপূর্ণ বাসনাকে তিনি দমন করেন কী ক'রে?

১২

সেই সকালে কলকাতার আকাশও মেঘে ঢাকা ছিলো। দাড়ি কামাতে ব'সে সোমনাথ জানলায় তাকিয়ে দেখলো সেই আসন্ন বৃষ্টির শ্যাম সমারোহ। কেতকী ওই ঘরেরই এক কোণে ব'সে স্টোভ ধরাচ্ছিলো, কান্না-কান্না গলায় বললো, 'কাণ্ডটা দেখেছো? এখন এই সাত-সকালে বৃষ্টি নেমে বসলে কী মুশকিল বলো তো?'

সোমনাথ হাসলো একটু, 'সুন্দর হয়েছে দিনটা। আজ কতদিন পরে বৃষ্টি।'

'তা তো ঠিকই। তোমার আর কী! বৃষ্টির ছুতোয় এখন ঝি-টা কামাই করুক, তাহ'লেই চমৎকার।'

আসলে আজ তিন-চার দিন কাজে ইস্তফা দিয়েছে বৃন্দাবনচন্দ্র। বলা নেই, কওয়া নেই, স্ত্রীর অসুখের নাম ক'রে আগাম মাইনের টাকাটা নিয়ে উধাও। এখন এই ভারি মাসে, কেতকীর মতো অপটু মানুষের সাধ্য কী সারা সংসারের কাজ একা চালায়! একটা ঠিকে-ঝি

জোগাড় করা গেছে কোনোমতে কিন্তু চাকর জোটে নি। যতটা সম্ভব কেনা-খাবারের উপর দিয়েই চালানো হচ্ছিলো খাওয়া-দাওয়াটা, কিন্তু তবু তো কিছু করার থাকেই। রেস্তোরাঁ থেকে মাংস কিনে আনলেও ভাতটা রাঁধতেই হয়, শিঙাড়া কিনে আনলেও চা-টা করতেই হয়।

সোমনাথ অপ্রস্তুত হ'য়ে বললো, 'সত্যি তোমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। সুবিনয়টা কী বলো দেখি? ব'লে গেলো একটা লোক আছে, পাঠিয়ে দেবে, অথচ—'

'আচ্ছা, ছাখো,' হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো কেতকীর চোখ-মুখ, 'আমাদের সুবিনয়ের সঙ্গে অরুন্ধতীর বিয়ে ঠিক করলে হয় না?'

আশ্চর্য! এই মুহূর্তে সোমনাথেরও অরুন্ধতীকে মনে পড়ছিলো। কেতকী যেদিক থেকে মনে করেছে, সেদিক থেকে নয়, স্বার্থের দিক থেকে, কাজের এই বিশৃঙ্খলার দিক থেকে। এ-কথা কল্পনা করতে ভালো লাগছিলো হঠাৎ মেয়েটি এসে পড়ুক না, তবে তো সব সমস্যার সমাধান এক নিমেষেই হ'য়ে যায়।

'কী বলো?' কেতকী আবার বললো স্বামীর দিকে তাকিয়ে।

সোমনাথ বললো, 'খুব ভালো।'

'সুবিনয় নিশ্চয় পাত্র হিসেবে ওর অযোগ্য নয়।'

'খুবই যোগ্য।'

'তবে লাগিয়ে দাও না।'

'বা রে, আমি লাগাবার কর্তা নাকি? আর কার সঙ্গে লাগাবো? তার তো খোঁজই নেই।'

'সত্যি! কী অদ্ভুত মেয়ে বলো দেখি। একটা খবর না, বার্তা না, কিছু না—'

'একটা চিঠি লেখো না!'

'আমি কেন লিখতে যাবো, গরজ থাকে তো তুমি লেখো।' নিচু হ'য়ে কেতকী স্টোভে পাম্প দিলো জোরে-জোরে। বোঝা গেলো কোথায় বিগড়োলো একটু। সাবধান হ'য়ে গেলো সোমনাথ। স্থবিনয় ওদের দু-জনেরই সহপাঠী ছিলো। সম্প্রতি বি. সি. এস. পাস ক'রে সরকারি চাকরিতে বহাল হয়েছে। তার প্রসঙ্গেই ফিরে এলো আবার, 'আজ তো স্থবিনয় আসবেই বিকেলে, ব'লে ছাখো না কী বলে।'

'আমার বলাতে কী হবে? তুমি অভিভাবক, তোমারই গা ক'রে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ওর একটা ভালো বিয়ে-টিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত।'

কেতকী চাল-ডাল একসঙ্গে মিশিয়ে ধুতে নিয়ে গেলো কলের তলায়।

সোমনাথের দাড়ি কামাতে ব্যস্ত হাত থামলো। আয়না থেকে চোখ সরিয়ে আবার জানলায় তাকালো সে।

হরিণডাঙার ঘনিয়ে-আসা মেঘ গ'লে এখন বৃষ্টি হ'য়ে নামলো কিনা কে জানে, কিন্তু কলকাতায় নামলো। কাল রাত্তিরে সেখানে যেমন ঝমঝমিয়ে নেমেছিলো, ঠিক তেমনি। এই সেই বৃষ্টি, যে-বৃষ্টি নামলে খাল-বিল উপচে পড়তো সোমনাথদের গ্রামে, সোনাব্যাঙগুলো ফুর্তিতে লাফিয়ে পড়তো এ ওর গায়ে, ভেজা কাক এসে ডানা ঝাড়তো চালের বাতায়, আর ঠাকুমা ঘন-ঘন দরজায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির বেগ পরখ করতেন। তাঁর যে পাড়া-বেড়ানো বন্ধ। দাদুর ভুরু কুঁচকে যেতো জুতোতে কাদা লাগবে ব'লে, মা-র থানধুতি আর শুকুতো না গা থেকে। একা সোমনাথ আনন্দে ভেসে যেতো সেই জলের জোয়ারে। এই তো সেদিনের কথা। চোখ বুজলেই দেখতে পায় তরঙ্গিণীর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে কাপড় তোলা, শুকনো বড়ি ঘরে আনা, সব কাজ সেরে নেবার ত্রস্ত গতি। পাৎলা ছিপছিপে বেতের মতো শরীর নিয়ে কেবল এ-ঘর আর ও-ঘর। 'ওরে

আজ বেরুস নে, ওরে জানলাটা বন্ধ ক'রে দে, প্রদীপটা জেলে দে না বাবা।' নরম আর মিষ্টি গলা। তেল, নুন, মুড়ি, খিচুড়ি আর ডালের বড়া। ছোট্ট রান্নাঘরে মা-র পেছনে ব'সে থাকা। আগুনের কী তাপ। আর সেই তাপে ঝলসানো তরঙ্গিণীর কী সুন্দর মুখ। তার পরে রাত্তিরে কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুম। ঘুম অবিশ্যি আসতো না, অনেকক্ষণ টিনের চালের ঝমঝম শব্দ শুনতে-শুনতে ঢেউয়ের মতো দোলা লাগতো মনে। সেই দোলায় মন গড়াতো, গ'লে যেতো, তন্দ্রার আবেশে ঝিম ধ'রে থাকতো। তারপর হারিয়ে যেতো সমুদ্রের অতলে। আর হারিয়ে যেতে-যেতেও দেখতে পেতো সেই নীল-শিরা-ওঠা বাদামি মুখখানা। প্রদীপটি উস্কে দিয়ে বই পড়ছেন নিবিষ্ট হ'য়ে। হয় রামায়ণ, নয় মহাভারত।

ঝি এলো একখানা চিঠি হাতে ক'রে, 'কুই গো বৌদিদি, চিঠি নাও বাপু। ঈশ্‌! কী বিষ্টি, কী বিষ্টি। কে জানে র‍্যা বাবা, ঘর থেকে বেরুতে না বেরুতেই পিরথিবি এমন রসাতল ক'রে দেবে, ছ্যা ছ্যা ছ্যা, একেবারে ভিজিয়ে দিলে গা?'

কেতকী এলো হাসিমুখে, 'ভাগ্যিস আগে ভাগেই বেরিয়েছিলে ঘর থেকে, তা নইলে আর তুমি আসতে কিনা। নাও, এবার চায়ের বাসন-টাসনগুলো মেজে ফ্যালো দেখি।' চিঠিখানা হাতে নিলো সে। তারপর মুখ খুলে পড়তে না পড়তেই লাফিয়ে উঠলো, 'মা লিখেছেন। মা।' নিশ্বাস-প্রশ্বাস বড়ো-বড়ো হ'লো আনন্দে আর উত্তেজনায়, 'আমার মা লিখেছেন।' প্রায় দৌড়ে সোমনাথের কাছে এসে দাঁড়ালো সে। পড়লো জোরে-জোরে:

'মা কেটি,

কত দিন থেকেই ভাবছি তোমাকে চিঠি লিখি, অভিমানে বাধা দেয়। তুমিও তো একটা লিখতে পারতে? মাকে যদি মনেই

থাকতো তাহ'লে একদিন আসতেও আমার কাছে। তা যা-ই হোক, দুঃখ ক'রে লাভ নেই, সন্তান এমনই জিনিস যে তার উপরে কোনো রকমেই মা বিমুখ হ'য়ে থাকতে পারে না। তা ছাড়া লোক-পরম্পরায় শুনলাম তুমি নাকি অন্তঃসত্ত্বা। তাই আরো থাকতে পারলাম না। কিছুকাল যাবত তোমার কাকা নানা ভাবে আমাদের সঙ্গে ভারি বিশ্রী ব্যবহার করছিলেন। ঘুঁটেপাড়া মিশন স্কুলের সেই কালো মাস্টারনি মার্থার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব চলছে। তাই আমি ডিককে ব্যাণ্ডেল স্কুলের বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিয়েছি। নিজে হাসপাতালে মেট্রনের কাজ নিয়েছি। ছোটো বাড়ি নিয়েছি একটা, বাড়িটি শিবদয়ালবাবুর ভাগ্নির। টাওয়ার ক্লকের কাছে লাল বাড়িটা, তোমার চেনাই বাড়ি। তুমি যদি জামাইকে নিয়ে আমার কাছে আসো তাহ'লে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। তাকে আমার এই অনুরোধ জানিয়ো। সে যেন আমার উপর রাগ না রাখে। যীশু তোমাদের মঙ্গল করুন।

তোমার মা'

কেতকীর একেবারে চোখে জল এসে গেলো। মুখ তুলে বললো, 'আমি যাবো।'

সোমনাথ বললো, 'নিশ্চয়ই।'

'তোমার অমত হবে না তো?'

'কী যে বলো! সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে ওঁর চিঠি পেয়ে। এ-সময়ে মাকে পেলে কত ভালো লাগবে তোমার।'

'আজই যাই না!'

'আজ?'

'রোববার আছে, বেশ তুমিও যেতে পারবে।'

'আমি?'

'দোষ কী? এখন তো আর মা কাকার অধীন নন! স্বাধীন। আর মা-র বাড়ি মানেই আমাদের বাড়ি। চলো না।'

'কী ভীষণ বৃষ্টি!'

'বৃষ্টি এখুনি ধ'রে যাবে। এ তো আর বর্ষাকাল নয়।'

'যাবেই?'

'লক্ষ্মীটি—' স্বামীর বুকের কাছে এসে ছেলেমানুষের মতো কেতকী আব্দার করলো। এই আব্দার ঠেলতে পারে এত শক্তি সোমনাথের নেই। একটু দ্বিধা ক'রে বললো, 'আচ্ছা চলো।'

ছোটো মেয়ের মতো চঞ্চল হ'য়ে উঠলো কেতকী। তাড়াতাড়ি চাল-ডাল তেল-নুন ঠেলে দিলো খাটের তলায়। ফুর্তিতে তার গলা দিয়ে ইংরিজি গানের সুর বেরুলো বেসুরো হ'য়ে। দৌড়ে চ'লে গেলো তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে নিতে।

সোমনাথের মন আবার উধাও হ'লো সেই খাল-বিল আর নল-খাগড়ার বনে। চিলেকুঠির ছাদে। দুটি অশ্রুসজল ব্যাকুল চোখের সিক্ত পল্লবে। হিজলগাছের ছায়ানিবিড় জল। দাদু আছেন বকুলতলায় দাঁড়িয়ে, মেয়েরা জবাবনের সবুজ পাতার আড়ালে। নেপেনদার কোঁকড়া কালো চুল, শৌখিন পাম্প শু, ভূপেনদার লোমশ মোটা হাত, আর মৃদুভাষিণী বৌদি।

দাড়ি কামাতে-কামাতে হাত আবার থেমে গেলো। কোথায় গেলো সেই বালক? যাকে ঘিরে-ঘিরে একজন মানুষের নেবানো দীপ জ্ব'লে উঠেছিলো আবার; আবার আশার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন সভয়ে। আর—আর আরো একখানা মুখ মনে পড়লো সেই সঙ্গে। স্নান

ক'রে এসেছে, হাতে চিরুনি, পিঠময় মেঘের মতো ঘন ছড়ানো চুল, নম্র নত দুঃখী মুখ। নরম আঙুল জুতোপরা পায়ে এসে ঠেকলো। ঠাণ্ডা। কম্পিত। মা বললেন— প্রণাম করো, অরুন্ধতী, তোমার স্বামী।

'ও মা! এখনো তোমার হয় নি? ব'সে আছো? কী ভাবছো?'

সোমনাথ চমকে উঠলো। হাতের ক্ষুর তৎক্ষণাৎ সচল হ'লো। বললো, 'এখুনি যাবে?'

'যাই-ই যদি দেরি ক'রে কী লাভ? দেখতে-দেখতে ন'টা তো বাজলো। পথে বেরিয়ে কিছু খেয়ে নিতে আরো খানিকক্ষণ, বৃষ্টিও তো ধ'রে এসেছে।'

'এক ঘণ্টারই রাস্তা!'

'রাস্তা এক ঘণ্টার ঠিকই, কিন্তু ভজকট কম না তাই ব'লে। এখান থেকে হাওড়া যেতেই তো একঘণ্টা, আবার সেই চুঁচড়ো স্টেশন থেকে বাড়ি, সে-ও কম দূর নাকি?'

'বেশ।'

এবার ঝটপট ক'রে সেরে নিলো সোমনাথ। আহা। কতদিন পরে বেচারা মাকে দেখবে, এখন তো ওর দেরি সইবেই না। সে যতক্ষণে স্নান ক'রে এলো, কেতকী ততক্ষণে সেরে নিলো সব কাজ। বিয়ের দিন দু-জনে মিলে পছন্দ করা যে-শাড়িখানা সোমনাথ অতিরিক্ত মূল্যে কিনে দিয়েছিলো, শ্যাওলা রঙের সেই শাড়িখানা পরলো যত্ন ক'রে। ঘন ক'রে পাউডার মাখলো মুখে। পরিপাটি ক'রে চুল ফাঁপালো, সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য, সিঁথিতে সিঁদুর দিলো মোটা ক'রে, কপালে ছোট্ট টিপ প'রে আঁচল তুলে দিলো মাথায়। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই অবাক। সত্যি? কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। অরুন্ধতী ঠিকই বলেছিলো,

শাড়ির সঙ্গে খাটো চুল ভারি বিশ্রী। খোঁপা করলে আরো কত ভালো লাগতো। গলাটা কেমন খালি-খালি। যতই নাক শিঁটকোই না কেন, একটু-আধটু গয়না থাকলে মন্দ হ'তো কী? চকিতে তরঙ্গিণীর লাল শালুর থলিটি ভেসে উঠলো চোখে। না, না, ছি। তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা শেষ ক'রে সোমনাথের কাপড়চোপড় ঠিক ক'রে রাখলো।

কেতকী এতদিন কেতকীই ছিলো। সিঁদুর কৌটোটা কেন কিনেছিলো কে জানে, ব্যবহার করে নি কোনোদিন, মাথায় আঁচল তোলা বস্তুটিও পরখ ক'রে ছাখে নি। ঘরে ঢুকে সোমনাথ সত্যি চিনতে পারতো না, যদি-না জানতো তার স্ত্রী ছাড়া আর অন্য কোনো মেয়ে নেই বাড়িতে। মোটাসোটা, শ্যামলা রঙের লাবণ্যময়ী মিষ্টি বৌ। সোমনাথের বৌ। দুই হাতে একেবারে জড়িয়ে ধরলো সে— 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। কী সুন্দর।'

লজ্জায় লাল হ'য়ে মাথার কাপড় ফেলে দিলো কেতকী, বললো, 'ধ্যেৎ। ও আমি পারি না।'

'খুব পারো। থাক না।' সোমনাথ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো নতুন ক'রে। যেন সে স্ত্রীকে এই প্রথম দেখছে।

বেরুতে-বেরুতে যেমন বেলা হ'লো, পৌঁছতে-পৌঁছতেও তেমনি দেরি হ'য়ে গেলো অনেক। তার মধ্যে থেমে-থেমে দু-এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেলো ট্রেনে। এই পথে কতবার যাওয়া-আসা করেছে কেতকী, সব স্টেশন তার মুখস্থ, সব নাম সে গড়গড়িয়ে ব'লে দিতে পারে। একটা ছড়াও জানতো সব স্টেশনের,

হাওড়া, লিলুয়া, বেলুড়, বালি, উত্তরপাড়া, কোন্-নগর
রিষড়া, শ্রীরামপুর, চন্দন-নগর— বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর।

ট্রেনের চাকার তালে-তালে সে এই ছড়াটা বলতে-বলতে পথ অতিক্রম

করতো। আজ এতদিন পরে মনে পড়লো আবার সেটা। শিশুর মতো আনন্দে চকচক করতে লাগলো চোখ। আর তার আনন্দ দেখে সোমনাথেরও মন ভ'রে গেলো তৃপ্তিতে। তা নইলে অবিশ্যি এই ভ্রমণে তার খুব উৎসাহ হবার কথা নয়। এমনিতেই সে খুব মিশুক নয়, তা ছাড়া একবার সে চুঁচড়ো এসেছিলো, অনেক আগে, তখন বলতে গেলে সন্ত প্রেমে পড়েছে সে। সে-সময় দেখেছিলো কেতকীর মাকে। মনের মধ্যে খুব একটা উজ্জ্বল স্মৃতি নেই ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে। কেতকীর সঙ্গে কোনো মিল নেই তাঁর। ওর সরল সহজ স্বভাবের কোনোখানে তিনি নেই। খ্রীস্টান হ'লে কী হবে, নিতান্ত শাবেকি হিন্দুমহিলার চাইতেও রক্ষণশীল, মেয়ের ছেলে-বন্ধু বিষয়ে অসন্তুষ্টির ভাব প্রায় প্রকাশ্য ছিলো তখন। কিন্তু তাতে কী? কেতকীর তো মা। আজ তিনি কত আকুল হ'য়ে ডেকে পাঠিয়েছেন মেয়েকে। কত ভালোবাসার কাঙাল হ'য়ে।

কিন্তু কেতকী যে তার স্বামীরই, স্বামীর বাড়িরই, স্বামীর ধর্মেরই, সেটার প্রমাণ নিয়ে চলেছে তার কপালের সিঁদুরে, মাথার আঁচলে। সামান্য একটা ধর্মের দ্বন্দ্বে তিনি যে ওর স্বামীকুলকে একদিন হতাদর জানিয়েছিলেন, সেটা সে ভোলে নি। সেটা তার পক্ষে অপমান। তাই সেটাকেই আজ জয়পতাকা ক'রে চলেছে মা-র কাছে। এটুকুও বুঝতে পারলো সোমনাথ। হৃদয় আরো ভ'রে উঠলো ভালোবাসায়। কিন্তু তবু কোথায় মনের ফাঁকে-ফাঁকে এই মেঘলা দিন আজ অনেক পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। যেখানে কেতকী নেই, যেখানে শুধু মা, মা, আর মা। মা-র মুখখানাই আজ হাৎড়ে ফিরছে সারা অন্তর। মা-র ইচ্ছে, মা-র আকাঙ্ক্ষা, মা-র সুখ, এ-সব অপূরণীয় বাসনাগুলোকেই যেন ফিরে-ফিরে জায়গা দিচ্ছে মন— নেপথ্য-সংগীতের মতো। অলক্ষ্য কিন্তু অলঙ্ঘ্য। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট।

কে জানে হয়তো সেজন্যেই আজ অরুন্ধতীকেও মনে পড়ছে বারে-বারে। এই দুটি মানুষ এক তারে বাঁধা হ'য়ে গেছে তার মনের যন্ত্রে। একজনকে ভাবলেই আরেকজন এসে দাঁড়ায়। আজ এ-কথাও মনে না-ক'রে সে পারলো না, সেই মেয়েটির উপর কিছু কর্তব্য তার আছে। সেই মেয়েটির সুখদুঃখের জন্য সে-ও কিছুটা দায়ী। তার বাগ্‌দত্তা ছিলো ব'লেই তো আজ ওর এই দুর্দশা, সেজন্যই তো আজ ওকে এমন স্বজনহীন হ'য়ে গ্রাম ছেড়ে কোথায় কোন সুদূরে কার ঘরের দাসী হ'য়ে চ'লে যেতে হ'লো। তা নইলে কী হ'তো? সুন্দরী মেয়ে, বিখ্যাত বংশ, লেখাপড়া শিখেছে, যে-কোনো যুবক খুশি হ'য়ে বিয়ে করতো ওকে। যে-কোনো স্বামী সুখী হ'তো ওকে নিয়ে। সুখী হ'তো? কী ক'রে জানলো সোমনাথ? জানে না? ও তো তার মা-রই ছায়া। এই মেয়েটিকে দেখতে-দেখতে সোমনাথের তো তরঙ্গিণীকেই মনে পড়েছে ওই ক'দিন। অধৈর্যহীন, বিরক্তিহীন, ক্লান্তিহীন সেবা। কিন্তু এই মেয়েরা বোধহয় সুখী হ'তে আসে না, সুখী করতেই আসে। এরা চাইতে পারে না, চুপ ক'রে হাত পেতে থাকে ভাগ্যের কাছে।

সোমনাথের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে দিয়ে কেতকী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এসে গেছি, এসে গেছি।' ট্রেন থামতে-না-থামতেই লাফিয়ে নামলো সে। 'এই যে, এদিক দিয়ে।' সোমনাথকে পথ চিনিয়ে দিলো।

'বুঝলে?' ব্রিজের উপর দিয়ে পার হ'তে-হ'তে কেতকী বললো, 'আগে আমি কক্ষনো এটার উপর দিয়ে পার হতাম না। একেবারে সোজা রেললাইন দিয়ে— ওই যে কালো গার্ডটা। ও মা, সেই চা-ভেণ্ডারটা এখনো আছে দেখছি? ঈশ্! কী নোংরা ক'রে রেখেছে,

মা গো।' এক মুখে সহস্র কথা বলতে-বলতে এগুতে লাগলো কেতকী। কার গায়ে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যাচ্ছিলো, সোমনাথ তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেললো।

স্টেশনের বাইরে এসে সে-ই দরদস্তুর ক'রে ঠিক করলো রবার টায়ারের ঘোড়ার গাড়ি। মেঘ ছিঁড়ে আলো পড়েছে ততক্ষণে, আকাশের মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠেছে। ভালো লাগলো সোমনাথের। কেতকী গুছিয়ে বসতে-বসতে মুখ বাড়িয়ে বললো, 'টাওয়ার ক্লকের কাছে, বুঝলে ?'

কেতকীর মা ডিউটিতে ছিলেন, ছুটে এলেন খবর পেয়ে। গাঢ় আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে বেঁধে ফেললেন মেয়েকে। চুম্বনে আর চোখের জলে মিলন সমাপ্ত হ'লো। জামাইকেও যথারীতি অভ্যর্থনা করলেন তিনি, লোক পাঠিয়ে মিষ্টি আনালেন, অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর আয়োজন করলেন খাওয়া-দাওয়ার, দেখতে-দেখতে কেটে গেলো বেলা।

কিন্তু মেয়েকে সেদিন কিছুতেই ছাড়লেন না তিনি, জামাইয়ের কাছে জোড়হাত ক'রে বিনীত অনুরোধ করলেন, 'আজ তুমি ওকে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না।'

'বেশ তো। আপনার কাছে থাকবে, তাতে—'

'জানি, তোমার অসুবিধে হবে কিন্তু মায়ের প্রাণ, জানো তো বাবা—'

'নিশ্চয়ই। ওর যে-ক'দিন খুশি থাকুক না।'

কেতকী বললো, 'আমি কালই চ'লে যাবো। মা বলছেন, সকালে ডিক্‌কে খবর পাঠিয়ে আনাবেন, ওকে কতদিন দেখি না।'

'ঠিক আছে।'

এর পরে একা-একাই ফিরলো সোমনাথ। আবার চুঁচড়ো স্টেশন। স্বামীকে ওইটুকু সময়ের জন্য বিদায় দিতেই কেতকীর চোখে প্রায় জল এসে গেলো। সোমনাথ ফিরিয়ে নিলো মুখ।

মন তারও বিরস হ'য়ে গেলো বৈকি। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় নিজেকে সহসা ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হ'লো। একটি দুটি তারা ফুটলো আকাশে, বৃষ্টিভেজা সজল বিকেলটুকু কখন মিলিয়ে গেলো। স্টেশনে আসতে-আসতে সব আলো জ্ব'লে উঠলো শহরের। ট্রেন তৈরিই ছিলো, কিন্তু টিকিট কেটে আসতে-আসতে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিলো গাড়ি। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটছিলো, গার্ড ধ'রে ফেললো এসে, 'ও কি মশাই, করছেন কী ? দেখছেন না স্পীড দিয়েছে ?'

অগত্যা হতাশ হ'য়ে ব'সে পড়লো প্ল্যাটফর্মের শক্ত বেঞ্চিটার উপর। খবর নিয়ে জানলো এর পরের গাড়ির এখনো ঢের দেরি। কত দেরি ? কেতকী সঙ্গে থাকলে কিছু অসুবিধে ছিলো না, এখন একা-একা এই সময়ের সমুদ্র পার হয় কেমন ক'রে ? ব'সে রইলো চুপচাপ। গাড়ি আসছে যাচ্ছে, হুইসিল দিচ্ছে, পান-বিড়ি-সিগারেট, শৌখিন জিনিসের ঠেলাগাড়ি, কামরায়-কামরায় নানা মুখের ভিড়, মুহূর্তের বুদ্বুদ। ঢেউ ওঠে, আন্দোলিত হয়, তারপর চুপ।

হুইলার স্টল থেকে একখানা টাইমটেবিল কিনে নিয়ে এলো এবার। সত্যি-সত্যি সময়টা কখন দেখা যাক। তা ছাড়া টাইমটেবিল পড়তে খুব ভালো লাগে সোমনাথের। কত দেশ, কত নদী, কত সমুদ্র, কত-কিছু। মনে-মনে চ'লে গেলেই হ'লো। মানস-ভ্রমণই কী কম সুখের নাকি। পাতা খুলে প্রথমেই সে হুহু ক'রে দিল্লি চ'লে গেলো। তারপর একেবারে আগ্রার তাজমহল থেকে ফস্ ক'রে চ'লে এলো সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া, মিহিজাম। তারপর আবার চুঁচড়ো। আর চুঁচড়ো থেকে

তার চোখ যে-দেশের নামের উপর আটকালো তা হচ্ছে হরিণডাঙা। কী আশ্চর্য। এ-বই দেখে হরিণডাঙাও যাওয়া যায়? এক, দুই, তিন, চার, এখান থেকে মাত্র চারটে স্টেশন পরে? এত কাছে? মাত্র দেড় ঘণ্টার রাস্তা? ওই তো কলকাতা থেকে উল্টো দিকের গাড়িটা দাঁড়িয়েছে এসে, হাঁপাচ্ছে, যাত্রীরা উঠে যাচ্ছে বোঁচকা পুঁটুলি নিয়ে। ঈশ্‌! কী ভিড়। বাঃ, ফার্স্ট ক্লাশ কামরাটা তো সুন্দর। তাকিয়ে দেখতে লাগলো সোমনাথ। এই ট্রেন-ভর্তি যাত্রীরা সব আর-একটু পরেই সেই দেশ পার হবে যার নাম হরিণডাঙা, যেখানে সেই দুঃখী মেয়েটি আছে। যে-দুঃখ তরঙ্গিণীর রচনা; তরঙ্গিণীর অপূর্ণ বাসনা-সঞ্জাত যে-দুঃখ। যে-দুঃখের জন্য সর্বতোভাবে সোমনাথই দায়ী।

গার্ড নিশান দেখালো, বাঁশি ফুঁকলো, ট্রেন স্টার্ট দিলো। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সোমনাথ, আর তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখের উপর থেকে কখন মিলিয়ে গেলো সেই ট্রেন। কী আশ্চর্য, মিলিয়ে যেতেই নিজেকে একটা ইণ্টার-ক্লাশ কামরার আরোহী হিসেবে দেখতে পেয়ে অবাক হ'য়ে গেলো সোমনাথ। কলকাতার বদলে সে হরিণডাঙা চললো? কেন? অরুন্ধতীর জন্য? ছি ছি। দোষ কী? খবর নেয়া তো তার অনেক আগেই উচিত ছিলো। অরুন্ধতীকে যেতে দেয়াই উচিত ছিলো না। কিন্তু কেতকী? কী কেতকী? রাগ করবে? কেন রাগ করবে? তারও কি এ-কথাটা মনে হয় নি যে মেয়েটির একটা খোঁজ নেয়া উচিত ছিলো তার স্বামীর, এবং সেটাই মনুষ্যত্ব? অবিশ্যি কেতকীকে সোমনাথের জানানো উচিত ছিলো যে সে হরিণডাঙা যাচ্ছে। কিন্তু সে কি নিজেই জানতো সে-কথা?

অন্ধকার কেটে-কেটে হুহু ক'রে যত জোরে ট্রেন চললো, জানলা দিয়ে তাকিয়ে সোমনাথের খণ্ড-খণ্ড চিন্তা তার চেয়েও দ্রুতগতি হ'লো।

আর তারই ফাঁকে কখন এক-সময়ে ঘ্যাঁচ ক'রে থেমে গেলো গাড়ি চকিত হ'য়ে নেমে পড়লো সে।

১৩

সোনার মতো চকচকে ব্রাসো দিয়ে মাজা পেতলের বোতাম-আঁটা কালো লম্বা কোটপরা স্টেশন-মাস্টার লাল-নীল আলোর বাক্স দোলাচ্ছিলেন এতক্ষণ, গাড়ি পাস করিয়ে ফিরে আসতে-আসতে থমকে দাঁড়ালেন সোমনাথকে দেখে। আলোটা তুলে ধরলেন একটু উঁচুতে, বললেন, 'আপনি, আপনি কি—'

'আজ্ঞে আমি কলকাতা থেকে আসছি, এখানে জমিদারবাড়ি যাবার—'

'ও, বুঝতে পেরেছি। অমরনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি তো? আরে, এই হরেকেষ্ট—' নীরব স্টেশন তাঁর হঠাৎ ডাকের চণ্ডড়া আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হ'লো— 'ব্যাটা, ওখানে হাবার মতো দেখছিস কী, শুনি? আর এদিকে ইনি এসে দাঁড়িয়ে আছেন।' ছুটতে-ছুটতে একটা ঢ্যাঙা লোক অন্ধকার বেয়ে চ'লে এলো কাছে। সোমনাথ কুণ্ঠিত হ'য়ে বললো, 'আজ্ঞে আমি—'

'আমি জানি। আপনারা হলেন গিয়ে ওই কী বলে না— প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ, আপনাদের নাম মুখে নিলেও পুণ্যি। তা আপনি যান, চ'লে যান এর সঙ্গে, শুনেছি অসুখ বড়োই বাড়াবাড়ি।'

'অসুখ?' সোমনাথ অবাক।

'ওরে, আবার ওখানে খুটখুট করছিস কী এক ঘণ্টা ধ'রে, নিয়ে যা না তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, আমি তবে আসি। আমরা বুঝলেন, এই নামেই ইস্টিশন-মাস্টার। আসলে জুতোশেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই আমাদের

দিয়ে করানো হয়। বুঝলেন? নাঃ, এই ইস্টিশনে আমার আর পোষাবে না, এটা আবার একটা ইস্টিশন? হ্যাঁ, পাশপুকুর-ইস্টিশনে যদি বদলি হই তখন দেখবেন— এখানে দাঁড়িয়ে যে একদণ্ড কথা বলবো তার উপায়টি নেই। কী রে? ঠিকঠাক আছে তো চেন-ফেন?'

হরেকেষ্ট বিনীত হ'লো, 'আজ্ঞে, সব ঠিক।'

স্টেশন-মাস্টার আবার সোমনাথের দিকে ফিরলেন, 'বুঝলেন, এই সারা গাঁয়ে মাত্র একটিই সাইকেল-রিকশা। জমিদারবাবুর নিজের রিকশা। উনি এইটেতে চেপেই ভেড়িতে যান, মহলে যান, কখনো-সখনো এখানে-ওখানে বেড়াতে আসেন। তা রিকশাটিও চমৎকার। এমন রিকশা আপনি চুঁচড়োতেও পাবেন না। অর্ডার দিয়ে তৈরি কিনা।'

'তবে চলুন—' তাড়া দিলো হরেকেষ্ট। সোমনাথ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো ব্যাপারটা কী। কী এদের উদ্দেশ্য। আর অসুখই বা কার।

হরেকেষ্ট তাকে দ্বিধান্বিত দেখে আরেকবার তাগাদা দিলো। সোমনাথ আর কোনো প্রতিবাদ না-ক'রে তার সঙ্গে বাইরের দিকে এগিয়ে এলো আস্তে-আস্তে। স্টেশন-মাস্টার এত কম অবসরের মধ্যেও তার সঙ্গে-সঙ্গে এলেন রেলিং-ঘেরা সীমানার ধারে, ঈষৎ গলা খাটো ক'রে বললেন, 'একটা কথা— যদি কিছু মনে না করেন—'

'বলুন।'

'আমার ছোটো মেয়েটার আজ তিনদিন কান পেকে ব্যথা, দিনরাত কাঁদছে। যদি ফেরার বেলা একটু সময় হয়—'

এবার যেন ব্যাপারটা কী আন্দাজ করতে পারলো সোমনাথ, বিপন্ন-ভাবে বললো, 'আমাকে কি আপনি চিকিৎসক হিসেবে—'

তৎক্ষণাৎ জিব কেটে স্টেশন-মাস্টার এতখানি নিচু হলেন, 'আজ্ঞে না, তা কি আমি পারি। আমার ক্ষমতাটা কী? তবে যদি দয়া ক'রে—'

স্টেশন-মাস্টারের বিগলিত মুখখানা দেখা গেলো না অন্ধকারে, কিন্তু গলার স্বরে তাঁর মনের গদ্‌গদভাবটা বুঝে নিলো সোমনাথ। একটু চুপ ক'রে থেকে কী ভেবে বললো, 'আসবো।'

'আজ্ঞে আপনারা হলেন গিয়ে ভবসংসারের ইষ্টকবচ, আপনাদের মতো কি আর কিছু? আচ্ছা, আসি স্যর, যাবার সময় কিন্তু—'

'হ্যাঁ। ঠিক আসবো।'

সোমনাথ বাইরে এসে দাঁড়ালো। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। চাঁদ উঠেছে, ঝিরঝির ঠাণ্ডা হাওয়া। কী মাস এটা? আশ্বিন? না কার্তিকের শুরু? বুক ভ'রে নিশ্বাস নিয়ে ফুসফুস পবিত্র করলো।

'তবে আপনি বসুন জুত্ ক'রে।' সাইকেলে চেপে বসলো লোকটি। আর তার বাধ্য ছাত্রের মতো প্রশস্ত রিকশার গদিতে উঠে বসলো সোমনাথ। আর ব'সেই অস্বস্তিতে ভ'রে গেলো মন। ডাক্তার সেজে এখান থেকে গেলেও সেখানে গিয়ে কী কৈফিয়ৎ দেবে সে-কথাটাই ভাবতে লাগলো বার-বার। অন্যায়, ভীষণ অন্যায়, নেমে যাই। আমার নেমে যাওয়াই উচিত—

সামনে একটা ছায়া দেখে ক্রিং-ক্রিং বেল দিচ্ছিলো হরেকেষ্ট। জ্যোৎস্না-ধোয়া পথ দিয়ে, ধানখেত, পাটখেতের আল বেয়ে চমৎকার মসৃণ গতিতে সাইকেল চালাতে-চালাতে এর মধ্যেই সে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। সোমনাথ অচেনা প্রান্তরের চারপাশে তাকিয়ে মনের ভাবনা মনে নিয়ে ব'সে রইলো চুপচাপ। খানিক পরে জিগেস করলো, 'কার অসুখ?' যদিও মনে-মনে জানতোই, আর যারই হোক অরুন্ধতীর নিশ্চয়ই নয়, তাহ'লে আর পয়সা খরচ ক'রে কলকাতা থেকে ডাক্তার

আনতেন না জমিদার। নিশ্চয়ই সেই ভদ্রমহিলারই মাথার ব্যারাম বা দেহের ব্যারামেরই রকমফের হয়েছে। তবু কৌতূহল। লোকটি উত্তর দিলো, 'আজ্ঞে কলকাতার মাস্টার-দিদিমণির।'

'কলকাতার মাস্টার-দিদিমণির?' উদ্বিগ্ন বোধ করলো সোমনাথ, 'কে?'

'ওই যে মাস দুই আগে এখানে নতুন এসেছেন।'

'জমিদারের স্ত্রীর সেবা করতে?'

'আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন ডাক্তারবাবু। কর্তা তো এখন ওনার জন্যেই পাগল। ইদিকে গিন্নিমা যে কত ভুগতেছেন—'

'ওনার জন্যে পাগল? কেন?'

'দুঃখের কথা আর বলবো কী,' গ্রামের অশিক্ষিত সরল মুখ-আলগা মানুষ, ওই নির্জন মাঠের মধ্যেই গলা খাটো ক'রে ঘরের খবর পরের কানে দিলো, 'অমন দেবীর মতো বউ বাঁইচে থাকতে, তাঁর সমুখেই কর্তার কিনা এই বিয়ের ইচ্ছা।'

'বিয়ে করবেন? ওই মেয়েটিকে?'

'এই তো আজই শুনলাম বাবু। খেন্তির মা আবার ওনাগো সকলের ছাড়া-কাপড় কাচতে যায় কিনা, সব শুইনে এলো। আর শোনাশুনি কী, এ তো আমরা আগেই বুঝেছিলাম।'

'আগেই বুঝেছিলে?' ঠোঁটে জিভ বুলোলো সোমনাথ।

'মহিম সরকার সব জানে, ওই মহিম বুড়োই তো যত নষ্টের গোড়া।'

'ও।'

'বুড়ো হ'য়েও কর্তার যুবতীর রোখ গেলো না। এর আগের বারও তো এই কাণ্ড। ওই কুচুটে মহিম সরকারটাই তো— এই কম্মের ডাইন হাত বাঁ হাত। আর জুটেছে হরকুমার ভটচায, শালা— গ্রামের পাপ।'

এর পরে হরেকেষ্ট তাদের গাঁয়ের আরো অনেক জরুরি খবর দিলো, যার একবিন্দুও আর সোমনাথের কানে ঢুকলো না। অনেক পরে অন্যমনস্কভাবে জিগেস করলো, 'মেয়েটি কী বলে?'

'সেই মেয়ে আবার বলবে কী? এত বড়ো বাড়ি, এত ধনরত্ন, তার কাছে তো বাবু স্বগ্‌গো। চাকরানিগিরি করতে এসে রানী হওয়া? সে কি একটা সোজা কথা?'

অরুন্ধতীর প্রতি এই অবজ্ঞাসূচক উক্তিতে ব্যথা পেলো সোমনাথ, কিন্তু প্রতিবাদ না-ক'রে বললো, 'তাহ'লে তার মত আছে বলো?'

লোকটা হাসলো শব্দ ক'রে। 'কর্তার যখন নজর পড়েছে তখন কী আর মত-অমতের কথা ওঠে ডাক্তারবাবু! এই বিয়া হবেই।'

'জোর ক'রে?'

'কার ঘাড়ে কয়টা মাথা জমিদারের উপর কথা বলবে? এখানে কোনো ন্যায়-অন্যায় নেই, পাপ-অপাপ নেই, ইচ্ছে-অনিচ্ছেও নেই। বুঝলেন বাবু, সবই কেবল গায়ের জোর, সবই গায়ের জোর।' ফিসফিস করলো, 'গত বছর নিধুর বৌটা শেষে মরলো না গলায় দড়ি দিয়ে? জলজ্যান্ত বউটা, কী সুন্দর দেখতে— আহাহা—'

সোমনাথ চুপ।

জমিদার-বাড়ির ফটক দেখা গেলো। আলো জ্বলছে গেটে। সোমনাথ ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'হরেকেষ্ট, আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও তো!'

'কেন বাবু?'

'তুমি আবার স্টেশনে চ'লে যাও গাড়ি নিয়ে।'

হরেকেষ্ট অবাক হ'য়ে বললো, 'আবার আমি কেন ইস্টিশনে যাবো ডাক্তারবাবু? কিছু কি ফেলে এসেছেন?'

'না। কিন্তু আমি যে ডাক্তার নই। আমি তোমাদের সেই মাস্টার-দিদিমণির সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।'

'অ্যাঁ!'

'এই নাও, এ টাকা-দুটো তুমি রাখো, কেউ কিছু জানবে না, তুমি এখুনি চ'লে যাও।'

'আমি আপনাকে কত কথা বললাম—'

'তা তো আমার ভালোই হ'লো হরেকেষ্ট, তুমি আমার অনেক উপকার করলে। আচ্ছা এ-টাকাটাও তুমি রাখো।'

হরেকেষ্ট হাত গুটিয়ে নিলো, 'কর্তা জানতে পারলে আমার গর্দান যাবে বাবু।'

'কিছু জানবেন না তিনি। তুমি নাও।' সোমনাথ নেমে প'ড়ে তার হাতে গুঁজে দিলো টাকাটা, তারপর গাড়িটা প্রায় ঠেলে ঘুরিয়ে দিলো চাকা। গ্রামের লোক, দু-আনা চার-আনাতেই যাদের যথেষ্ট মনে হয় তিন-তিনটি কড়কড়ে টাকা হাতে পেয়ে যেন ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না, একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে আবার প্যাডেলে পা ঘোরালো, দেখতে-দেখতে ছোটো হ'য়ে মিশে গেলো মাঠের মধ্যে।

১৪

অমরনারায়ণের অস্থিরতা আজ সারাদিন তাকে অশান্ত রেখেছে। অনেক আশায় ছাই পড়েছে আজ, তাই আশঙ্কার আর সীমা নেই। কতবার যে অরুন্ধতীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, কতবার যে জ্বরের তাপ পরীক্ষা করেছে, কত লোক যে নিযুক্ত করেছে পরিচর্যার জন্য, তার ঠিক নেই। কেবলি মনে হচ্ছে তীরে এসে বুঝি তরী ডুবলো। এতদিন

রইলো মেয়েটা, আর তার ভোগ-বাসনাকে কিছুমাত্র চরিতার্থ করতে না দিয়েই পালাবে নাকি ? জীবনমরণ কি মানুষের হাতে ? তাছাড়া এখন, মনের এই উদ্বেল অবস্থায় তাকে অসুস্থ থাকতে দিলেই তো সব পেছিয়ে যাবে। আর পেছিয়ে যাওয়া মানেই সময়ের ভার অসহ্য। শব্দ পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই সোমনাথের সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি হ'লো।

'কে ?' অমরনারায়ণ অবাক হ'য়ে তাকালো মুখের দিকে। সোমনাথও তাকালো। ভালো ক'রেই তাকালো। মনে হ'লো দেখবারই মতো। এ বিষয়েও সন্দেহ রইলো না ইনিই এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, পরম প্রতাপান্বিত জমিদার অমরনারায়ণ চৌধুরী, অরুন্ধতীর পাণিপ্রার্থী।

'আপনি কী চান ?' সোনা-বাঁধানো কালো দাঁত ঝিলিক দিলো একবার, খয়েরি ঠোঁটের পানের রস অণুপরমাণু হ'য়ে ছিটোলো চারদিকে। সাবধান হ'য়ে স'রে দাঁড়ালো সোমনাথ, তারপর বললো, 'এখানকার জমিদার অমরনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে একবার দেখা হ'তে পারে কি ?'

'বেশ, বলুন।'

'আপনার এখানে মাস দুই আগে অরুন্ধতী নামে একটি মেয়ে কাজে এসেছিলেন, আমি তাঁর কাছে এসেছি।'

'কী দরকার ?'

'অনেকদিন খবর পাই নি—'

'আপনি তার কে হন ?'

'আমার নাম সোমনাথ, কলকাতা থেকে আসছি, ওঁকে বললেই উনি বুঝতে পারবেন।'

'উনি পারবেন কি পারবেন না আমি তো আপনাকে তা জিগেস করি নি, আপনার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী সেটাই আমার জানা দরকার।'

একটু চুপ ক'রে রইলো সোমনাথ, বললো, 'আত্মীয়তা কিছু নেই।'

অমরনারায়ণ এবার ভুরু কুঁচকোলো, 'তবে আপনি দেখা করতে চাইছেন কী হিসেবে?'

সোমনাথ বললো, 'এর মধ্যে আবার একটা হিসেব কী?'

'আপনাদের কাছে না থাকতে পারে, আমাদের আছে। এ-রকম অনাত্মীয় পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করা আমাদের ঘরের মেয়ে-বউয়ের পক্ষে অসম্মান।' কথা একেবারে শেষ ক'রে দিয়ে আবার ঘরের ভেতর পা বাড়ালো অমরনারায়ণ।

'সে কী!' থ হ'য়ে গেলো সোমনাথ। 'আমি তো আপনাদের ঘরের মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি না— আমি আমাদের—'

'যুধিষ্ঠির!' অমরনারায়ণের উদ্ধত গলা অসহিষ্ণু হ'লো, 'ব'লে দে তো লোকটাকে, আমার এখন বাজে কথার সময় নেই। আর এও ব'লে দে, যার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে সে এখন এ-বাড়িরই বৌ।' সোমনাথকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে সে আরামচেয়ারে বসলো, পা-টা তুলে দিলো তার মুখের দিকে, অলসভাবে বাঁ-হাতটা বাড়ালো কি বাড়ালো না, ওই কোণ থেকে হুঁকোবরদার ছুটে এসে রুপোর তারে জড়ানো সাপের মতো নলটা তার হাতে তুলে দিয়ে স'রে দাঁড়ালো অবনত হ'য়ে।

সোমনাথ প্রথমটায় হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলো। এর পরে সে কী করবে, কী বলবে কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছিলো না। তারপর হঠাৎ তার চোখ লাল হ'য়ে উঠলো লোকটার অভদ্র ইতর ব্যবহারের ধীর উপলব্ধিতে। তার মতো মানুষ কোনো জবাব খুঁজে পেলো না বটে, কিন্তু চেহারার ভঙ্গি দৃঢ় হ'য়ে উঠলো সঙ্গে-সঙ্গে।

যুধিষ্ঠির কাছে এসে বললো, 'আপনি এখন যান বাবু, কত্তামশায়ের মেজাজ ভালো নেই, মিছিমিছি—'

সোমনাথ তাকালো একবার, আর সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলো যুধিষ্ঠির।

কিন্তু ঘরে ব'সেও লোকটার উপস্থিতি অনুভব ক'রে গাত্রদাহ হ'লো অমরনারায়ণের। তার জমিদারি মেজাজ ক্রমেই চ'ড়ে উঠতে লাগলো।

এক মিনিট, দু-মিনিট, তিন মিনিট— বুকের উপর হাতের ভাঁজে হাত রেখে সোজা দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ, আর আরামকেদারায় ব'সে তামাকের নলে আলতোভাবে ঠোঁট ছুঁইয়ে ঘর থেকে সোজা তাকে দেখতে পাচ্ছে অমরনারায়ণ। আরো একটু সময় স্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ ফেটে গেলো ঢেউ, 'তবু, তবু তুমি দাঁড়িয়ে আছো, লোফার কোথাকার?' ভারি শরীরের পক্ষে রীতিমতো দ্রুতগতিতে হাতের নলটা ছুঁড়ে ফেলে চেয়ার থেকে অমরনারায়ণ উঠে দাঁড়ালো।

সোমনাথ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বললো, 'দেখা না-ক'রে ফিরে যাবার জন্য আমি আসি নি।'

'না, না, না,' দাঁতে দাঁত ঘষলো জমিদার, 'তোমার মতো একটা বাজে ছোকরার সঙ্গে আমি আমার স্ত্রীকে দেখা করতে দেবো না, ব্যস্।'

'স্ত্রী!' বাঁকা ক'রে একটু হাসলো সোমনাথ, 'বাঃ, মন্দ নয় তো। তা খবরের কাগজে স্ত্রী চাই বিজ্ঞাপন না দিয়ে অত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অসুস্থ স্ত্রীর জন্য সেবা—'

'চুপ করো, রাস্কেল। ভগৎ সিং—' বাঘের আওয়াজে বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে চ'লে এলো দুই পুরুষের দরোয়ান, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ভগৎ সিং। মিলিটারি ভঙ্গিতে দুই পা খটাং ক'রে জুড়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে জবাব দিলো, 'হুজৌর।'

'কাঁহা ঢুঁড়তা হায় উল্লু, বিল্লি কুত্তা অন্দর আরহে দেখতা নেই হো।'

সদরের গোলমাল অন্দরে গিয়েও পৌছুলো। সর্বপ্রথমে ছুটে এলো সকল সংবাদের খবরকাগজ রতিপিসি। এমনিতেই সে কান পেতে আছে দেয়ালে-দেয়ালে, এ তো তার পক্ষে বোমা। সবে প্রদীপ জ্বালা লক্ষ্মীর আসনের কাছে মালা টপ্‌কাতে বসেছিলো একটু, এর মধ্যেই এই। ডিঙি মেরে অমনি চত্বর পার হ'য়ে দৌড়ে এলো সদরের দিকে। তারপর দেখতে-দেখতে একতলার চক-মেলানো ঘরের সব দরজাই প্রায় খুলে গেলো। ছোটো একটি ভিড় জমলো বড়ো গেটে।

১৫

সকালের দিকে কেমন অদ্ভুত একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে থাকলেও বিকেলে বেশ ভালোই ছিলো অরুন্ধতী। জ্বর ছিলো না, কোনো কষ্টও ছিলো না শরীরের। আন্না আছে সব সময়, ও-ঘর থেকে মৃন্ময়ী উদ্বিগ্ন হয়েছেন; খবর নিচ্ছেন ঘন-ঘন। সেই খবরের সঙ্গে অমরনারায়ণের ব্যাকুলতার খবরও কিছু-কিছু তাঁর কানে গিয়ে পৌচচ্ছিলো। কাল বিকেল থেকে তাঁর নিজের জ্বরের উত্তাপ নেহাৎ মন্দ ছিলো না। তাতে অবিশ্যি খুশিই হয়েছিলেন তিনি। কেন না, মনে-মনে তো এ-ই চাইছিলেন। কোনো অসুখ করুক, অসুখ করুক, তবে তো যাবার রাস্তা দেখতে পাবেন? বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এই তো তাঁর সাধনা, তিনি যা চান তা তো এ-ই।

ডাক্তার আসছেন এই খবরটা জানলেন সন্ধের পরে। খবরটা ভালোই, পরের মেয়ে এখানে এসে এই নির্বান্ধব পুরীতে একা শুয়ে কষ্ট পাবে তার চেয়ে ডাক্তার এসে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলুন। সেটাই তো বাঞ্ছনীয়। উপায় থাকলে নিজের ঘরে, নিজের কাছে বুকের উত্তাপে

জুড়িয়ে দিতেন তার তাপ। কিন্তু আন্নু যে-মুহূর্তে খবরটা জানালো ভেতরটা দপ্‌ ক'রে জ'লে উঠলো নিমেষে। তৎক্ষণাৎ এই যত্নের আড়ালে তাঁর স্বামীর প্রচ্ছন্ন কোনো নোংরামি যেন দেখতে পেলেন স্পষ্ট ক'রে। এ-কথাটা তাঁর মনেই হচ্ছিলো। প্রত্যেক মাসে কড়কড়ে একশোটি টাকা মাইনে দিয়ে সে যে কেবলমাত্র স্ত্রীর যত্ন আর শিশুদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যই বিজ্ঞাপন দিয়ে এই মেয়েটিকে নিয়ে আসে নি সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না কিন্তু সত্যি-সত্যি উদ্দেশ্যটা যে কী আর কতখানি তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। লজ্জিত মুখে আন্নু আসল কথাটাই খুলে বললো, 'সবাই বলছে কাকা নাকি ওকে বিয়ে করবেন। বোধহয় মিথ্যে কথা।'

মৃন্ময়ী বললেন, 'যুধিষ্ঠিরকে ডাক।'

'যুধিষ্ঠির নিচে, সদরে।'

'আর সে-লোকটা?'

'কে? ও। কাকা? তিনিও তো সদরের বৈঠকখানায়।'

'ঠিক আছে, তুই যা এখন, যুধিষ্ঠিরকে দেখলেই বলবি সে যেন তার কর্তাকে একবার নিয়ে আসে আমার ঘরে।'

'কাকাকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' মৃন্ময়ীর গলায় ঈষৎ অসহিষ্ণুতা ফুটলো, 'ভেবে দেখেছি আন্নু, চার পাশে পাপ থাকলে তার তাপ লাগবেই যতই না তুই নিজেকে গুটিয়ে রাখিস। সেই পাপ এবার দূর করবো।'

'দূর করবেন?'

'করবো না?' মৃন্ময়ী হঠাৎ আন্নুর হাতখানা টেনে নিলেন মুঠোয়, 'ডাক এসেছে, টের পাচ্ছি, কিন্তু তার আগে কয়েকটা কাজ তো আমাকে সেরে যেতেই হবে।'

'ও-রকম বললে আমার কষ্ট হয়।' আন্নুর চোখ সত্যিই ঝাপসা হ'লো।

'বোকা মেয়ে, আয়, কাছে আয়।' টেনে তাকে চোখের সামনে নিয়ে এলেন, 'একটা মরা গাছে তুই আর কতকাল জল ঢালবি বলতে পারিস? মূল শুকোলে গাছ বাঁচে? তার চেয়ে মন খুলে বিদায় দে। আমি তো তাতেই বাঁচবো।' অসংবৃত শাড়ির আঁচল গুছিয়ে নিয়ে তিনি উঠে বসলেন, 'এবার যা, নিচে গিয়ে অপেক্ষা কর, ভেতরে এলেই এই সিঁড়ি দিয়ে আমার মহলে নিয়ে আসবি।'

আন্নু চ'লে গেলো ধীরে-ধীরে আর আন্নু যেতে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন, বেরিয়ে এলেন বাইরে, প্রথমে ঢাকা-বারান্দায় তারপর ছাদে। আঃ। কতকাল পরে বাইরে এলেন তিনি, আকাশের তলায়। তাকিয়ে রইলেন মুখ তুলে। কী যেন ভাবতে চেষ্টা করলেন, যেন কাকে মনে পড়লো কী পড়লো না, কেবল মুচড়ে উঠলো বুকটা।

অমরনারায়ণকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন, জানেন সে আসবে। আর-একটু পরেই মৃন্ময়ীর কাছে এসে শেয়ালের মতো ল্যাজ গুটিয়ে বসবে। লোকটা ভীরু। অনেক দিন পরে চোখের সামনে দেখবেন মানুষের মতো চেহারার সেই ভীরু জানোয়ারটিকে। ভাগ্যিস্ ফুসফুসে তাঁর পোকা ধরেছে, হাজার লালসায় পুড়ে গেলেও এই শরীর সে ছোঁবে না। তা নইলে— তা নইলে কী হ'তো সেটা ভেবেই মৃন্ময়ী শিহরিত হলেন। হায়! হায়! শুধু সেই লোকটার অস্পৃশ্য হবার জন্যে এই সাধনা। এই মিথ্যা খোলসের গহ্বরে দিনের পর দিন তিলে-তিলে মৃত্যু? তার চেয়ে গলায় দড়ি দিলাম না কেন? শাড়িতে আগুন জ্বালালাম না কেন? সাহস নেই? নাকি তাতেও আলস্য? কিন্তু ফাঁকি দিতে-দিতে শরীরকে তো

সত্যি জীর্ণ ক'রে এনেছি, এই তো জ্বরের উত্তাপ বন্ধুর মতো জড়িয়ে আছে সারা শরীরে। আয়ুর পাতা ঝ'রে পড়ছে দিনের পর দিন, গাছ ন্যাড়া হ'য়ে এলো। বুঝতে পারছি, ঠিক বুঝতে পারছি, শুনতে পাচ্ছি, ঠিক শুনতে পাচ্ছি, বহুদূর থেকে জলের কল্লোলের মতো মৃত্যুর গম্ভীর পদধ্বনি।

আস্তে-আস্তে ছাদ পেরিয়ে অরুন্ধতীর ঘরে এসে তার মাথার কাছে দাঁড়ালেন তিনি। লম্বা হ'য়ে ছায়া পড়লো দেয়ালে। চুপচাপ জানলায় তাকিয়ে ছিলো অরুন্ধতী, তাঁকে দেখে প্রায় চমকে উঠলো, 'আপনি! আপনি এখানে?'

তার মাথায় নিঃশব্দে হাত বুলোলেন মৃন্ময়ী। যে-খোরাকের অভাবে মন তাঁর এতকাল পঙ্গু হ'য়ে ছিলো, শরীর অকর্মণ্য হ'য়ে ছিলো, যেন সেই খোরাক পেয়ে বেঁচে উঠলেন হঠাৎ। নিচু হ'য়ে মাথায় চুমু খেলেন।

ভালোবাসা। ভালোবাসা। ভালোবাসার মতো ভালো কি আর কিছু? মনে-মনে উচ্চারণ করলেন। যেদিন ভালোবেসেছিলাম ফলের ভারে গাছের মতো সুখের ভারে আনত হয়েছিলো হৃদয়। কোথায় গেলো সে-সব দিন? সে-সব মানুষ? কোথায় গেলো সব? এই বাড়িতে, এই ঘরে ভালোবাসা নেই। এখানে কেউ কাউকে ভালোবাসে না। এমন কি অমরনারায়ণের ঐ ছোটো মেয়েটা, যে-মেয়েটাকে একদিন শূন্য মনে বুকে চেপে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন, সেই মেয়েটাও ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলো ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে। ওর মা অমরনারায়ণের মেজো স্ত্রী চোখ লাল ক'রে দৌড়ে এসেছিলো, 'ডাইনি, আমার স্বামীকে মজিয়েছে রূপ দেখিয়ে, এখন সোহাগ দেখিয়ে মেয়েটাকেও গেলবার চেষ্টা। আয়, আয় লাবি, তুই আর যাসনে ওর ধারে-কাছে, তুক্ জানে ও, ওর ছায়া মাড়ালেও পাপ।' আত্মীয়স্বজন আশ্রিত পালিত ঝি-চাকর দাসদাসী,

কত লোক গিস্‌গিস্‌ করছে এই পুরোনো চারমহলা বিষাক্ত বিরাট বাড়িটাতে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, কেউ কাউকে ভালোবাসে না। কেবল আন্নুটা কোথা থেকে এসে তাকে জড়ালে কে জানে, শুকনো ডালে একটি সবুজ পাতা। বন্ধ বাড়ির দম আটকানো যন্ত্রণায় একটি ছোটো রন্ধ্র। এই আন্নুটাই তাকে নিশ্বাস নিতে দিয়েছে। তারপর এই মেয়ে। এই অরুন্ধতী। সেই একটিমাত্র সবুজ পাতার মরা ডালেই ফুল ফোটালো ও। মস্ত জানলা খুলে দিয়ে আলোয় বাতাসে ভরিয়ে দিলো ঘর।

ভালোবাসা। ভালোবাসা। আবার ভালোবাসা এলো জীবনে। আবার জোয়ার এলো হৃদয়ে। মরবার আগে আবার সেই সুখ। সেই পূর্ণতা। প্রণয়িনী মা হ'লো এবার। মা। মেয়ে-মনের চিরকালের ঘুমন্ত বাসনা। একমাত্র বাসনা। ঈশ্বরের সৃষ্টির কৌশল। শোভা নয়, হঠাৎ-হঠাৎ দমকা হাওয়ার খুশি নয়, ক্ষণিক বসন্তের প্রতারণা নয়, হেমন্তের নবান্ন। ভয়হীন, ভাবনাহীন, দ্বিধাহীন, জ্বালাহীন স্নেহ।

কিন্তু এ থেকেও কি আবার তাকে বঞ্চিত করবে অমরনারায়ণ? বাঘ হ'য়ে হরিণের মতো গ্রাস করবে এই মেয়েকে? মৃন্ময়ী আবার তাঁরই জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখবেন এই মেয়ের মধ্যে? না, না, কিছুতেই না। তুমি ভেবেছো কি অমরনারায়ণ, পৃথিবীতে একলা তোমারই রাজত্ব? সব তোমারই খুশি-খেয়ালের মাটির পুতুল? কিন্তু তুমি জানো না তোমার পাপের দণ্ড হাতে নিয়ে আজকে কে দাঁড়িয়ে আছে এই মেয়ের মাথার উপর। একে তুমি একবার ছুঁয়ে ছাখো না তোমার লোভ দিয়ে, কী করি আমি।

কী করবো? আমি কী করতে পারি? কতটুকু আমার ক্ষমতা?

সত্যি যদি লোকটা ওকে বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর হয় কোন জাদুবলে আমি ঠেকাবো তার দুরন্ত কামনাকে? নিজেকেই কি নিজে পেরেছিলাম? তা না-ই বা পারলাম, কিন্তু আজ আমি পারবো। আমি চিৎকার ক'রে উঠবো এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আজ আমি সেই শক্তিই পণ করবো যা একদিন পারি নি। আমি পালিয়ে যাবো ওকে নিয়ে, আমি ওকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো, ফেলে দেবো ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে কিন্তু তবু— তবু তোমার কুপ্রবৃত্তির ইন্ধন হ'তে দেবো না ওকে, এই মেয়েকে, যাকে এই মুহূর্তে আমি আকুল হ'য়ে ভালোবাসছি। বসলেন তিনি বিছানায়, আর বসতেই নিচেকার গোলমাল স্পষ্ট হ'য়ে কানে এলো। চকিত হ'য়ে কান খাড়া করলেন তিনি। আন্নু ছুটতে-ছুটতে এলো, 'ও মা, কাকিমা, আপনি এখানে? কেমন ক'রে এলেন? নিচে কী কাণ্ড।' হাঁপাতে লাগলো সে।

'কী রে?' ব্যস্ত হ'য়ে মুখ তুললেন মৃন্ময়ী।

'বিশ্রী। এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান ওঁর সঙ্গে, তা কাকা কিছুতেই দেবেন না।'

'আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কে? কে আন্নুদি?' উঠে বসলো অরুন্ধতী। মৃন্ময়ী বললেন, 'কেন, দেখা করতে দেওয়া না দেওয়ার কর্তা সে নাকি?'

'কী জানি! কাকার কি মাথার ঠিক আছে? আসলে ভয় হয়েছে পাছে মৎলব ফসকে যায়। সকলের সামনেই তো জোরে-জোরে বলছেন যে অরুন্ধতী ওঁর—'

অরুন্ধতী উঠে দাঁড়ালো, 'আমি যাই, আমি দেখে আসি।'

'বোসো।' মৃন্ময়ী আলতো ভাবে হাত রাখলেন তার পিঠে। 'বুঝতে পারছি অনেক কাদা ছোঁড়াছুড়ি হচ্ছে সেখানে, তোমার গিয়ে দরকার নেই।'

'খুব সম্ভব, সে-ই এসেছে, আমি একবার— একবারটি দেখে আসি।' অরুন্ধতীর গলা থেকে যেন কান্না ভেসে উঠলো। ছটফট ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

মুহূর্তকাল মৃন্ময়ী তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে, অপলক দৃষ্টিতে। যেন কী দেখলেন, কী বুঝলেন, তারপর বললেন, 'নাম কী তার ?'

লাল হ'লো অরুন্ধতী, হঠাৎ শান্ত হ'য়ে ব'সে প'ড়ে বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিতে লাগলো।

মৃন্ময়ীর অপেক্ষমাণ দৃষ্টির তলায় ঘেমে উঠলো পিঠ, তবু জবাব দিতে পারলো না। মৃন্ময়ী আবার বললেন, 'নাম কী তার ?'

'সোমনাথ।' এবার ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলো সে নামটি। এই প্রথম। মৃন্ময়ী হাত রাখলেন তার মাথায়, একটু হাসলেন, তারপর বললেন, 'বুঝেছি। কোনো ভয় নেই তোমার, আমি তাকে তোমার কাছে এনেই পৌঁছে দেবো। কিন্তু তুমি এসো না।' সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মতো দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি, ছাদ পেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে হনহন ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন নিচে। দরজার মুখে দু-পাশের ভিড়ে ঢেউ উঠলো একটি। রতিপিসির আতঙ্কিত চাপা গলা শোনা গেলো, 'এ কী, সেজো বৌ !'

মৃন্ময়ী তাকালেন না কারো দিকে, বাইরে যাবার পেতলের কাজকরা দরজার বিরাট পাল্লাটা ধ'রে দম নিলেন একটু, হ্যাজাকের কড়া আলোয় চকিতে দেখে নিলেন সদর-উঠোনের নাটকীয় দৃশ্যটি, দেখলেন স্বামীকে, দেখলেন পরিপূর্ণযৌবন, মরীয়া-হ'য়ে-ওঠা সোমনাথকে, দেখলেন দশ বছর আগেকার ঠিক এমনিই আর-একটি দৃশ্য। তারপর সমস্ত শক্তি গলার মধ্যে সংহত ক'রে বাঁশির মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজে ডাকলেন, 'যুধিষ্ঠির।'

হুংকার ছাড়তে-ছাড়তে থেমে গেলো অমরনারায়ণ, ভগৎসিং চমকে ফিরে তাকালো, পিছু হ'টে দাঁড়ালো অন্যান্য লোকজন, আর বুড়ো যুধিষ্ঠির ছুটে এলো কাছে। 'তুমি! তুমি নেমে এসেছো এই অসুখ শরীরে? তুমি কেন মা—'

'তোমার বাবুকে মনে করিয়ে দিতে এসেছি, যুধিষ্ঠির, এ-বাড়ি তাঁর নয়, আমার। এ-বাড়িতে যথেচ্ছাচার করবার তাঁর কোনো অধিকার নেই। বাড়াবাড়ি করলে আমি বাধ্য হবো ফটক থেকে বার ক'রে দিতে।' তিনি হাঁপাতে লাগলেন উত্তেজনায়।

সব স্তম্ভিত। মাসি-পিসিরা চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে তাকালো এ ওর দিকে। গাছের পাতাটি পর্যন্ত স্তব্ধ হ'লো।

'কী, কী বললে?' এগিয়ে এলো অমরনারায়ণ। 'এত বড়ো আস্পর্ধা তোমার?'

স্বামীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে দু-পা সোমনাথের দিকে এগিয়ে এলেন মৃন্ময়ী। 'তুমি এসো আমার সঙ্গে, এরা সবাই আমার আশ্রিত, এদের ব্যবহারের জন্য এদেরই লজ্জিত হ'তে দাও—'

ভদ্রমহিলার মুখের উপর চোখ আটকে গেলো সোমনাথের।

রুখে উঠলো অমরনারায়ণ, 'যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! নির্লজ্জ, বেহায়া মেয়েমানুষ! আজ আমি তোমাকে সুদ্ধ খুন করবো, তবে—'

যুধিষ্ঠির অস্থির হ'য়ে মাঝখানে দাঁড়ালো, 'ভেতরে চলুন কর্তা, ভেতরে চলুন।' মনে-মনে বললো, 'হায়, হায়, এরা কি শেষে সকলের সামনেই মারামারি খুনোখুনি ক'রে মরবে নাকি? ঈশ্!'

কী কেলেঙ্কারি, কী কেলেঙ্কারি। যুধিষ্ঠির হটিয়ে দিলো উৎসাহী আত্মীয়ের দলকে। ছ'বছর বয়স থেকে ছেষট্টি বছর বয়স হ'লো তার

এ-বাড়িতে, এ-বাড়ির মান-সম্মানের সঙ্গে যে তার নিজের মান-সম্মানও জড়িত। এদের যে সে কলিজার মতো ভালোবাসে। ওই যে মেয়ে, ওই যে দাঁড়িয়ে আছে রানীর মতো, পটের ছবির মতো, তাকেও সে চেনে ভালো ক'রে। অমরনারায়ণ মূর্খ, তাই পেয়েও পেলো না, মানুষটার মর্ম বোঝবার মতো শক্তিও নেই ওর। চোখের দেখাই ওর বড়ো। ছাদ থেকে ছাদে দেখলো, আর উন্মাদ হ'য়ে গেলো বিয়ে করবার জন্যে। টাকা দিয়ে, কড়ি দিয়ে, এত বড়ো বাড়ির মালিকানাস্বত্ব লিখে-প'ড়ে দিয়ে নিয়ে এলো বিয়ে ক'রে। সেই সন্ধ্যার কথা এখনো মনে আছে যুধিষ্ঠিরের। শ্রাবণ মাস, সারাবেলা বৃষ্টি ঝরছে ঝুপঝুপ, কাজ নেই কর্ম নেই, কেবল ভেজা কাপড় ছড়িয়ে দেয়া আর তুলে ফেলা। এই মেয়েটি এলো। কী সুন্দর! অবাক হ'য়ে মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলো যুধিষ্ঠির। বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে তখন, আর মাত্র ছ'দিন বাকি। যুধিষ্ঠিরকে দেখে বললো, 'বাবু বাড়ি আছেন?' যুধিষ্ঠির অবাক। বিয়ের আগেই আসা-যাওয়া শুরু করেছে কেন মেয়েটা? এই তো কত কান্নাকাটি করছিলো শুনলাম। কত অশান্তি বাপেতে-মেয়েতে, এ আবার কী? ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'আছেন মা। যাও না, তুমি ঘরে যাও।'

যেন ভয় পেলো একটু, বললো, 'তুমি এসো।'

'চলো।'

কর্তার কাছে নিয়ে গেলো যুধিষ্ঠির, নিয়ে যেতেই অমরনারায়ণের পা দুটো জড়িয়ে ধরলো মেয়েটি, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললো, 'আমাকে বাঁচান। আপনি আমার বাবার বয়সী, আমাকে দয়া করুন। এ বিয়ে ভেঙে দিন আপনি। আমি পারবো না, পারবো না।'

অমরনারায়ণ দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে গেলো, 'তা কখনো হয়? তোমাকে ছাড়া আমার জীবন যে অন্ধকার।'

ছুটে বেরিয়ে এলো মেয়েটি, আর তার ব্যাকুল কান্নার বুক-ভাঙা শব্দটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সন্ধ্যার আঁধারে ঘুরে বেড়ালো চারদিকে। রাগ হয়েছিলো, খুব রাগ হয়েছিলো যুধিষ্ঠিরের। মনে হয়েছিলো, তুই বাপু একটা ছেচল্লিশ বছরের বুড়ো লোক, দু-দুটো বিয়ে করেছিস, না-বিয়ে-করা বউ ক'টা আছে তার ঠিক নেই, একটা বউ জলজ্যান্ত ঘরে বেঁচে, এই মেয়ের বয়সী মেয়েটার দিকে তোর এমন পাপনজর কেন?' যে-অমরনারায়ণকে সে কাঁধে চড়িয়ে বড়ো করেছে, যে-অমরনারায়ণের তাকে নইলে একদণ্ড চলে না, যাকে সে এই সেদিনও খোকা ব'লে ডাকতো, দোষগুণনির্বিশেষে যাকে ভালোবাসে ও ভক্তি করে, তৎক্ষণাৎ তার উপর সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ভ'রে গিয়েছিলো। তারপর থেকে দেখছে তো এত বছর। আর একটি শব্দ করে নি মেয়েটি, একটি কথা বলে নি। কচুপাতায় যেমন জল ধরে না, সুখ দুঃখ আর কিছুই যেন ধরলো না এই মানুষে। কিছুই চাইলো না আর সংসারের কাছে। জীবনের কাছে। মারো কাটো, আদর করো সে আছে সব-কিছুর উপর ভেসে, আলগা হ'য়ে। যুধিষ্ঠির ভালোবেসেছিলো মনিবের মতো নয়, মেয়ের মতো। আর সেও একমাত্র তাকে দেখলেই সারা মুখে হেসে উঠতো, কথা বলতো। বাপ কতবার নিতে এসেছিলো, যায় নি, দেখা করতে এসে কেঁদে ফিরে গেলো তবু দেখা দিলো না। মরলো পরে একদিন একটু আনমনা হ'য়ে রইলো শুধু।

সেই সব স্মৃতি আজ মনে পড়লো যুধিষ্ঠিরের। স্মৃতিই তো। এই মানুষ এই বাড়িতে এখন তো প্রায় স্মৃতিই। কবে থেকে যে সে অসুখের আড়ালে আত্মগোপন করেছে নিজের ঘরটিতে, তা পর্যন্ত মনে নেই। তার ঘরে কেউ যায় না, কেউ থাকে না, সেও বেরোয় না ঘর থেকে। কর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ তো কোনোদিনই স্বীকার করে নি, অসুখের পরে

এক ঘরে রাত্রিবাসের নিয়মটুকুও ছিঁড়ে ফেলেছে। তবে আজ হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এলো সে? কেমন ক'রে এলো? এমন একটা ছোটো ব্যাপারে সে মাথাই বা গলালো কেন? কিন্তু গলিয়েছে যখন তখন কি এর হেস্তনেস্ত না-ক'রে ছাড়বে? নাকি অমরনারায়ণের আবার বিয়ের খবরেই জ্ব'লে উঠেছে ভেজা বারুদ। মনে প'ড়ে গেছে নিজের কথা? এই নতুন মেয়েটার মধ্যে আবার নিজের ছবিই দেখছে। ঠিক এই রকমই তো ছিলো সে তখন। এই রকম বয়স, এই রকম শান্ত, মিষ্টি কাঁচা চেহারা। এই মেয়েটার জন্যও হঠাৎ মায়া করলো যুধিষ্ঠিরের।

১৬

বলতে গেলে অমরনারায়ণকে যুধিষ্ঠির প্রায় ঠেলে নিয়ে এলো ভেতরে। ঘরে এসে বোঝালো, 'কর্তা, আইন আছে, আদালত আছে, সবই কি গায়ের জোরে হয়? না-হয় বুঝলাম বিয়ে করবেন, কিন্তু এখন কি সে-দিন আছে যে জবরদস্তি করলেও তার সাজা পেতে হবে না।'

'জবরদস্তি। জবরদস্তি বলতে তুই কি বুঝিস রে উজবুক। চুপ কর।'

'চুপ করতাম, যদি তোমার ভালো-মন্দে আমার কিছুই না এসে যেতো। তোমাকে আমি এখন কর্তাবাবু বলি বটে কিন্তু একদিন তো কোলে ক'রেই মানুষ করেছিলাম। সে-মায়া কাটাই কেমন ক'রে?'

'তুই বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা ঘর থেকে। আমি এখুনি জরুরি তলব দেবো মহিম সরকারকে, আমি ভেড়িতে যাবো। বিয়ে হয় ভালো, তা না হ'লেও এই মেয়ে আমার চাই, আজ রাত্রেই চাই। আর তার

আগে ওই— ওই—' দাঁতে দাঁত ঘষলো, 'ওই ডাইনিকে আমি গলা টিপে শেষ করবো।'

'তা তুমি পারো। তাহ'লেই তোমার পাপের ষোলোকলা পূর্ণ হয়। কিন্তু মনে ক'রে ছাখো এই বাড়ি-ঘর প্রজাপত্তনি সবই আইনত ওই ডাইনিরই। এতদিন সে যত চুপ ক'রে থেকেছে আজ যদি তার প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করে তখন তুমি দাঁড়াবে কোথায়?'

'চুপ কর, রাস্‌কেল।'

'আজ এটাও তুমি খুব কাঁচা কাজ করলে কর্তামশাই। যে-ভদ্দর-লোকের ছেলেটিকে হাতের কাছে পেয়ে খামোকা অপমান করলে সে কি তোমাকে সহজে ছেড়ে দেবে? যদি পুলিশ নিয়ে আসে কলকাতা থেকে?'

'কী?'

'এই মাস্টারদিদিই যদি উল্টো সাক্ষী দেয়! তোমার কি অধিকার আছে তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে দেখা না-করতে দেবার?'

'সে আমার স্ত্রী!'

'বিয়ে তো হয় নি।'

'হবে, হবে, হবে। আলবৎ হবে। তুই বেরো আমার সুমুখ থেকে। আমি আজই, আজ রাত্রেই যা করবার করবো। পরেশ ভটচাযকে বলবো তার শাস্ত্র-ফাস্ত্র আমি মানি না। এই মুহূর্তে বিয়ের তারিখ ঠিক করতে পারে ভালো, নইলে তাকে এই গ্রাম থেকে আমি তাড়িয়ে ছাড়বো। আর বিয়ে হ'লে ওই বদ ছোকরাকেও আমি একবার দেখে নেবো। ওঃ, কী আমার সুভদ্রার অর্জুন রে। বন্ধু! বন্ধুতা করতে এসেছেন ট্রেনে চেপে। ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ ছাখো নি। বদ্‌মাস, জোচ্চোর—' অমরনারায়ণ ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করতে লাগলো।

ততক্ষণে সোমনাথকে নিয়ে ভেতরে এলেন মৃন্ময়ী। নিজের ব্যবহারের স্নিগ্ধতায় ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন মন। উপরে নিয়ে আসতে-আসতে ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এ-বাড়ির এ-ই হাল, এরই মধ্যে আমরা বাস করি। কিন্তু মেয়েটিকে আর এ-নরকে এক মুহূর্ত নয়।'

'না, আর নয়। আমি আজই ওকে নিয়ে যাবো। যে ক'রেই হোক।' সোমনাথের গলায় তার অধিকারের দাবি ফুটে উঠলো।

মৃন্ময়ীর শান্ত দৃষ্টি স্থির হ'লো তার মুখের উপর, আস্তে বললেন, 'তাই নিয়ে যাও। কিন্তু এত দেরি ক'রে এত কষ্ট দিলে কেন? কেন এতদিন বিয়ে করো নি?' এতদিন কোথায় ছিলে? কেন আসো নি? কেন এই দেরি—'

'বিয়ে!'

'আমি বুঝেছিলাম, অরুন্ধতীর চোখে তো আমি এই ছায়াই দেখেছিলাম, এই সংশয়ের অন্ধকার। কিন্তু কেন? অপেক্ষা করলে অনেক-কিছু থেকেই তার নির্যাস নিংড়ে নেয়া যায়, কিন্তু এখানে তো নয়, এ ব্যাপারে তো নয়। আমি বলবো দেরি ক'রে তোমরা শুধু-শুধু—'

'আপনি— আপনি একটু ভুল করছেন, আমি—'

'ভুলই তো করেছি। ভুলের প্রায়শ্চিত্তই তো করছি সারা জীবন। কিন্তু আর না। আর কাউকে আমি করতে দেবো না সে-ভুল। সে-ভুলের যে কী যন্ত্রণা, কী বঞ্চনা তা তো আমি জানি। না, আর কোনো মেয়ের মধ্যেই আমি সেই জ্বালা দেখতে পারবো না। বাঘের মুখে হাত দিয়ে এবার আমি হরিণ ছিনিয়ে নেবো।' বলতে-বলতে চোখের দৃষ্টি তাঁর কোথায় কতদূরে চ'লে গেলো সোমনাথের মুখ থেকে।

নিস্তব্ধ হ'লো সোমনাথ। আজ এই তার নিয়তি। এই নিয়তি নিয়েই বেরিয়েছে সে বাড়ি থেকে, এই ভুলের নিয়তি নিয়েই সে

এ-বাড়ির ফটকে ঢুকেছে। এই ভুলের বিনিময়েই হয়তো অমরনারায়ণের খাঁচা থেকে উড়িয়ে নেয়া সহজ হবে অরুন্ধতীকে। তবে কি মৃত্যুর পরপার থেকেও তরঙ্গিণী রক্ষা করছেন তাঁর কন্যাকে, মৃত্যুর পরেও তিনি অলক্ষ্য আদেশে নিয়ে এসেছেন তাঁর ছেলেকে এইখানে? তবে তাই হোক, তবে এই মিথ্যার তিমির থেকেই জ্ব'লে উঠুক আলো, মানুষটা বাঁচুক।

১৭

ওই ঘরে, নিজের রোগশয্যার পরিমণ্ডলে শুয়ে-ব'সে ক্রমেই অধীর হ'য়ে উঠছিলো অরুন্ধতী। মৃন্ময়ীর নির্দেশমতো অধৈর্যহীন হ'য়ে অপেক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হ'য়ে উঠছিলো তার পক্ষে। অশান্ত হৃদয়ে সে ছটফট করতে লাগলো। উঠলো, বসলো, জানলার ধারে এলো। মন অস্থির। ঘরের মাঝখানে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো এবার অনেকক্ষণ, তারপর কী ভেবে দরজার ধারে এলো। যে-প্রত্যাশার একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা তাকে ব্যাকুল ক'রে রাখছিলো, পাছে সে-প্রত্যাশা ভেঙে যায়, হয়তো সেই ভয়েও সে ঘরের বাইরে পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছিলো না, কিন্তু সময়ের ভার বড়ো অসহ্য, দু-হাতে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো সে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ডটা যেন বন্ধ হ'য়ে গেলো। হাসিমুখে আনু বললো, 'এই যে, এঁর কথাই তো আপনি ভাবছিলেন? কাকিমা পাঠিয়ে দিলেন।' সোমনাথকে ঘরের ভেতর পৌঁছে দিয়ে চ'লে গেলো সে।

তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা। রাত বাড়লো এক প্রহর, বাগানের বড়ো গাছের আশ্রয়ে ডানা ঝাপটে কিচিরমিচির ক'রে উঠলো পাখিরা, হেমন্তের ঠাণ্ডা, খোলা জানলা দিয়ে হিম ছড়ালো

একমুঠো, গায়ের আঁচলটা আরো ঘন ক'রে গায়ে দিয়ে কুণ্ঠিতমুখে অরুন্ধতী বললো, 'আপনি এসেছেন !'

'জানতেন না ?'

'না তো।'

তক্তপোশের টান চাদরটা আরো একটু টান ক'রে মাথার দিক থেকে বালিশ দুটো সরিয়ে জায়গা ক'রে দিলো অরুন্ধতী, 'বসুন।'

'শুনলাম অসুখ করেছে—'

'সামান্য।'

'জানানো উচিত ছিলো।'

চুপ ক'রে রইলো অরুন্ধতী।

'বসুন না।'

এটা সোমনাথের অভ্যর্থনা।

অরুন্ধতী কমানো লণ্ঠনটা বাড়িয়ে আরো একটু আলোকিত করলো ঘর, তারপর পায়ের দিকে বসলো জড়োসড়ো হ'য়ে।

'এতদিন এসেছেন, একটা খবর দেন নি কেন ?' গলার স্বর বেশ ভারি।

'আমার আর কী বা খবর—'

'নতুন একটা জায়গায় এসে ঠিক মতো পৌছতে পারলেন কিনা সেটা তো অন্তত জানাতে হয়।'

'আমি ঠিক মতোই এসেছিলাম।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু ঠিক জায়গায় যে নয় তা অবিশ্যি না-এলে জানতাম না।' সোমনাথের মুখের দিকে দৃষ্টি তুললো অরুন্ধতী। চোখে চোখ রেখে সোমনাথ গম্ভীর গলায় বললো, 'আপনি এতদিনেও এখান থেকে চ'লে যান নি কেন ?'

'আমি তো এখানে বেশ আছি।'

'বেশ আছেন? এই ইতর বর্বর লোকটার বাড়িতে বেশ আছেন আপনি?'

'আর আমার উপায় কী?'

'বিজ্ঞাপন দিয়ে, বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে যে-উদ্দেশ্যে ও আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে তার চেয়ে উপায়হীন অবস্থা আমি তো আর কিছু ভাবতে পারি না।' উদাস দৃষ্টি জানলায় মেলে দিলো সোমনাথ।

'উদ্দেশ্য? কী উদ্দেশ্য?' একটু ভয় পেলো অরুন্ধতী। সংশয়ের যে-কাঁটা প্রায় প্রত্যহই তাকে ব্যাকুল ক'রে রাখে সে-অনুভূতিটা প্রবল হ'য়ে উঠলো।

রাগ করলো সোমনাথ, 'ছেলেমানুষ নন, এটুকুও যদি না বুঝবেন তাহ'লে আপনার বাইরে আসা উচিত হয় নি।'

তাই তো। এবার অরুন্ধতী মনে-মনে হাসলো। এই বিশ্বসংসারে তার জন্য কত ঘর সাজানো আছে থরে-থরে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু অধীর হ'য়ে বললো, 'কী হয়েছে?'

'কিছুই না। দয়া ক'রে আপনি প্রস্তুত হ'য়ে নিন, আমি আজই নিয়ে যাবো আপনাকে। এই অসচ্চরিত্র জমিদার-নন্দনটির স্ত্রী হবার চাইতে আরো অনেক ভালো কাজ আছে জীবনে।'

'কী!' অরুন্ধতী প্রায় আঁৎকে উঠলো।

'একটা মানুষের জীবন এত তুচ্ছ নয় যে তাকে এমনভাবে একটা জন্তুর কাছে বলি দিয়ে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে হবে।'

'এ-সব আপনি কী বলছেন—'

'আপনি কি কিছুই জানেন না, কিছুই বোঝেন নি? শোনেন নি?'

'না তো।' অরুন্ধতীর অস্ফুট রুদ্ধস্বরে পৃথিবীর ভয় নেমে এলো, তারপর আস্তে-আস্তে সেই ভয় ছড়িয়ে পড়লো তার চোখে মুখে, সারা শরীরের ভঙ্গিতে, মোমের মতো সুডৌল মসৃণ গলার পাৎলা শাদা চামড়াটার কেঁপে-কেঁপে ওঠায়।

সোমনাথ বললো, 'এতক্ষণ তাহ'লে কিসের গোলমাল? সেই অধিকারেই তো তিনি আমার মতো একজন অনাত্মীয় ভদ্রলোককে তাঁর ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দিতে চান নি।'

'স্ত্রী!' ছটফটিয়ে উঠলো অরুন্ধতী, 'কী বিশ্রী! কী ভীষণ—'

অরুন্ধতীর অস্থিরতা দেখে সোমনাথ হাসলো একটু। নরম গলায় বললো, 'এত ভয় কিসের, আমিই তো আছি।'

'আপনি!'

'কেন, আমাকে কি ভরসা হয় না?'

'ভরসা হয় না?' তোলপাড় ক'রে উঠলো অরুন্ধতীর বুক, মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলো নিজের অবস্থা, উনিশ বছরের মেয়ে এতদিনে তার উনত্রিশ বছরের গাম্ভীর্য হারিয়ে ঠিক উনিশ বছরের মতোই ভয়ে দুঃখে আবেগে ব্যাকুল হ'য়ে নিজেকে নিয়ে একেবারে ভেঙে পড়তে চাইলো সোমনাথের কাছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। তার পরই সামলে নিলো। গানের মীড়ের মতো বুকের ভেতরে গড়িয়ে যেতে দিলো সেই ঢেউ, খাটের রেলিঙে নিজের ভার ন্যস্ত ক'রে শান্ত গম্ভীর গলায় বললো, 'মিছিমিছি এলেন। কত কষ্ট হ'লো। অসম্মান হ'লো।'

'সেটাই আপনি বড়ো ক'রে দেখছেন কেন? আমি না-এলে এ-বাড়ি থেকে আপনি কী আর বেরুতে পারতেন?' হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো সে, 'আপনি এবার প্রস্তুত হ'য়ে নিন।'

'আমি! আমি কোথায় যাবো?'

'কী আশ্চর্য !' অধৈর্য হ'য়ে সোমনাথ বললো, 'কলকাতা যাবেন।'

'কলকাতা !'

'কেন, সে-জায়গাটা কি এখান থেকেও খারাপ ?'

অরুন্ধতী বলতে পারলো না সে-জায়গা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না ব'লেই তার এত যন্ত্রণা, এত দুঃখ। বলতে পারলো না— সেখানে যাবার অসম্মানের চেয়ে, কষ্টের চেয়ে এই জমিদারবাড়ির কারাগারও তার পক্ষে সহনীয়। একটু চুপ ক'রে থেকে শুধু বললো, 'আমি যাবো না।'

'যাবেন না !' অবাক হ'লো সোমনাথ।

'না।'

'এখানেই থাকবেন ?'

'কলকাতা গিয়ে কোথায় থাকবো ?'

'আপনি কি জানেন না, সেখানে আমার একটা বাসস্থান আছে ?'

'তাতে আমার কী ?' অভিমানে ভেঙে এলো অরুন্ধতীর গলা। 'এখানে থাকার আমার জোর আছে, আমি এখানে চাকরি করি কিন্তু সেখানে কী অধিকারে আমি উঠবো গিয়ে ?'

সোমনাথ বললো, 'যদি এ-বিয়ে আপনি আটকাতে না পারেন ?'

'ভেসে যাবো।' অরুন্ধতী আবছা হাসলো। 'মরবার সাহস তো নেই ; কেউ যদি এ-ভাবেই মেরে ফেলে, ভবিতব্য ব'লেই মেনে নেবো।'

'এ-সব ছেলেমানুষি ছাড়ুন।' অভিভাবকের মতো এবার ধমকে উঠলো সোমনাথ, 'ছেলেমানুষি ক'রেই আপনি এই বিপদ ডেকে এনেছেন।'

'বিপদ কোথায় ? এখানে এসে আমি আশ্রয় পেয়েছি, বন্ধুতা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি—'

'কার ?' মানুষের মনের কোন গহনতম, গোপনতম অন্ধকারের

মধ্যে কোথায় যে কী লুকোনো থাকে কে জানে। সহসা বুকের এই প্রান্তর থেকে ওই প্রান্তর পর্যন্ত একটা ঈর্ষার বিদ্যুৎ যেন ঝলসে উঠলো, তীব্র দৃষ্টিতে অরুন্ধতীর প্রায় অবিশ্বাস্য সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বললো, 'জমিদারের ?'

অরুন্ধতী বললো 'বাধা কী।'

তাই তো। বাধা আর কী। 'বেশ !' উঠে দাঁড়ালো সোমনাথ, 'আমার কর্তব্য আমি করলুম, এর পর আপনার নিজের দায়িত্ব আপনার।' অরুন্ধতী জবাব দিলো না। সোমনাথ পা বাড়িয়ে বললো, 'তাহ'লে আমি যাই। আর কিসের অপেক্ষা ?'

'এখুনি !' চকিত হ'য়ে চোখ তুললো অরুন্ধতী আর তার সজল চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলো সোমনাথ। কয়েকমুহূর্ত পৃথিবীতে কেবলমাত্র টলটলে দুই চামচে জল ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব রইলো না তার কাছে।

চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার সে ব'সে পড়লো বিছানায়। আস্তে বললো, 'দেরি ক'রে কী লাভ, সব গুছিয়ে নিন।'

পর্দা ঠেলে এক হাতে শ্বেতপাথরের থালায় খাবার, আরেক হাতে শ্বেতপাথরের গ্লাশে জল নিয়ে আন্নু ঘরে ঢুকে একটু হেসে বললো, 'কাকিমা ব'লে পাঠালেন, অনেক তো হ'লো, এটুকুও হোক।'

১৮

এদিকে মৃন্ময়ী ঘরে এসে ডেকে পাঠালেন যুধিষ্ঠিরকে, বললেন, 'এ-সব খবর আমাকে এতদিন বলো নি কেন ?'

যুধিষ্ঠিরের ঈষৎ নোয়ানো লম্বা শরীরের ছায়াটা আরো লম্বা হ'লো

দেয়ালে। সে এ-কাঁধের ঝাড়ন ও-কাঁধে নিয়ে তাকালো চারিদিকে, ভাঙা-ভাঙা মোটা গলায় ফিসফিসিয়ে বললো, 'সেই কৈফিয়ৎ এখন তলব কোরো না মা, যদি পারো ওই ভদ্দরলোকের ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটিকে পাঠিয়ে দাও তার বাড়িতে, ঘরেতে।'

'কেন ?'

'ঘায়ের গন্ধে যেমন মাছি আসে মহিম সরকারও তেমনি উড়ে এসেছে কর্তার ঘরে, পরামর্শ বসেছে দরজায় খিল দিয়ে। তুমি কি মনে করো এখন এই কুপ্রবৃত্তির কোপ থেকে তা নইলে রক্ষে করতে পারবে তাকে ?'

'তুমি কি ভুলে গেছো এ-বাড়ির একমাত্র মালিক আমি ?'

'মনে আছে, মনে আছে, সব মনে আছে আমার, কিন্তু বাড়ি যে তোমার সে-কথা তো জানে আদালত, আর বাড়ি যে কর্তাবাবুর সে-কথা মানে সারা গাঁয়ের লোক।' মাথায় করাঘাত করলো যুধিষ্ঠির, 'তবে শোনো সব, আজ পারলে আজ, কাল পারলে কাল, যে-কোনো সুযোগে যে-কোনো সময়ে ছলে বলে কৌশলে যে-কোনো উপায়ে ওরা গোপনে একেবারে সরিয়ে ফেলবে মেয়েটিকে, ভেড়িতে নিয়ে যাবে, বিয়ে হবে সেখানে, আর বিয়ে না-ই বা হ'লো, একবার সেখানে গেলে কি সব্বোনাশের বাকি রাখবে কিছু ?'

গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরুলো মৃন্ময়ীর। কেঁপে উঠলেন তিনি। যুধিষ্ঠির বললো, 'আমি কি জানতাম এ-সব, আমি কি ভাবতে পারতাম ? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যখন শুনলাম, আমার মাথার মধ্যে যেন গুলিয়ে গেলো। তোমাকে কর্তার গোপন কথা ব'লে দেয়া আমার বিশ্বাস-ঘাতকতা, আর বলেছি জানলে আমার ঘাড়ে মাথাটা থাকবে না, কিন্তু চাকরই হই, যা-ই হই, মন তো আমার আছে একটা, ধর্ম তো আছে,

কতগুলি ছেলেপুলের বাপ তো আমি। একটা মেয়ের এত বড়ো সব্বোনাশের কথা জেনেও চুপ ক'রে থাকি কেমন ক'রে। আন্নুদিদি না ডাকলেও আমি তোমার কাছে আসতাম, বলতাম, "মাগো, তুমি ঠেকাও।" '

'তবে এখন উপায়?' যেন জলের মধ্যে তলিয়ে যেতে-যেতে কথা বললেন মৃন্ময়ী। যুধিষ্ঠির দরজার কাছে পা বাড়ালো। 'আমি এবার যাই, যদি কোনোরকমে কর্তা টের পান এ-ঘরে এসেছি, তবে আর উপায় নেই। শোনো, সদর দরজা দিয়ে ওদের পার করা যাবে না। সেখানে তালা প'ড়ে গেছে এতক্ষণে। তাছাড়া পাহারা আছে, আমার মনে হয়, এই ছেলেটিকেও ওরা আটকে রাখবে, ভয় আছে না? যদি বাইরে থেকে লোকজন এসে হামলা করে, পুলিশই আনে যদি?'

'যুধিষ্ঠির!'

'এখান থেকে পালানো আজ বড়ো শক্ত মা। যাই হোক, তুমি হুঁশিয়ার থাকো। আমি দেখছি কী করতে পারি।'

দেয়ালে ঘেঁষে-ঘেঁষে নিজেকে নিয়ে একেবারে বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে চুপে-চুপে চ'লে গেলো যুধিষ্ঠির। মৃন্ময়ী ব'সে পড়লেন মেঝের উপর। অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন ভাবতে পারলেন না কিছু, গায়ের আঁচল শিথিল হ'য়ে ছড়িয়ে রইলো লম্বা রেখায়। কিন্তু হঠাৎ উঠলেন, বালিশের তলা হাৎড়ে বার করলেন লোহার দেয়াল-আলমারির চাবিটা, খুলে ফেললেন মোচড় দিয়ে, অনেক দিনের অব্যবহারে ক্যাঁচ ক'রে ঠিক কান্নার মতো শব্দ হ'লো একটি। বাঁ-হাতে লণ্ঠন ধ'রে ডান-হাতে বার করতে লাগলেন মুঠো-মুঠো টাকা। জমিদারি থেকে তাঁর নিয়মিত হাত-খরচের টাকা, এক-পয়সাও-না-খরচ-করা দশ বছরের সঞ্চয়। গুটিয়ে-থাকা লম্বাটে থলিটি প্রায় ভ'রে উঠলো পাৎলা কাগজের নানা সংখ্যার নীলচে নোটে; মুদ্রাগুলো ছড়িয়ে রইলো ঘরময়, তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

এর পর অরুন্ধতীকে নিয়ে পালালো সোমনাথ। যুধিষ্ঠিরই ব্যবস্থা ক'রে দিলো সব। সিঁড়ির মুখে ছবি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মৃন্ময়ী; নামতে-নামতেও দুই সিঁড়ি উঠে এলো অরুন্ধতী, দু-হাতে জড়িয়ে ধরলো তাঁর কোমর, মুখ রাখলো বুকে। তিনি তার মাথায় নিচু হ'য়ে চুমু খেলেন. অরুন্ধতীর তৃতীয়বার মাতৃবিচ্ছেদ ঘটলো।

আন্নু গোলাঘরের পাশে আগেই দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় অমরনারায়ণের ঘর, বড়ো জানলা দিয়ে ঘরের গতিবিধি দেখা যায়— দূর থেকে কেউ আসছে কিনা। পাতা মাড়িয়ে কী চ'লে গেলো খরখর ক'রে, আতঙ্কিত হ'য়ে আন্নু নিজেকে লুকিয়ে ফেললো বেড়ার গায়ে, তারপর আস্তে-আস্তে ফুটে উঠলো তিনটি ছায়া মূর্তি।

ভাঙা দেয়াল ডিঙিয়ে বাইরে যাবার গোপন রাস্তাটিতে এসে আন্নু হাত দুটো জড়িয়ে ধরলো অরুন্ধতীর। ঠাণ্ডা, ভয়-পাওয়া হিম হাত। হাতের মুঠোয় মৃন্ময়ীর উপহার সেই লম্বা থলে, অরুন্ধতীকে বিয়ের যৌতুক দিয়েছেন তার হতভাগিনী মা, আন্নু সেটাকে তার কোমরে বেঁধে দিলো ভেতরে গুঁজে।

একটু পথ হাঁটতে হ'লো, একটু দূরে রেখে এসেছে যুধিষ্ঠির তার বন্ধু হারানের গোরুর গাড়ি। অরুন্ধতী হাঁপিয়ে গেলো ওইটুকু চলতে, বুড়ো যুধিষ্ঠির দু-হাতে সাপ্‌টে নিলো তাকে। সোমনাথ বললো, 'আর কতদূর?'

'এই তো বাবা এসে গেছি।'

এতক্ষণে শব্দ ক'রে কথা বললো তারা।

যুধিষ্ঠির গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে এলো খানিকটা, বললো, 'আপনাদের নিয়ে ও এই ইস্টিশনের পরের ইস্টিশনে পৌঁছে দেবে। কে জানে এতক্ষণে

কী তাণ্ডব হচ্ছে সেখানে, কত লোক কোথায় ছুটেছে। বুঝলে হে হারান, একেবারে উল্টো পথে হলুদ গাঁয়ের মধ্য দিয়ে নলকুণ্ডা ইস্টিশনে পৌঁছে দেবে। ভাড়া বেশি নিয়ো, কিন্তু চালিয়ে যেয়ো, তাহ'লে ভোর পাঁচটায় ট্রেন ধরা কিছুই শক্ত হবে না।'

অরুন্ধতী হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলো যুধিষ্ঠিরকে, যুধিষ্ঠির আশীর্বাদ করলো মাথায় হাত রেখে। সোমনাথ ব'সে রইলো অভিভূতের মতো।

গোরুর ল্যাজে মোচড় দিলো গাড়োয়ান, গাড়ি এগিয়ে গেলো জোরে, পেছনে প'ড়ে গেলো যুধিষ্ঠির, তার পেছনে জমিদার-বাড়ির উদ্ধত উন্নত মস্ত চূড়ো, আর তার পেছনে ?

মৃন্ময়ীকে মনে প'ড়ে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো অরুন্ধতীর। আন্নুকে ভেবে কান্না পেলো। অন্ধকার গাড়ির গহ্বরে এদিকে স'রে এসে অতি সন্তর্পণে কোণ ঘেঁষে ব'সে দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ লুকোলো সে। রুক্ষ খড়গুলির উপরে হাত দিয়ে একটু ঠিকঠাক ক'রে দিলো সোমনাথ, নিজের গায়ের দামি কোটটি খুলে গুটিয়ে দিলো বালিশের মতো, তারপর বললো, 'হিম পড়ছে, বাইরে ঠাণ্ডা লাগবে।'

তৃ তী য়

ত র ঙ্গ

১

পরের দিন বিকেলে চুঁচড়ো থেকে ফিরে কেতকী যখন স্বামীর একা বসবাসের পটভূমিকায় অরুন্ধতীকে দেখতে পেলো, মনটা তার ভারি হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে। দু-মাস আগে যাকে বিদায় দিতে ব্যথিত বোধ করেছিলো, আজ তার এই আচমকা প্রত্যাবর্তনে একটুও খুশি না হ'য়ে বরং বিরক্তই হ'লো। শুকনো গলায় বললো, 'তুমি!'

লজ্জিত কুণ্ঠিত অরুন্ধতী দরজা খুলে একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে একটু হাসলো। কেতকী সঙ্গে ক'রে তার মাকে, ভাইকে নিয়ে এসেছে নিজের সংসার দেখাতে। আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে এসেছে সারা রাস্তা। মিসেস মুখার্জি লক্ষ্য করলেন মেয়ের সেই আনন্দিত মুখে একটি গাঢ় ছায়া পড়লো।

ঘরে ঢুকে কেতকী আবার বললো, 'আজই এসেছো?'

অরুন্ধতী মাথা নাড়লো।

'কখন?'

'সকালবেলা।'

'হঠাৎ?' প্রশ্নটা ক'রে সে কিন্তু জবাবের অপেক্ষা করলো না, পর্দা সরিয়ে ঢুকে গেলো তার শোবার ঘরে।

পাশ কাটিয়ে এক-পলক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে কেতকীর মা-ও ঢুকলেন মেয়ের সঙ্গে-সঙ্গে— ডিকুও।

অরুন্ধতী লাল হ'য়ে অবলম্বনহীনের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যিখানে। একটু পরে আবার এদিকের বারান্দায় এসে কেটলি চাপিয়ে দিলো উনুনে।

আসন্ন কার্তিকের ছোটো বেলা। দেখতে-দেখতে গড়িয়ে গেছে কখন। অন্ধকার জ'মে উঠেছে একতলার ফ্ল্যাটে, আলোগুলোও জ্বালিয়ে দিলো সে।

সকালবেলা সোমনাথ না খেয়ে গেছে, কর্মক্লান্ত মানুষের অভ্যর্থনার আয়োজনের তাগিদটাই নিজের বেদনার চেয়ে বেশি জরুরি ব'লে মনে হ'লো তার। তারপর তো আছেই সারারাত অন্ধকারে চেয়ে থাকা।

সকালবেলা তারা পৌঁচেছে এসে প্রায় সাড়ে-আটটায়। তারপর থেকে একদণ্ড দাঁড়ায় নি সোমনাথ। আপিশের তাড়া ছিলো, তারই মধ্যে ঝি-কে ডেকে এনেছে গিয়ে বস্তি থেকে, দাড়ি কামিয়েছে, স্নান করেছে, খাবার কিনে রেখে গেছে তার জন্য। অরুন্ধতী ক্লান্ত ছিলো, তা ছাড়া এ-ভাবে আসার গ্লানি প্রায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো তাকে।

তাই, সেই যে এসে ছোটো ঘরটিতে গিয়ে চুপচাপ নিজেকে লুকোলো আর বেরুলো সোমনাথ আপিশে গেলে। আর বেরিয়েই বাড়িঘরের চেহারা দেখে মনটা দ'মে গেলো সাত হাত। কেতকী তার মা-র কাছে গেছে, এ-খবরটা তালা খুলতে-খুলতেই সোমনাথ ঘোষণা করেছিলো, বিকেলেই আসবে তা-ও বলেছিলো, কিন্তু বৃন্দাবনও যে নেই তা তো কৈ বলে নি সে।

রান্নাঘরের চেহারা বহুদিনের অব্যবহারে ধূলিমলিন, হাঁড়িকড়া শিকেয় তোলা, আধ-ভাঙা উনোনটা প'ড়ে আছে ছাইয়ের গাদার পাশে, থালাবাটি, পেয়ালা পিরিচ, বাসন-কোসন সব বিশৃঙ্খল, সব ছত্রখান। শোবার ঘরে এসে বোঝা গেলো, স্টোভ জ্বালিয়ে অস্থায়ীভাবে সেখানেই

সংসার করছিলো কেতকী এবং এই ঠিকে ঝি-টিই ঠেকা দিচ্ছিলো সংসারের খুঁটিতে। তার মানে মানুষটা না খেয়ে গেলো? মুহূর্তে তার মেয়ে-মন ভ'রে উঠলো ব্যথায়। নিজের খাবার তুলে রেখে অমনোযোগিতাকে সে ধিক্কার দিলো।

তারপর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাত দিলো ঘরের কাজে। উড়লো ধুলোবালি, সোনা হ'লো মলিন কাঁসা, খাটের তলাকার অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে বেরিয়ে এলো কালকের ভেজানো দুর্গন্ধ চাল-ডাল। বাথরুম থেকে তিনদিনের জমানো শাড়ি ব্লাউজ ধুতি গেঞ্জি কাচা হ'লো সব। প্রসাধন-ক'রে-যাওয়া পাউডারের প্রলেপ-বুলোনো এলোমেলো ড্রেসিং-টেবিল, সৌমনাথের বই, কুঁচকোনো বিছানা, মুহূর্তে সব ফিটফাট। এবার কয়লা ভাঙিয়ে ভাঙা উনুনটাকেই জোড়াতাড়া দিয়ে ধরিয়ে নিলো। মৃন্ময়ীর দেয়া টাকা থেকে আনিয়ে নিলো প্রয়োজনীয় টুকিটাকি।

সব প্রস্তুত। যাবার বেলা যে মানুষ না খেয়ে গেছে, ফিরে এসে আবার যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। অব্যবস্থার জঙ্গলে আবার যেন পথ হাৎড়াতে না হয়। সে ভারি লজ্জা। তাই কেতকীর এই অপ্রসন্ন অভ্যর্থনার বেদনা ঢোঁক গিলে পাঠিয়ে দিলো বুকের ভেতরে। দুটি অপরিচিত মানুষের কাছে কেতকীর এই ইচ্ছাকৃত অবহেলার ভঙ্গিকে মেনে নিলো ভাগ্যের দান ব'লে।

২

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'মেয়েটি কে রে?'

আয়নার ঝকঝকে কাচ থেকে নির্মল মেঝে পর্যন্ত এক-পলক দৃষ্টি বুলিয়ে কেতকী বললো, 'সোমনাথের আত্মীয়।'

'কী হয় ?'

'সম্পর্কের অত খুঁটিনাটি জেনে কী লাভ তোমার ?' পথে প'রে-আসা শাড়িটা ছেড়ে একখানা ধোপের পাটভাঙা শাড়ি প'রে নিলো সে, শু ছেড়ে স্যাণ্ডেল পায়ে দিলো, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে বললো, 'বোসো তোমরা, হাত-মুখ ধুয়ে চায়ের ব্যবস্থাটা দেখি।'

খুব সম্ভব এই মুহূর্তে মা-র দুরন্ত কৌতূহলী আর সন্দিগ্ধ স্বভাবের হাজারো প্রশ্নবাণ থেকে রেহাই পাবার জন্যই বেরিয়ে এসেছিলো, কিন্তু খাবার ঘরের সামনে এসে একটু থমকাতে হ'লো। শাদা চাদর পাতা খাবার টেবিলে বৈকালিক সমস্ত আহার্য প্রস্তুত ক'রে ভেতরের দিকের ছোট্ট উঠোনে নামবার নিচু সিঁড়িতে আধো অন্ধকারে গালে হাত দিয়ে নিজেকে নিয়ে যেন ভেঙে প'ড়ে ব'সে আছে অরুন্ধতী। তরতর ক'রে হেঁটে চ'লে গেলো সে বাথরুমে।

রাত্রে স্ত্রীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কারণটা আঁচ করতে পারলো সোমনাথ। বললো, 'শোনো—'

পাশ ফিরে শুয়েই কেতকী বললো, 'কী ?'

'এদিকে ফেরো না !'

'সেটা কি খুব জরুরি ?'

'মুখ না-দেখলে কি কথা বলা যায় ?'

'তাহ'লে দয়া ক'রে বোলো না।'

'কী হয়েছে ? রাগ করেছো নাকি ?'

'রাগ করবো কেন ? রাত হয়েছে, ঘুম পায় না ?'

'এতদিন পরে মা-র সঙ্গে দেখা হ'লো, তবু এত মেজাজ খারাপ ?'

'আমার মেজাজ তো তুমি আজকাল সবটাতেই খারাপ ছাখো।'

'তবে শুনছো না কেন আমার কথা ?'

'ক্লান্ত লাগাটাও কী তোমার কাছে অপরাধ ?'

'হ্যাঁ, অপরাধ। শোনো এদিকে—' একটু জোর করলো সোমনাথ।

নিজেকে ছাড়িয়ে কেতকী বললো, 'হুকুম ?'

'করলামই বা।'

'কেন ? পতি-পরম-গুরু নাকি ?'

'তা নিতান্ত মন্দ কী প্রথাটা ?'

'অতএব তুমি যা করবে, যা বলবে তা-ই মেনে নিতে হবে নির্বিচারে, না ?'

'নিলেই বা।'

'আপাতত যখন খাওয়া-পরার সংস্থান তুমিই করছো, বলতেই পারো সে-কথা।' গনগনে কেতকী মুখ ফেরালো এদিকে, 'বেশ, বলো, কী তোমার কথা ?'

ম্লান হ'য়ে সোমনাথ বললো, 'মাঝে-মাঝে তুমি এত নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠো কেন ?'

'তোমার জরুরি কথাটা কি এই ?'

'না।'

'তবে ?'

'কাল আমি হরিণডাঙা গিয়েছিলাম।'

'কী ?' বিদ্যুতের মতো এবার উঠে বসলো কেতকী, 'তাহ'লে তুমি গিয়েই নিয়ে এসেছো ওকে ?'

'গিয়ে দেখলাম—'

'শুনতে চাই না। কেন গিয়েছিলে ?'

'তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ বা ইচ্ছে বা স্থিরতা কিছুই ছিলো না, ট্রেন ফেল ক'রে ব'সে-ব'সে টাইমটেব্‌ল ওল্টাতে-ওল্টাতে দেখলাম

হরিণডাঙা, চুঁচড়ো থেকে মাত্রই কয়েকটা স্টেশন। ভাবলাম, একটা খোঁজ নিয়ে যাই। আর সেটা আমার একটা কর্তব্য।'

'সেই কর্তব্যের দায়ে টিঁকতে না পেরে বুঝি স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগে একেবারে নিয়ে এলে বুকে ক'রে?'

'ছি।'

'ছি, তোমার আবার ছি।' একেবারে ফেটে গেলো কেতকী, 'এ-সমস্ত প্রবঞ্চনা করো কেন? তার চেয়ে বিয়ে করলেই পারো? হিন্দু ধর্মের জয়জয়কার হবে।'

'তুমি শান্ত হ'য়ে সবটা শোনো, তার পরে—'

'কোনো কথা আমি শুনতে চাই না তোমার।'

সোমনাথ স্ত্রীর মাথায় হাত রাখলো, 'ছেলেমানুষি করছো কেন? আমাদের এখান থেকেই উনি গিয়েছিলেন, খবর না-পেয়ে অনেক আগেই আমাদের খোঁজ নেওয়া উচিত ছিলো। আর তুমি তো জানো যে আমার মা-র কাছেই ছিলো মেয়েটি, তাঁর মৃত্যুর পরে আমি নিশ্চয়ই সেই দায়িত্ব পালন করবো, তা নইলে ম'রেও তাঁর আত্মার শান্তি হবে না।'

চুল ঝেঁকে সোজা তাকালো কেতকী, 'লেখাপড়া শিখে ইডিয়টের মতো কথা বলো কেন? মা-র মৃত আত্মার দোহাই দিয়ো না, খুব ভালো ক'রে জানো তাঁর কোনো আত্মা নেই। যে গেছে সে গেছে।'

চকিত হ'লো সোমনাথ, কিন্তু শান্ত গলায় বললো, 'কেকা, এ-নিয়ে আমি বুদ্ধি দিয়ে লড়াই করতে চাইনে। বিশ্বাসটাই বড়ো।'

'হ্যাঁ, তোমাদের হিন্দুদের তো সাপে কাটলে মনসার বিশ্বাস, বসন্ত হ'লে শীতলার বিশ্বাস—' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো কেতকী।

সোমনাথ উঠে বসলো বালিশের হেলান থেকে, 'তোমার যা-খুশি বলতে পারো। কিন্তু আমি এ-কথা ভাবতে ভালোবাসি তিনি ম'রে

গিয়েও আছেন আমার জীবনে, ছড়িয়ে আছেন, জড়িয়ে আছেন, অলক্ষ্যে. তিনি দেখছেন আমার সব-কিছু।'

'পারভার্ট!' অসহ্য বিরক্তিতে কেতকী খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো, 'বিয়ে করবার দরকার ছিলো কী? মাকে নিয়েই তো চমৎকার সংসার করতে পারতে।'

মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে সোমনাথ বললো, 'হয়তো তা-ই উচিত ছিলো। কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজের সুখটাকেই বড়ো ক'রে ছাখে।'

'ব্যঙ্গোক্তিটা কার উপরে?'

'ভেবে দেখবার চেষ্টা কোরো, একজন ষোলো বছরের নিঃস্ব, রিক্ত, স্বজনহীন, সম্বলহীন মেয়ের কথা, যখন সে তার আটমাসের বাচ্চা বুকে নিয়ে পরের দরজায় আশ্রয়ের জন্য দাঁড়ায় তার বেদনা কতখানি। চোখ মেলতে শিখে আমি সেই যন্ত্রণা দেখতে-দেখতেই বড়ো হয়েছি।'

'চুপ করো, তোমাদের এই বাংলাদেশের শতকরা পঁচানব্বুইজন বুড়ো খোকাদেরও আমি ঢের দেখেছি।' শাড়ির আঁচল ঠিকঠাক ক'রে কেতকী চেয়ারে বসলো।

গম্ভীর হ'লো সোমনাথ। বললো, 'সেই খোকা তুমি অনেক দেখতে পারো, আমাকে ছাখো নি। কেননা যে-সোমনাথ একদিন তার গ্রামের বাড়িতে ঘরের দাওয়ায় ব'সে দোলাই গায়ে আকাশে তাকিয়ে মুড়ি চিবোতো, তাকে দেখলে তুমি ফিরেও তাকাতে না।'

'সেখানেই থাকলে না কেন?'

'সেটাই স্বাভাবিক ছিলো। গোমস্তা কৃষ্ণদয়ালের নাতি হ'য়ে বারো না পুরতেই জমিদারি শেরেস্তায় পাঁচ টাকা রোজগারের জন্য হাঁটাহাঁটি করারই কথা ছিলো এই সোমনাথের। বড়ো জোর ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডি পেরিয়ে মাইনর ইশকুলের মাস্টার হ'য়ে হেঁটো ধুতি আর ফতুয়া

প'রেই যথেষ্ট ভেবে জীবনযাপন। কিন্তু নিজের মান-সম্ভ্রম, অশনবসন, সুখদুঃখ সব তুচ্ছ ক'রে যে-মানুষ আজ আমাকে এখানে এনে পৌঁছে দিয়েছেন, এমনকি এম. এ-পড়ুয়া অতি আধুনিকা কেতকী মুখার্জির স্বামীত্বে পর্যন্ত পরিণত করতে পেরেছেন, তিনি আমার মা।'

'জানি, জানি।'

'না, জানো না।'

'সন্তানের জন্য সব মায়েরাই করে, খুব কিছু বেশি কথা নয়।'

'না, সব মাকেই সংসারে এসে এমন ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে ভাসতে হয় না সন্তান নিয়ে। সকল মায়ের মনই এমন পরিচ্ছন্ন হয় না। নিজেকে নিঃশেষে দিতে পারার মতো মন খুব সুলভ নয়, কেতকী। তুমি মা হ'লে তা পারবে না।'

'নিশ্চয়ই পারবো। নিজের ছেলের জন্য সব পারবো।'

এবার আঁতে ঘা দিলো সোমনাথ, 'নিজের সংসারের জন্য কতটুকু পারো? কতটুকু সুখ তুমি ত্যাগ করো তোমার স্বামীর জন্য? দিনের পর দিন কেনা খাবার খেয়ে আপিশে যেতে হয় তোমার কষ্ট হবে ব'লে, ক'দিন একটা কাজের লোক না-থাকলেই তোমার দুনিয়া অন্ধকার। ওই ছেলের জন্যও দাস লাগবে, দাসী লাগবে, আয়োজনের এতটুকু ত্রুটি হ'লে কাউকে আস্ত রাখবে না তুমি।'

'তুমি— তুমি আমাকে এ-সব বলছো আজ, এত অসুস্থ আমি, এত আমার শরীর খারাপ—'

কিসে থেকে কী। উত্তেজনায় ঘরময় হাঁটতে লাগলো সোমনাথ, 'আজ আমি যদি ম'রে যাই, যদি একটা শিশু জন্মায় তোমার, আমি জানি আমার অশিক্ষিত মূর্খ মা যে-ধৈর্য, যে-পরিশ্রম দিয়ে আমাকে গ'ড়ে তুলেছেন, তা তুমি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা,

সুবিধের যুগে জন্ম-নেয়া কেতকী মুখার্জি তা পারবে না। তুমি পারবে না সারাদিন ঘানির মতো ঘুরে ক্লান্তিতে ভেঙেচুরে গিয়েও রাত জেগে ছেলে নিয়ে মিষ্টি গলায় কথা বলতে, সংসারের সকল নিষ্পেষণ হজম ক'রে পরিবেশের সব বেড়া ডিঙিয়ে শুধু মনের জোরে তাকে তুলে ধরতে।'

'বেইমান। মিথ্যাবাদী।' রুদ্ধস্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কেতকী, 'আজ তুমি আমাকে এ-সব কথা বলছো? আমি কিছুই করি নি, কিছুই ছাড়ি নি তোমার জন্যে? সমস্ত সমাজ, সংসার, ধর্ম, মা-ভাই সব-কিছু ছেড়ে শুধু তোমার জন্যই চ'লে আসি নি আমি এখানে? মা কি একা তোমারই? মা কি আমারও ছিলো না?'

অস্থির গলায় সোমনাথ বললো, 'ছিলো, ছিলো, কিন্তু শুধু মা-ই ছিলো। বন্ধু নয়, স্বজন নয়, আশ্রিত নয়, সেই এক মুঠো মানুষটার মতো দীন, দরিদ্র, ধুলোয়-মিশে-যাওয়া অস্তিত্ব নয়। শোনো কেকা, আমার মাকে আমি শুধু মা ব'লেই ভালোবাসতাম না, মা হিসেবেই তাঁর প্রতি আমার এই আবেগ নয়, সে একটা— মানুষ, যে-মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করতাম মানুষ হিসেবেই।'

'ও-রকম সকলেই সকলের মাকে ভাবে, সোমনাথ। মা সকলের কাছেই সমান।'

'না, তোমার মাকে তুমি ভাবো না। মা ব'লে ভালোবাসো, মানুষ হিসেবে কতখানি শ্রদ্ধা করো তা আমি জানি। আর তা ছাড়া তোমার পক্ষে তোমার মাকে ছেড়ে আসা, আর আমার পক্ষে আমার মাকে ছেড়ে আসায় কোনো তুলনা হয় না।'

'ছেলে বিয়ে করলে যে-মা হিংসেয় বুক ফেটে মারা যায়, তার মৃত্যুই ভালো।'

চুপ ক'রে স্ত্রীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সোমনাথ,

তারপর গম্ভীর গলায় বললো, 'আর কখনো বোলো না।' আর আশ্চর্য, সেই দৃষ্টিতে, সেই গলার আওয়াজে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো কেতকীর।

এই সেদিনের মুখচোরা সোমনাথ, চোখ তুলতে যার সাতবার কান গরম হ'য়ে উঠেছে, এখনো একটা সিগরেটে টান দিতে যে তিনবার কাশে তার এত তেজ? আর সেই তেজে দগ্ধ হচ্ছে আদপে, কায়দায়, চলায় ফেরায়, খাটো চুলে, চোখের কাজলে, নখের রঙে সারা বিশ্ববিদ্যালয়-পাড়ার মধ্যমণি কেতকী মুখার্জি? ছী, ছি ছি। স্বামীই হোক, যা-ই হোক, সমবয়সী তো? সহপাঠী তো? তারা বন্ধু তো দু-জনে? তবু আজ সোমনাথকে ভয় পেলো কেতকী।

একতলার ঘর, উল্টোদিকের রাস্তার আলো এসে পড়েছে জানলার পর্দায়। দু-জনের পছন্দ ক'রে কেনা হেলিওট্রোপ রংয়ের পর্দা, সেই পর্দার ছায়া ঘর আলো করেছে। কেতকী সোমনাথের সমস্ত অবয়বে একটা অনমনীয় ইস্পাত-ভঙ্গি দেখতে পেলো।

গোঁয়ার। পূর্ব বাংলার জাত গোঁয়ার, ব্রুট।

সহসা হাতের ভাঁজে মাথা রেখে কেতকী ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সোমনাথ আস্তে-আস্তে ঠিক তার পেছনে এসে দাঁড়ালো, উদ্ধত কেতকীকে এইবার ভারি বিনম্র লাগলো তার, ভারি ভালো লাগলো এই কান্নার ভঙ্গিতে দেখতে। তাকিয়ে রইলো পলকহীন ভাবে, কাঁদতে দিলো। অনেক, অনেকক্ষণ। বৃষ্টি পড়া দেখলে যেমন একটা অদ্ভুত ভালো লাগায় মন ভ'রে যায় তার, ঠিক তেমি ভালো লাগলো এই কান্না, নেশার মতো লাগলো এই দুঃখের বর্ষণ। জীবনের প্রথম মেয়ে তার মা, মা-ও তার জন্য ঠিক এই ভাবেই কেঁদেছিলেন, একটু অন্য চেহারায়, অন্য কারণে। তার জন্য সব মেয়েকেই কাঁদতে হয়। যে-মেয়েই তার সান্নিধ্যে

আসে তাকেই কাঁদায় সে। এই কান্না নিয়েই সে জন্মেছে। এই তার বিধিলিপি। তবে কাঁদুক, এই মেয়েও কাঁদুক, তার জীবনের, যৌবনের সখা, দোসর, প্রিয়তমা। তার ভাবী সন্তানের মা।

আরো অনেক পরে কেতকীকে চেয়ার থেকে তুলে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলো, শান্ত করলো মাথায় হাত বুলিয়ে, ভালোবাসার বন্যায় ধুইয়ে দিলো সকল গ্লানি।

৩

মিসেস মুখার্জি মাত্রই দু-দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, চ'লে গেলেন তিনি। যাবার আগে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'সাবধানে থাকিস।'

'থাকবো।'

'বাড়িতে আগাছা বাড়তে দিস না। তাতে সর্বনাশ হয়।'

'আগাছা ?'

'সংসারে যেমন ঋণের শেষ রাখতে নেই, তেমনি শত্রুর শেষও রাখতে নেই, ও-সব যত তাড়াতাড়ি উপড়ে ফেলা যায় ততই ভালো।'

'বলছো কী তুমি, আমার আবার শত্রু কে ?'

'জীবনের অনেকগুলো বছর পার হ'য়ে এসেছি, আমার কথা তুই শোন, ঐ মেয়েটাকে বাড়ি থেকে তাড়া।'

'আহা ! কী বলছো !'

যে-মেয়েকে নিয়ে স্বামীকে তার গঞ্জনার শেষ নেই, তার জন্যই বেদনায় আর্দ্র হ'য়ে উঠলো গলা। 'আমি এতক্ষণ বুঝতেই পারি নি তোমার কথা।'

'আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, এখানে এসেছে কী করতে? মতলবটা কী?'

'ছি, ও-কথা বোলো না, ও আমার ছোটো বোনের মতো, আমাকে কত ভালোবাসে।'

কেতকী রীতিমতো অসন্তুষ্ট হ'লো মা-র উপরে, সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকেও ধমকালো। অন্যায় তারই হয়েছে, তার ব্যবহারটাই ভালো ছিলো না এই দু-দিন অরুন্ধতীর উপর। সে-ই তাকে মা-র কাছে এই রকম একটা অবজ্ঞার পাত্রী বানিয়েছে, অসম্মান করেছে, নিজের বিরক্তিকে প্রকাশ ক'রে তারই ছায়া ফেলেছে তার মা-র মনে। নয়তো অমন মেয়েকে কেউ এমন কথা বলতে পারে? নয়তো আমার মা আমার কাছে ও-রকম বলবার সাহস পান?

অরুন্ধতীর জন্য সত্যিই মন কেমন করলো তার, বললো, 'তা ছাড়া ওকে তুমি আমাদের আশ্রিত ভাবছো কেন? ও তো এখানে থাকতে আসে নি, থাকবেও না। শিগগিরই কোনো বোর্ডিং-টোর্ডিংয়ে চ'লে যাবে। নিতান্ত বিপদে প'ড়েই এসেছে।'

'বোর্ডিংয়ে!' চোখ বড়ো করলেন মিসেস মুখার্জি, 'ও-সব বোর্ডিং-ফোর্ডিং বাপু বাদ দাও, এখানে থাকলে তবু চোখে-চোখে। আড়ালে গেলে তো—, আর তা ছাড়া ঝি নেই, চাকর নেই, এখন তো ছাড়তেই পারবিনে।'

এবার ফোঁশ ক'রে উঠলো কেতকী, 'বড্ড নোংরা কথা তুমি ভাবতে পারো, মা। নিজের মনে ভাবো তাতে কারো হাত নেই, কিন্তু ও-সব বলো কেন? শুনতে বিশ্রী লাগে। চোখে-চোখে বা চোখের আড়ালের কথা উঠছে কিসে? কী ভাবছো তুমি? আর তা ছাড়া ও কি ঝি-চাকরের মতো? ছি।'

'ঐ দেশের মাল দেশেই প্যাক ক'রে পাঠিয়ে দাও। কলকাতা আসবার ওর দরকারটা কী?' ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি ট্যাক্সিতে উঠলেন।

রাগে দুঃখে চিড়বিড় ক'রে উঠলো কেতকীর শরীর, মনে হ'লো জীবনে আর সে মা-র মুখ দেখবে না।

সোমনাথের সঙ্গে ট্যাক্সিতে স্টেশনে যেতে-যেতে মিসেস মুখার্জি গলায় মিষ্টি দিলেন, 'তাহ'লে ওকে সে-সময়ে নার্সিং হোমেই রাখবে?'

সোমনাথ বললো, 'তা-ই তো ভাবছি।'

'খরচা ভয়ানক।'

'হ্যাঁ, একটু বেশি, তা তা-ই সবচেয়ে ভালো।'

'ডক্টর নন্দী তো আমাদের সমাজেরই মানুষ, বললে তিনি নিশ্চয়ই কিছু কম-সম ক'রে—'

সোমনাথ মৃদু হাসলো, 'কী আর! ও-সব অনুরোধ না করাই ভালো। বরং আপনি যদি সে-সময়ে আসতে পারেন—'

'তা তো নিশ্চয়ই, আমি তো আসবোই, না এলে চলবেই বা কেমন ক'রে? প্রসবটুকুই তো সব নয়, বলতে গেলে বাচ্চা হবার পরেই আসল কাজ।'

'একা-একা থাকে, তেমন যত্নও হয় না তো।'

'তাই তো বলছিলাম বাবা, এ দুটো মাস আমার কাছে যদি রাখতে তবে তোমার খরচও কিছু কম হ'তো, ওরও সব ঠিকমতো চলতো। আর এই তোমার আত্মীয় মেয়েটি তো রয়েইছে বাড়িতে, দেখছি কাজেরও খুব, সে-ই এ দু-মাস তোমাকে দেখাশুনো করতে পারতো।' মিসেস মুখার্জি জামাইয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন।

সরল চোখে তাকিয়ে সোমনাথ বললো, 'না, না, উনি তো থাকবেন

না এখানে, অন্য কোনো কাজ পেলেই চ'লে যাবেন, আর কাজ পেতে দেরি হ'লেও অন্য কোথাও ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।'

মিসেস মুখার্জি একটু চুপ ক'রে রইলেন, 'এক গ্রামের ছেলেমেয়ে, কেউ নেই, তোমাদের তো করাই উচিত।'

সোমনাথ একটু কিন্তু-কিন্তু হ'য়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

'তা বেশ করেছো, আশ্রয় দিয়েছো, বড়ো ভাইয়ের মতো তুমি—'

এবার এ-কথার কোনো জবাব দিলো না সোমনাথ, তাকিয়ে রইলো রাস্তার দিকে।

কেতকীর মা তারপর আবার মেয়ের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন, 'টাকা-কড়ির জোগাড় আছে তো?'

সোমনাথ মুখ ফিরিয়ে তাকালো, কিন্তু একটু দ্বিধা করলো জবাব দিতে। সত্যি বলতে জোগাড় তার নেই, থাকবে কোথা থেকে? যা মাইনে পায়, মাসের শেষে তাইতেই টান ধরে। সংসার সম্বন্ধে সে প্রায় কিছুই বোঝে না, আর কেতকীও গুছিয়ে খরচ করা বিষয়ে নিতান্ত অপটু। তার উপর মাস দেড়েক চাকর না থাকায় বাইরে খেতে-খেতে প্রায় ফতুর হবার দশা। অবিশ্যি এই দেড়মাসের মধ্যে যে একটা লোকও তারা জোগাড় করতে পারে নি কাজের জন্য, ঠিক তা নয়। কিন্তু দু-বার দু-জন এসে একজন কিছু জামাকাপড় আর দশটা টাকা নিয়ে স'রে পড়লো, আর-একজন অখাদ্য রান্না করার অপরাধে বরখাস্ত হ'লো। এদিকে প্রত্যেক মাসে একদিন ডাক্তার আসে কেতকীকে দেখতে, দামি-দামি ওষুধ খাওয়াতে হয়, দুধ রাখতে হয় বেশি, ফল আনতে হয়। গেলো মাস থেকে ব্যাঙ্কে ওভারটাইম খেটেও সুবিধে করতে পারে না কিছু। আয়ের তুলনায় ব্যয়ের অঙ্কই বড়ো। একমাত্র উপায় ধার। ধারই করবে সে, এক বন্ধুকে বলেছেও সে-কথা, সে-আশাতেই ঠিকঠাক করেছে

সব। কিন্তু এত সব কথা শাশুড়িকে বলার কোনো মানে হয় না। তাই বললো, 'ও একরকম হ'য়ে যাবে।'

মিসেস মুখার্জি কাঁদুনি গাইলেন, 'উচিত তো আমারই করা, এই প্রথম বার যখন। কিন্তু আমার যা অবস্থা।'

'না, না, আপনি আবার কী করবেন?' সোমনাথ সনির্বন্ধ হ'লো, 'আমি তো বলি ডিকের ভারটা তার দিদিরই নেয়া কর্তব্য।'

'তুমি যে বললে বাবা, তাইতেই আমার মন ঠাণ্ডা হ'লো।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। মুখের ভাব এমন করুণ হ'লো যে, কে সন্দেহ করবে বছরের পর বছর ধনী বিপত্নীক দেওরকে তিনি কতখানি রিক্ত ক'রে নিজের মুঠো সোনায় মুড়ে তবে আলাদা হয়েছেন ছেলে নিয়ে।

৪

মা চ'লে গেলে খালি বাড়িতে, নিজের ঘরে একটুক্ষণ ব'সে রইলো কেতকী, তারপর অরুন্ধতীর ঘরে এলো। 'কী করছো?'

আলো জ্বালে নি, জানলায় দাঁড়িয়েছিলো চুপচাপ, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো কাছে। কেতকী বললো, 'এবার যেন তুমি কেমন হ'য়ে গেছো, আমার বাবরিগুলো বেঁধে দিচ্ছো না। জানো, তোমার কথামতো আমি আজকাল চুল কাটি না। একটু বেড়েছে, না?' আধখানা পিঠ ঘুরিয়ে সে তার চুল দেখালো। হাসলো মিষ্টি ক'রে।

অরুন্ধতী এবার আলো জ্বাললো, 'তাহ'লে ফিতে কাঁটা নিয়ে আসি?'

'ও-ঘরে চলো না।'

'চলুন।'

এ-ঘরে এসে অরুন্ধতীই ফিতে-টিতে খুঁজে বার করলো, বসলো চুল

বেঁধে দিতে। কেতকী বললো, ‘এবার হরিণডাঙার গল্প বলো। তোমার সেই প্রিয়তম জমিদারটির সঙ্গে একবার আমার দেখা হ’লে বেশ হ’তো, তুমিও যেমন বোকা।’

‘ওখানে আর সবাই খুব ভালো।’

মৃন্ময়ীকে মনে করলো অরুন্ধতী, মনে পড়লো আন্নুকে, যুধিষ্ঠিরকে, একটা চিঠি লেখার কথাও ভাবলো মনে-মনে।

কেতকী বললো, ‘মাঝখান থেকে তোমার জিনিসপত্রগুলো প’ড়ে রইলো সেখানে। যাক, ঐগুলো দেখেই যদি তোমার অমরনারায়ণের বিরহ-বেদনা কিছুটা উপশম হয়। কী ছিলো বলো তো ?’

ফিতে দিয়ে ছোটো চুলে গোড় কষলো অরুন্ধতী, ‘কী-ই-বা। সামান্য কয়েকখানা কাপড়, দু-চারটে চিঠি, আর বিছানাটা।’

‘চলো, এখন বেরিয়ে তোমার জন্যে সব কিনে আনি। কী-কী দরকার বলো তো ?’

এই মুহূর্তে অরুন্ধতীর জন্য কিছু করতে কেতকীর মনটা যেন উন্মুখ হ’য়ে উঠলো।

অরুন্ধতী বললো, ‘আপনার শরীর খারাপ।’

‘শরীর খারাপ তো ভারি! আসলে এই হাতির মতো মূত নিয়ে বেরুতে আমার ভীষণ লজ্জা করে। যাই বলো, মেয়েদের একেবারে মেরে রেখেছেন ঈশ্বর।’

দরজার কড়া নাড়লো কে টুকটুক ক’রে। কেতকী ভুরু কুঁচকোলো, ‘সোমনাথ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলো ?— উহুঁ, নিশ্চয়ই অন্য কেউ। দ্যাখো না ভাই।’

আধ-বাঁধা বেণীতে ফিতের ফাঁস লাগিয়ে উঠে এসে দরজা খুলে দিলো অরুন্ধতী। অপরিচিত মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাভরে স’রে এলো এক পা।

অরুন্ধতীকে দেখে সুবিনয়ও থমকালো একটু, সে-ও তাকিয়ে অবাক হ'লো, ভালোও লাগলো, মৃদু হেসে বললো, 'সোমনাথ বাড়ি নেই ?'

'না।'

'কেতকী ? কেতকী আছে ?' অরুন্ধতীকে প্রায় পাশ কাটিয়েই ঘরে ঢুকলো সে। 'একটু দয়া ক'রে ডেকে দেবেন ?'

'আপনি বসুন।'

কিন্তু অরুন্ধতী ভেতরে আসবার আগেই কেতকী বেরিয়ে এলো। সুবিনয়ের গলা শুনতে পেয়েছে সে। আর এসেই অভিযোগে ফেটে পড়লো প্রায়, 'বেশ চমৎকার লোক তুমি, খুব কথার ঠিক যা হোক।'

'সত্যি রাগ কোরো না, ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম ক'দিন। আসতেই পারি নি।'

'ওঃ। কী আমার ব্যস্তবাগিশ। কত কাজের তা তো দেখাই যাচ্ছে।'

'বোকো না। তোমার ভৃত্য আমি যদি কাল সূর্যাস্তের মধ্যে এনে না দিই তখন যা খুশি তাই বোলো।'

একটু এ-পাশ ও-পাশ তাকালো সুবিনয়, স্বভাবত উঁচু গলা একটু খাটো করলো, 'মেয়েটি কে ? আমি তো ভাবলাম, আবার অন্য ভাড়াটে এলো নাকি ?'

কৌতুক করার সুযোগটা ছাড়লো না কেতকী, 'মেয়েটিকে দেখে মাথা ঘুরে যায় নি তো ?'

'তা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে নিতান্ত মন্দ কী। কে ?'

'এত কৌতূহল কিসের ? যেই হোক না।'

'তোমার বোন নাকি ?'

'ধ'রে নাও না।'

'সোমনাথ কই ?'

'হাওড়া স্টেশনে।'

'হঠাৎ হাওড়া?'

'আমার মাকে তুলে দিতে গেছে।'

'তোমার মা? রাগ পড়েছে তাঁর?'

'তা পড়েছে, কিন্তু তোমার খবর বলো। কোথায় ডুব মারলে হঠাৎ? যাচ্ছো কবে?'

সুবিনয় হাসলো, 'আমার যে তিন কুলে কেউ নেই তা তো জানোই, কিন্তু হঠাৎ এক মাতুলানীর আবির্ভাব হয়েছে, অকস্মাৎ তিনি ভালোবাসছেন আমাকে।'

'ভালোই তো।'

'তা তো ভালোই। ভাগ্নে যোগ্য হয়েছে, চাকরি করতে যাচ্ছে, এখন কি দূরে-দূরে রাখা মানায়? তার উপরে যদি অবিবাহিত হয়।'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো কেতকী, 'তার চেয়ে বিয়ে ক'রে ফ্যালো, ল্যাঠা চুকুক।'

'দাও না ঠিক ক'রে, ঘটক বিদায় দেবো।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলো তোমার কেমন মেয়ে পছন্দ।'

'এই তোমার মতো।'

'ওঃ। ভারি যে ইয়ে হয়েছো। তার চেয়ে মন খুলে বলো না যে এই মেয়েটির মতো।'

'বেশ তো!' সুবিনয় হাসলো।

'সত্যি যদি পছন্দ হয় তবে বলো বাপু ঘটকালি করি, তার পরে কিন্তু আর কোনো ওজর মানবো না।'

'ওজর আমি করবোই না। কিন্তু আগে চা খাওয়াও এক কাপ। মেস্-এ থাকি, ভাবতে পারবে না কী বীভৎস ন্যাকড়া-ছাঁকা চা এনে দেয়।'

'ঠিক আছে, চেহারা তো দেখলে, এবার যোগ্যতার পরীক্ষাটাও হ'য়ে যাক। অরুন্ধতী! অরুন্ধতী!'

উঠোনের সিঁড়ি থেকে ডাক শুনতে পেয়ে এ-ঘরে এসে দাঁড়ালো অরুন্ধতী। তার দিকে তাকিয়ে কেতকী হাসলো, 'এসো, তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই, আমার বন্ধু সুবিনয় রায়, আর আমার বোন অরুন্ধতী।' অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললো, 'এক কাপ চা ক'রে দেবে? লক্ষ্মীটি।'

অরুন্ধতী মৃদু হাস্যে ঘাড় নেড়ে চ'লে যাচ্ছিলো, সুবিনয় তৎক্ষণাৎ বিনয়ের অবতার হ'লো, 'থাক, ও পরে হবে'খন, আপনি বসুন।'

কেতকী চোখে-চোখে তাকালো।

অরুন্ধতী বললো, 'চা-টা নিয়েই আসি।'

সুবিনয় বললো, 'সোমনাথ আসবে কখন? ও এলেই বরং একসঙ্গে হবে।'

কেতকীও সায় দিলো, 'তা-ই ভালো, চায়ের জন্য আমরা সবাই তৃষিত, সোমনাথ এলে বেশ জাঁকিয়ে ব'সেই হবে। তার চেয়ে চলো ঘুরে আসি একটু।'

'ঘুরে আসবে? কোথায়?'

'এর কয়েকটা জিনিস কেনা দরকার, এই তো যাবো আর আসবো।'

'খুব ভালো কথা।'

অরুন্ধতীর দিকে তাকালো কেতকী, 'তুমি কী বলো?'

'বাড়িতে, কে থাকবে?'

'কে আবার, তালা বন্ধ ক'রে যাবো।'

'যদি—' অরুন্ধতী থামলো, কেতকী বুঝে নিলো ওর কথা, মাথা নেড়ে বললো, 'সোমনাথ যতক্ষণে হাওড়া থেকে ফিরবে, আমরা ততক্ষণে তিনবার হাটবাজার ক'রে চ'লে আসতে পারবো। চলো।'

বেরুলো তারা তিন জনে। কেতকী প্রায় রোজই একবার হাঁটতে বেরোয় সোমনাথের সঙ্গে, কিন্তু অরুন্ধতীর কলকাতা এসে বেরুনো এই দ্বিতীয় দিন। প্রথমবার যখন এসেছিলো, তখন একদিন কেতকী ঘুরে বেড়িয়েছিলো তাকে নিয়ে, শহর দেখিয়েছিলো, আর আজ এই।

চোখ-ধাঁধানো আলোতে, মানুষে, হরেকরকম দোকানে, পসারে, আওয়াজে, চিৎকারে, সুন্দরে-অসুন্দরে এক বিচিত্র বিস্ময় এই কলকাতা শহর। চার পাশে তাকাতে-তাকাতে অরুন্ধতীর মন আর-সকলের মতোই হালকা হ'য়ে গেলো।

অবিশ্রান্ত বুকের উপর চেপে-থাকা উৎকণ্ঠার ভার, চিন্তার জগদ্দল পাথর স'রে গিয়ে কখন সত্যি-সত্যি ছেলেমানুষটি বেরিয়ে এলো তার চলায় ফেরায়, কথা বলায়, চোখে-মুখে। মৃন্ময়ীর দয়ায় তার হাতে আজ টাকার অভাব নেই। সেই টাকা সে উদ্দাম হাতে খরচ করলো। কিনতে বেরিয়েছিলো সব কেতকীই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ই কিনলো সব। নিজের যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় শুধু তাই কিনে বাকি সব কেতকীর।

কেতকী হাসলো, 'বা রে, এই বুঝি কথা ছিলো ?'

অরুন্ধতীও চোখ নামিয়ে হাসলো। আর সেই হাসি দেখে মোহিত হ'য়ে রইলো সুবিনয়।

সন্ধেটা যেন পাখির পালকের মতো হালকা হাওয়ায় ভেসে গেলো। আর এই মন নিয়ে সুবিনয়ের সঙ্গে আলাপ জমলো সহজে।

বাড়ি ফিরে চা করতে গেলো সে, চিঁড়ে ভাজলো মুড়মুড়ে ক'রে, কুচোনো আলুভাজা ছিটিয়ে আরো সুস্বাদু করলো তাকে, আর তারপর হঠাৎ মনটা উতলা হ'য়ে উঠলো এখনো সোমনাথ আসছে না কেন ?

সোমনাথও এসে পড়লো একটু পরে।

এর পরে, বলাই বাহুল্য, সুবিনয়ের আসা-যাওয়াটা বেশ চোখে পড়বার মতোই বেড়ে গেলো কেতকীর বাড়িতে। একজন কাজের লোক-ও জোগাড় ক'রে নিয়ে এলো একদিন।

তারপর সেই চাকর কেমন রান্না করে তার আবার আস্বাদ নিলো নেমন্তন্ন খেয়ে।

সে-ও খাওয়ালো তাদের চীনে রেস্তোরাঁয়। একদিন সিনেমাও দেখালো।

সোমনাথ বললো, 'চাকরি পেয়ে তোমার মেজাজ দেখছি প্রায় সিরাজদ্দৌলা হ'য়ে গেলো।'

কেতকী টিপ্পনি কাটলো, 'বিয়ে করছে যে।'

'তাই নাকি ?'

সুবিনয় হাসলো, 'কেতকী এখন সকলকেই ল্যাজ-কাটা শেয়াল বানাতে চাইছে।'

'ল্যাজ তো বাবা কেটেইছে, মিছিমিছি আর কেন ? আবেদনটা জানিয়ে ফ্যালো, কর্তা কিন্তু সোমনাথই।'

'হঠাৎ আমি কত্তা হ'য়ে উঠলাম—' দুই বন্ধুর রহস্যটা ঠিক ধরতে পারলো না সোমনাথ।

কেতকী হেসে উঠলো, 'যথাসময়ে সবই জানানো হবে। কী বলো ? তুমি ঠিক পশু'ই যাচ্ছো তাহ'লে ?'

'তাই তো ঠিক।'

'একটা বিদায়-অভিনন্দন দেবো নাকি ?'

'উচিত। কলকাতা থেকে একেবারে মেদিনীপুরের ঝোপঝাড়—, জগুবাবুর বাজার থেকে একগাছা মড়ার মালাও কিনে আনতে পারো।'

'আহা-হা, ষাট, ষাট!' কেতকী পিঠে হাত বুলোলো, 'ফুলশয্যার মালাই কেনা যাবে'খন, এত দুঃখ কিসের?'

সোমনাথ দৌড়লো আপিশের তাড়ায়, এ-সব রহস্যালাপে যোগ দেবার সময় কই তার। উপার্জনের চেষ্টাতেই ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে দিনগুলো। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর দায়িত্ব খড়্গের মতো ঝুলে আছে মাথার উপর। কেবল টাকার চিন্তা, টাকার ভাবনা। উপরন্তু গেলো মাসে দেশ থেকে চিঠি লিখেছেন কৃষ্ণদয়াল, তাঁর শরীর খারাপ, এত বড়ো উপার্জনক্ষম বড়োলোক জ্ঞাতি থাকতে তিনি কি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন? এক-এক সময়ে সোমনাথের ইচ্ছে করে তার মা-র গয়নাগুলো বেচে দিতে। হোক অরুন্ধতীর, আসলে তো তার মা-রই। তার বিপদেই যদি কাজে না লাগলো তবে আর কী লাভ? কিন্তু বিবেকে আটকায়। যেমন শেলাই-করা মুখ তেমনি প'ড়ে থাকে, অরুন্ধতীও খুলে ছাখে নি কী পদার্থ আছে, সোমনাথও ছাখে না। কেতকীও না। কিন্তু থলিটির ওজন তো আর চোখে দেখতে হয় না? সোমনাথ এও ভাবে, মা এত গয়না রাখলেন কী ক'রে?

কী-ই বা তাঁর ছিলো! সবই তো দেখেছে সোমনাথ! তার উপর ছেলের খরচা জোগাতেই তো সব গেছে ব'লে জানতো সে। কখন এত জমালেন? না কি নতুন ক'রে গড়িয়েছিলেন কোনো রকমে? কেন? কার জন্য?

কার জন্য, সে-কথাটির জবাব মনের মধ্যে তক্ষুনি পেলো সোমনাথ। আর সঙ্গে-সঙ্গে ভারি লাগলো বুকের ভেতরটা।

৫

দিন কয়েক পরে, খবরের কাগজ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে অরুন্ধতী নিজের জন্য বাসস্থান পেয়ে গেলো একটি।

এক ভদ্রমহিলা তাঁর নিজের বাড়িতেই বোর্ডিং করেছেন, সীট সংখ্যা ন'টি, সাতটি পূরণ হয়েছে, আর দুটি বাকি। কী ধরনের মেয়ে চান তারও সামান্য বিবৃতি আছে, যার সঙ্গে অরুন্ধতীর কোনো গরমিল নেই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও সেই মহিলারই। সবসুদ্ধু চল্লিশ টাকা খরচ। তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখে দিলো সে।

প্রথম থেকেই সে ঠিক এই রকম একটি আশ্রয়ের কথাই ভাবছিলো। ভাবছিলো এই শহরের সঙ্গে একটু পরিচয় হ'লেই, ছোটো একটি ফ্ল্যাট খুঁজে নিয়ে যদি মৃন্ময়ীকে আনা যায়, সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে। আন্নু আসবে সঙ্গে। চিকিৎসা হবে মৃন্ময়ীর। তিনি তো বলেছিলেন 'সময় থাকলে তোমাকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধতাম।' ঘর অরুন্ধতীই বাঁধবে তাঁকে নিয়ে। সময় নেই কে বলেছে? অফুরন্ত সময় অরুন্ধতী ঢেলে দেবে তাঁর পায়ে। কলকাতার সব ধন্বন্তরী ডাক্তাররা তবে আছেন কী করতে? আর তাঁরা যদ্দিন আছেন মৃন্ময়ীরও সময় আছে অনেক। আর সেই সময়কে সেবা দিয়ে, হৃদয়-নিংড়োনো ভালোবাসা দিয়ে অরুন্ধতী আরো, আরো দীর্ঘ ক'রে দেবে। তারপর সুখী হবে তারা, দুই দুঃখী মেয়ে, ব্যর্থ মেয়ে। সে আর মৃন্ময়ী। আবার তরঙ্গিণী আর অরুন্ধতীর সংসার। কিন্তু সেই আশা তার পূরণ হ'লো না।

কয়েক লাইন কালির আঁচড়েই আন্নু সেই স্বপ্ন তার মাকড়শার জালের মতো ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার ক'রে দিয়েছে। আন্নু লিখেছে, 'যেদিন আপনি গেলেন সেদিন রাত্তিরেই তেতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে কাকিমা আত্মহত্যা করেছেন। বাড়িতে আপনার পালানো নিয়ে

দারুণ হৈচৈ চলছিলো সে-সময়ে। আমি কাকিমাকে ঘরে না-পেয়ে খোঁজাখুঁজি করছিলাম, এমন সময় ভয়ানক আওয়াজ হ'লো একটা। পড়েছিলেন সদরের দিকে, সেখানে তখন আলো জ্বলছিলো, লোকজন ঘোরাফেরা করছিলো। তার পরে যা দেখলাম তা লিখতে পারবো না গুছিয়ে, আমার হাত কাঁপছে, চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসছে। আমার জন্য ভাববেন না, মরবার আগে কাকিমা আমার সব ব্যবস্থাই ক'রে দিয়ে গেছেন। খেতে না-পেয়ে মরবো না, কিন্তু আমার মরণের আর বাকি কী বলুন?' তারপর আরো খানিকটা চোখের-জলে-ধোয়া বিলাপ।

চিঠি প'ড়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিলো অরুন্ধতী। অনেক পরে উঠে মৃন্ময়ীর দেয়া থলিটির মুখ খুলে সে-সব ঝেড়ে ফেলেছিলো খাটের উপর। এর আগে যখন যা দরকার হাত ঢুকিয়ে নিয়েছে, কিন্তু কৃপণের মতো। মনে করেছিলো আগে তিনি আসুন, তারপর তো! কিন্তু আজ নীলচে কাগজগুলো হাতের মুঠোয় প্রতিশোধের মতো দুমড়োলো সে, মোচড়ালো, ঠেলে ফেলে দিলো নিচে, তারপর সজল চোখে আবার হাত বাড়িয়ে একটি-একটি ক'রে ছড়ানো-ছিটানো নোটের স্তূপ তুলে নিলো থলির মধ্যে। থলিটা বুকে জড়ালো, যেন কারো অস্তিত্বের স্পর্শ পেলো সেখানে, কারো অযাচিত স্নেহের স্বাক্ষর। এ-টাকা কি টাকা? এ-টাকা যে মৃন্ময়ী নিজে। বুক ভেসে গেলো চোখের জলে।

গ্রামের কথা মনে প'ড়ে গেলো, মনে পড়লো বাড়ির কথা। দাদামণি আর তরঙ্গিণী। আমবাগান, জামবাগান, লতার মতো তন্বী খাল, বাঁধানো-ঘাট পুকুর। আরো মনে পড়লো, কোনো চীনে মিস্তিরির তৈরি কলসি-পায়ার যুগল খাট, কাপড় রাখার আয়না-আলমারি, বনাত-মোড়া টেবিল—শুধু কি তাই, সোমনাথের আংটি, বোতাম, মোষের শিংয়ের বাঁকা-মুখ ছাতা, মালাক্কা বেতের ছড়ি, কী না? সব প্রস্তুত, সব তৈরি। সবই

দামি। সবই অবস্থার অতিরিক্ত। কিন্তু কী হ'লো তারপর? কেবল ফুরিয়ে গেলো টাকা, বিকিয়ে গেলো মনপ্রাণ।

তরঙ্গিণী একদিন বললেন, 'কাকার কাণ্ড ছাখো— আমার কুঁড়ে ঘরে নাকি এ-সব মানায়?' দাদামণি তামাক টানতে-টানতে হাসলেন— 'রাজপুত্রই যদি কুঁড়ে ঘরে জন্মাতে পারে বৌমা, তবে তার যোগ্য অশনবসনই বা হবে না কেন?'

যখন মারা গেলেন, শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে, থরে-থরে সব গুছিয়ে তালা বন্ধ করলেন তরঙ্গিণী, কেবল ছোট্ট একটা বাক্সে নিয়ে এলেন গয়না-গুলো। বললেন, 'বাড়িটাকে কলি ফিরিয়ে, মজাপুকুর সাফ করিয়ে মাছ ছেড়ে, চার পাশে বাগান ঘিরে দেবো। বিয়ে হ'লে এ-বাড়িতেই থাকতে পারবি। কাকার বাড়িতে তো জায়গা নেই।'

কিন্তু মূল্য যে টাকারই, তাঁদের মৃত্যুর পরে সে-কথা দারুণভাবে উপলব্ধি করেছিলো অরুন্ধতী। ঐ তো প'ড়ে আছে সব, মৃতের কঙ্কালের মতো অনর্থক হ'য়ে ঘর জুড়ে, কী কাজে বা লাগলো। কী কাজে আর লাগবে। কে ছোঁবে ঐ সব। মরবার আগে তরঙ্গিণী বলেছিলেন, 'দে, পুড়িয়ে দে, জ্বালিয়ে দে। ওগুলো তোর অভিশাপ। আগে-ভাগে আশা ক'রে থাকলে ভগবান তাদের এই সাজাই দেন।' দাদামণি যদি জিনিসের স্তূপে টাকার সমাধি রচনা না করতেন তাহ'লে হয়তো এই কলকাতাতেই আসতে হ'তো না অরুন্ধতীকে। যেতে হ'তো না হরিণডাঙার জমিদার-বাড়ি। কিন্তু এ-কথাও সেই সঙ্গে না-ভেবে পারলো না অরুন্ধতী, সেখানে না-গেলে তো মৃন্ময়ীর দেখা পেতো না সে। অদৃষ্টের কী পরিহাস। কী আশ্চর্য। মৃন্ময়ীও আবার সেই ভুলই করলেন। আবার যৌতুক দিলেন তাদের, তাকে আর সোমনাথকে। কিন্তু না, এ-যৌতুক অরুন্ধতী জ্বালিয়ে দেবে না, পুড়িয়ে দেবে না, তালা

বন্ধ ক'রে রেখে দেবে না তরঙ্গিণীর মতো আশা ক'রে সাজিয়ে। এর বিনিময়ে সে দাঁড়াবে। মানুষের মতো মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াবে সে সংসারে। মাথার উপর চাল, ক্ষুধার সময় আহার। জীবনের এই অপরিহার্য প্রহসন। আর তারপর? তারপর আবার আশার ছোট্ট বুদ্‌বুদ্‌। একটি সরু আলোর রেখা। তার আর মৃন্ময়ীর নতুন সংসার।

কিছুই হ'লো না। কিছুই হ'লো না। তার জন্য কিছুই হবার নেই সংসারে। কিচ্ছু দেবেন না পণ ক'রেই বিধাতা তাকে পাঠিয়েছেন এ-সংসারে। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, ঈশ্বর। পরম নিষ্ঠুর তুমি।

যতক্ষণে এই সব ভেবে সে আকুলি-বিকুলি করলো ততক্ষণে বিকেল নামলো গাঢ় হ'য়ে। সুবিনয় হাজির হ'লো এসে। রোজকার মতো তাদের গল্পের আসরে ডাক পড়লো অরুন্ধতীর। মাথা-ধরার ছল ক'রেও রেহাই পেলো না, সুবিনয় দৌড়ে এলো ব্যস্ত হ'য়ে। নিয়ে এলো অ্যাস্পিরিন— উঠতেই হ'লো তাকে।

কিন্তু সুবিনয়ের আর দোষ কী? কেতকীই তাকে এই প্রশ্রয় দিয়েছে। আর কেতকীরই বা দোষ কী? সে তো তার ভালোর জন্যই করেছে সব। তার ভেসে-বেড়ানো ডিঙি-নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে তীরে ভিড়িয়ে দিতে চাইছে। অরুন্ধতীই হতভাগিনী। সে চায় না সেই নিশ্চিত আশ্রয়। এমন কি সেই ভয়েই বুকের ভেতরটা তার লাফাতে থাকে সারাদিন।

তাই, ক'দিন ধ'রে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে খবরের কাগজ তচ্‌নচ্‌ ক'রে দেখছিলো। এ-বাড়ি থেকে পালাবার আপ্রাণ চেষ্টা। অন্য যে-কোনো একটা আশ্রয়। সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে একগাছা কুটো জুটলো। ভালোই জুটলো। অনেক উত্তাপের পরে মেঘ দেখা দিলো আকাশে।

মৃন্ময়ীর আশীর্বাদ কাজে লাগলো এবার।

৬

মেদিনীপুরে গিয়ে চিঠি লিখলো স্থবিনয় :

'কেতকী,

আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েই এই চিঠি লিখছি। অরুন্ধতীকে বিয়ে করতে আমার কোনোই আপত্তি নেই। খবরটা তাকেও দিয়ো, আর সোমনাথকেও। আমি ভাবছি, মাসখানেকের মধ্যে যে-কোনো উপায়ে দু-একদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতা যেতে চেষ্টা করবো আর তা না হ'লে একদিন যে-কোনো শনিবার বিকেলে গিয়ে হাজির হবো এবং একেবারে বিয়ে ক'রেই ফিরবো। রেজিস্ট্রি ক'রেই বিয়ে করবো ভাবছি, কেননা আমার দিকে তো কেউই নেই ও-সব হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠান করাবার মতো, অরুন্ধতীরও কেউ নেই। অতএব হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে আর লাভ কী। তোমরা রেজেস্ট্রি আপিশে একটা নোটিশ দিয়ে রেখো।'

চিঠি পেয়ে একেবারে লাফাতে লাগলো কেতকী। সোমনাথের আপিশ যাওয়া দেরি করিয়ে দিলো, অরুন্ধতীকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করলো আর তার উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়েই হয়তো দাড়ি কামাতে গাল কেটে গেলো সোমনাথের; স্নান করতে গিয়ে ভুল ক'রে গেঞ্জি ফেলে এলো, খেতে ব'সে শুধু জল খেলো বারে-বারে। অরুন্ধতী দাঁড়িয়ে রইলো দরজার আধো আড়ালে, তার চোখের পাতা কাঁপলো, বুকের ভেতর কাঁপলো, একটা ভীরু হরিণের মতো চকিত হ'য়ে উঠলো শরীর মন। হরিণডাঙার অমরনারায়ণের আশ্রয়ের চাইতে কেতকীর আশ্রয়ই সেই মুহূর্তে বেশি ভয়াবহ মনে হ'লো তার।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে, কেতকীকে যথারীতি ওষুধ দিয়ে, একটু ইতস্তত ক'রে অরুন্ধতী বললো, 'আমি কাল যাবো।'

'যাবে? কোথায়?' কেতকী শুয়ে পড়তে-পড়তে উঠে বসলো।

'বোর্ডিংয়ে।'

'বোর্ডিংয়ে। সে আবার কী?'

'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিলো, আমি চিঠি লিখে ঠিক করেছি।'

'ধ্যেৎ।' কথাটাকে একেবারে আমলেই আনলো না কেতকী। হেসে বললো, 'বোর্ডিং-ফোর্ডিংয়ের পালা তো এবার ফুরোলোই, আর কেন? যে-ক'দিন আছো এ বাড়িতেই স্বামীর বাড়ির রিহার্সেলটা দাও।' আরাম ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো সে। অরুন্ধতী তবু মুখ তুললো কিছু বলবার জন্য; তাকিয়ে রইলো, অপেক্ষা করলো কিন্তু বলতে পারলো না। কেতকীর মন এখন তার অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসে, এখন সে কিছু শুনবে না, শুনলেও কানে তুলবে না, আর তুললেও অশান্তি হবে অনেক। অতএব তার মর্জির অপেক্ষায় থাকাই ভালো। অরুন্ধতী উঠে গেলো আস্তে-আস্তে।

কিন্তু রাত্তিরে খাবার টেবিলে আবার তুললো কথাটা। 'আমি তাহ'লে কাল সকালেই যাই?'

সোমনাথ খেতে-খেতে চকিতে তাকালো। কেতকী বললো, 'ও বাবা, তুমি দেখছি সে-কথাতেই লেগে আছো।'

এবার সোমনাথ বললো 'কোথায়?'

জবাব কেতকীই দিলো, 'অরুন্ধতী বোর্ডিং ঠিক করেছে। তুমি তো গার্জিয়ান, তোমার মতটা কী?'

'বোর্ডিং?'

বাঁকা হাসলো কেতকী, 'আবার খবরের কাগজের কাটিং। আবার স্থাখো কোন অমরনারায়ণ।'

অরুন্ধতী কুণ্ঠিত মুখে বললো, 'এক ভদ্রমহিলা তাঁর নিজের বাড়িতে—'

'ঠিক আছে,' হঠাৎ কেতকী অসহিষ্ণু হ'লো, 'এখুনি তোমার যাবার কী দরকার? ধরো না, পশু শনিবার, পশু'ই যদি স্থবিনয় এসে পড়ে? তার চেয়ে স্থাখো না ক'টা দিন।'

অরুন্ধতী চুপ ক'রে রইলো। বলি-বলি ক'রেও বলতে পারলো না, স্থবিনয় নামক যুবকটির আসা না-আসার সঙ্গে তার যাওয়া না-যাওয়ার কোনো সম্বন্ধ নেই। বলতে পারলো না, তার ভয়েই সে এমন ব্যাকুল হ'য়ে পালাতে চাইছে। একটু পরে অন্য ভাবে বললো, 'আমি আবার পড়বো ঠিক করেছি।'

'বেশ তো। সবই হবে। ওকে আসতে দাও না।' কেতকী সোমনাথের দিকে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করলো, 'তুমি কিছু বলছো না কেন?'

'অ্যাঁ। হ্যাঁ।' সোমনাথ দ্রুত ভঙ্গিতে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখলো, 'তাই তো। ও এলেই তো সব ঠিক করা যাবে।'

'রেজিস্ট্রি আপিশে গিয়েছিলে?'

'না তো।'

'কেন?'

'ভাবছিলাম নোটিশ দেবার আগে এঁকে একবার—'

'কেন, ওর অমত হবে ব'লে সংশয় হচ্ছে নাকি তোমার?'

'সংশয়ের কথা নয়। কিন্তু—'

'অনুমতিটা দিয়ে দাও না, অরুন্ধতী।'

এই স্থযোগ। কিন্তু অরুন্ধতী আসন্ন ঝড়ের আভাসে পাখির মতো আতঙ্কিতই হ'লো শুধু, আরক্ত মুখে তাকালো বার-বার কিন্তু কেতকীর

কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে বলবার ভাষাটা আর খুঁজে পেলো না। সোমনাথ তার দিকে তাকালো একবার, তারপর কেতকীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখন থাক না ও-সব কথা, সুবিনয়ের আসতে তো দেরি আছে ? ভালো জায়গা পেলে যদি যেতেই চান—'

'তাহ'লে যাক। আমার কী। তোমাদেরই যখন গরজ নেই—' জল খেয়ে খাওয়া শেষ করলো কেতকী।

৭

কিন্তু রাত্রিবেলা তুমুল কাণ্ড করলো তাই নিয়ে। স্বামীর চোখে চোখ রেখে দৃঢ় গলায় বললো, 'বোর্ডিংয়ে ওর যাওয়া হবে না।'

অবাক হ'য়ে সোমনাথ বললো, 'কেন ?'

'যদি যেতেই চায়, কলকাতা ছেড়েই যেতে হবে ওকে।'

'সে কী !'

'যা বলছি ঠিক তা-ই।'

'কেকা, সত্যি তুমি ছেলেমানুষি করছো।'

'একটুও না। তবে ছেলেমানুষ হ'লেই যে তোমার পক্ষে সুবিধের হ'তো সেটা বুঝতে পেরেছি।'

'আমার আবার সুবিধে অসুবিধের কথা উঠছে কিসে ?'

'ও বাবা ! উঠছে না ? বিয়ে না-ক'রে ও যদি বোর্ডিংয়ে যায় তবে তো তোমারই সবচেয়ে সুবিধে। সেখানে অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা, দিনরাত নিভৃতে দেখা করার কত সুযোগ—' যে-কথা বলার জন্য মায়ের উপর একদিন বিতৃষ্ণায় বিমুখ হয়েছিলো মন, সে-কথাটাই আসলে ছোবল মেরেছে তার মনে। কখন অজান্তে জ'মে উঠেছে বিষ।

একটু তাকিয়ে থেকে সোমনাথ গম্ভীর গলায় বললো, 'এত ছোটো কথা তুমি কখন ভাবো ?'

একটু দ্বিধা না-ক'রে কেতকী বললো, 'তুমি যখন ছোটো কাজ করো।'

'না, আমি কখনো ছোটো কাজ করি না, ছোটো কথাও ভাবি না।' টেবিলের কাছে এসে একটা বই তুলে নিলো সে হাতে। কেতকী তৎক্ষণাৎ বইটা হাত থেকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে, 'করো কি না করো তা আমি জানি, আমার মা একদিনের জন্য এসেও তা বুঝে গেছেন।'

সোমনাথ চুপ।

'না, এ-সব চলবে না।'

চেয়ারে বসলো সোমনাথ, তেমনি গম্ভীরভাবেই বললো, 'কখনো ভাবি নি তুমি এ-সব কথা বলতে পারো।'

কেতকী প্রায় গর্জন করলো, 'আমিও ভাবি নি আমাকে লুকিয়ে কখনো তুমি কোনো অন্যায় করতে পারো।'

'কোনো অন্যায়ই আমি করি নি।'

'কেন করবে না ? আমাকে লুকিয়ে তুমি হরিণডাঙায় যাও নি ? আমার চোখের আড়াল হবার জন্যেই এই বোর্ডিংয়ে যাবার ব্যবস্থা' কি হয় নি ?'

কেতকীর দিকে সোমনাথ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো, বললো, 'সত্যি কি তুমি এ-সব ভাবছো ? নাকি আমাকে যন্ত্রণা দেয়াই তোমার উদ্দেশ্য ?'

'যন্ত্রণা কি তুমিই আমাকে দিচ্ছো না ?'

'এ-কষ্ট তোমার নিজের রচনা।'

'যদি তা-ই হয় তুমি তো তা থেকে আমাকে বাঁচাতে পারো।'

'যদি তুমি নিজে থেকে শান্ত না হও তাহ'লে আমার মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো প্রতিকার নেই।'

'আমি কি বুঝি না? জানি না? এই মেয়ের কেন বিয়েতে মন নেই, গরজ নেই? কিন্তু এ-বিয়ে আমি দেবোই দেবো।'

'তাহ'লে আর আমাকে জড়াও কেন? যা করবার তা তো তুমি নিজেই করবে।'

রাগে ফেটে গেলো কেতকী, 'কেন জড়াবো না? বোর্ডিংয়ে যে উনি থাকবেন খরচটা তো তুমিই জোগাবে।'

'আমার কাছ থেকে খরচ নিয়ে উনি বোর্ডিংয়ে থাকবেন এ-কথাটা তুমি না-ভাবলেও পারতে। ম'রে গেলেও তা থাকবেন না।'

'পঞ্চাশবার এসে উঠতে পারে, আর টাকা নিতেই তার আটকাবে। বেশি ইয়ে কোরো না। ও পাবে কোথায় টাকা?'

'সেটা আমার জানবার কথা নয়।'

'তুমি জানো, জানো, নিশ্চয়ই জানো।'

মেঝেতে ছুঁড়ে-ফেলা বইটা তুলে এনে তার পাতা উল্টোলো সোমনাথ।

'চুপ ক'রে রইলে কেন? জবাব দাও।' কেতকী তেতে উঠলো।

চোখ না-তুলেই ঠাণ্ডা গলায় সোমনাথ বললো, 'যা জানি না হাজার জিজ্ঞাসাতেও তো তার জবাব দিতে পারবো না।'

'যখন এসেছিলো একটা পয়সা ছিলো না হাতে, দরিদ্রের অধম, আর এই দু-মাস চাকরি ক'রেই সে এত বড়োলোক হ'য়ে গেলো যে মাসে-মাসে খরচা দিয়ে বোর্ডিংয়ে থাকবে? মাইনে দিয়ে কলেজে ভর্তি হবে?'

'চুরি নিশ্চয়ই করে নি।'

'না, চুরি করবে কেন ? চুরিতে আর কতটুকু ভরে ?' স্বামীর ওপর রাগে কেতকী অত্যন্ত অসংগত কথা বলতেও দ্বিধা করলো না, 'সম্ভ্রম ভাঙিয়ে খেলে আর যারই অভাব হোক টাকার অভাব হয় না মেয়েদের। অমরনারায়ণকে ওর বিয়ে করা উচিত ছিলো, অন্তত তাতে ওর চরিত্র বজায় থাকতো।'

বই থেকে চোখ তুলে সোজা স্ত্রীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সোমনাথ ; তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। এলো এক-ফালি উঠোনের আকাশের মুক্তিতে। আর খোলা দরজা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দুই হাতে মুখ ঢাকলো কেতকী, যেন লজ্জায় মিশে গেলো বিছানায়। বালিশ আঁকড়ে মনে-মনে বললো, 'হায়, হায়। এ আমি কী হলাম ? কেমন ক'রে এমন ছোটো হ'য়ে গেলাম ?'

৮

সেই রাত্রেই সহসা ভোরের দিকে একটা সুতীব্র ব্যথার আলোড়নে ঘুম ভেঙে গেলো তার। কুলকুল ঘাম নামলো পিঠে শিরদাঁড়া বেয়ে। মনে হ'লো কোমর থেকে তলপেট পর্যন্ত, যেন কোনো জন্তু তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে চিবিয়ে খেতে-খেতে নেমে আসছে আরো নিচের দিকে, ফেটে যাচ্ছে উরু দুটো। অধীর হ'য়ে দাঁতে-দাঁত চাপলো, হাতে-হাত ঘষলো, উঠে বসলো, শুয়ে পড়লো, আবার উঠলো, আবার শুলো, তারপর ককিয়ে উঠলো অসহ্য যন্ত্রণায়।

সেই শব্দে চোখ মেলে সোমনাথও উঠে বসলো লাফ দিয়ে। আলো জেলে, কাৎ হ'য়ে শুয়ে-থাকা কেতকীর মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বললো, 'কী ? অ্যাঁ! কী ? কী হয়েছে ?' তার কণ্ঠস্বরে ভয় ফুটলো। কেতকী

জবাব দিলো না। সমস্ত শরীরটা কেবল এ-পাশ ও-পাশ মোচড়াতে লাগলো, দুই চোখের জলে তার গাল ভেসে গেলো, হাতের মুঠোটা ছোটো হ'তে-হ'তে এইটুকু একটা গিঁটের মতো হ'য়ে গেলো।

'শোনো, এই, কেকা—' প্রায় কান্না নেমে এলো সোমনাথের গলায়, 'ডাক্তার, ডাক্তার ডাকবো? কী করবো? বলো, বলো—'

কেতকী হাঁপাতে লাগলো, তারপর নিঝুম হ'য়ে যেতে-যেতে বললো, 'অরুন্ধতীকে ডাকো।'

সোমনাথ ছুটে এলো পাশের ঘরে, দরজায় ধাক্কা দিলো জোরে, 'এই যে, দেখুন, শুনুন, একবার বাইরে আসুন তো।'

অরুন্ধতী ধড়মড়িয়ে উঠে নেমে পড়লো বিছানা থেকে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'কী হয়েছে?'

'আপনি একটু ও-ঘরে যান, আমি এখুনি ডাক্তার নিয়ে আসছি।'

'ডাক্তার!' অরুন্ধতীর গলা কেঁপে গেলো। ছেলেমানুষ বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগলো অজানা ভয়ে। সোমনাথ আর দাঁড়ালো না।

কিন্তু ফিরে এলো তক্ষুনি। 'টাকা। টাকা তো নিয়ে যাই নি। তোমার আলমারির চাবি কই?'

'টাকা!' সোমনাথের দিকে একটা শূন্য দৃষ্টি মেলে দিলো কেতকী। 'টাকা তো নেই। মাত্র একটা দশটাকার নোট বোধহয় প'ড়ে আছে কাপড়ের ভাঁজে।'

'সর্বনাশ। তবে? তবে কী উপায়?'

সবে আট পুরে ন'মাস চলছে কেতকীর, এর মধ্যেই যে এই বিপদ এসে হাজির হবে ঘরে কে জানতো? সোমনাথ মাথায় হাত দিলো। শান্ত চোখে তাকিয়ে অরুন্ধতী বললো, 'আমার কাছে আছে।'

উঠে এলো সে এ-ঘরে, ব্যস্ত ব্যাকুল সোমনাথের হাতে মৃন্ময়ীর থলিটি তুলে দিলো নিঃশব্দে। সোমনাথ আর তাকালো না কোনো দিকে, কী আছে, কত আছে হিসেব করলো না কিছু, এক ছুটে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

অরুন্ধতী এসে বসলো কেতকীর মাথার কাছে, হাত বুলিয়ে দিলো গায়ে, সব বেদনা মুছে নিতে চাইলো একাগ্র হ'য়ে। আর কেমন ভয়-মেশানো একটা কান্না গড়াতে লাগলো বুকের মধ্যে। এ-দৃশ্য কি সে কোনোদিন দেখেছে? কোনোদিন কারো জন্ম-মুহূর্তে সে বসেছে মায়ের মাথার কাছে? তার মতো ছোটো মেয়েকে কে কবে মাথা গলাতে দিয়েছে এই অভিজ্ঞ ব্যাপারে? কেতকীর যন্ত্রণা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগলো। আরো। আরো। আরো। কী অসহ্য ব্যথা। দুরন্ত, অশান্ত বন্যার মতো ভাসিয়ে নিতে লাগলো তাকে। ঢেউ আসে, ঢেউ যায়। তীরে এসে ফেটে পড়ে শতধা হ'য়ে। একবার দম বন্ধ হ'য়ে আসে, একবার নিশ্বাসের ঘনতায় এতখানি ওঠা-পড়া ক'রে সারা শরীর। একবার ব্যথার চাপে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে ওলোট-পালোট করে আবার জুড়িয়ে গিয়ে ক্লান্তি নামে চোখে।

মৃদু কাতরোক্তি আর্তনাদে এসে পৌঁছলো।

এরই নাম প্রসব-ব্যথা? যন্ত্রণায় চিৎকার করতে-করতেও কেতকী ভাবলো। এত কষ্ট! মাকে এ-রকম ক'রেই বিদীর্ণ ক'রে তবে সন্তান আসে পৃথিবীতে? এ-রকম ক'রে তবে একদিন সে-ও এসেছিলো? সোমনাথও এসেছিলো? আর এই, এই যে ব'সে আছে মেয়েটি, যাকে কয়েক মুহূর্ত আগে তার পরম শত্রু ব'লে মনে হয়েছিলো, যে-মেয়েটির সরোবরের মতো টলটলে দুই চোখ ভরা ব্যাকুলতা, যে-মেয়েটিকে সে নিজে ভালোবাসে আর সোমনাথ যার দিকে একবার তাকালেও বুক

ফেটে যায়, ও-ও? সবাই এমনি ক'রে আসে? এমনি ক'রেই কি গাছ-মা-ও জন্ম দেয় তার ফলের? শুকনো পাতার ডালে-ডালে এমনি ক'রেই ঝড় নেমে আসে? গিরিগুহা থেকে আসে জলস্রোত, ঢল নামে নদীতে। ভেসে যায় মরুভূমি। রুক্ষ বিবর্ণ ক্যাকটাসের ডালেও ফুটে ওঠে ফুল? এই তো এমনি ক'রে ধীরে-ধীরে অতল ব্যথার গভীর থেকে উঠে আসে সন্তান, রং নিয়ে, রস নিয়ে। তবে এসো, এসো। তুমিও এসো। আমার দেহের তমসা থেকে তুমিও বেরিয়ে এসো। কল্লোলের মতো। দুঃসহ ব্যথার নিবিড় অন্ধকার থেকে চ'লে এসো আলোতে। তোমার নাম রাখবো আমি— কী নাম? কী না বলেছিলো একদিন সোমনাথ? লক্ষ্মীমণি? না। না, না। লক্ষ্মীমণি না। আমি লক্ষ্মীমণি চাই না; আমি ছেলে চাই। সোমনাথ, সোমনাথকেই আমি শিশুরূপে চাই, ঠিক তেমনি বলিষ্ঠ, সহিষ্ণু, ভদ্র, শান্ত, ঠিক তরঙ্গিণীর ছেলের মতো। কে? কে ও? কে দাঁড়িয়ে? এত অন্ধকার কেন? কী দেখছি আমি? কাকে দেখছি? শাদা থান প'রে কে অমন কান্নাভরা চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার শিয়রে? অরুন্ধতী। অরুন্ধতী। কই, সোমনাথ, তুমি কই? কে? কে গো তুমি……

জ্ঞান হ'লো প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে। বাড়িতে ডাক্তারের হাট ব'সে গেছে ততক্ষণে। টুপি-পরা নার্স ঘোরা ফেরা করছে চারদিকে, এপ্রন-পরা ডক্টর নন্দী হাত ধুচ্ছেন ছোটো গামলায়, অ্যাসিসটেণ্ট মজুমদার ইনজেকশন দিচ্ছেন গম্ভীর মুখে, অরুন্ধতী ঠায় ব'সে আছে শিয়রে, পাগলের মতো উদ্‌ভ্রান্ত সোমনাথ ছুটছে, হাঁটছে, খাটছে, কাঁদছে— কেতকীর মা এসেছেন চুঁচড়ো থেকে, ডিক এসেছে ব্যাণ্ডেল থেকে আর এসেছে ফুটফুটে, তুলতুলে, নরম এইটুকু একটা মাংস-পিণ্ড।

কেতকীকে অজ্ঞান ক'রে পেট কেটে তবে বার করতে হয়েছে এই খুদে সন্তান। .'

চোখ খুলতে আনন্দে ঝুঁকে পড়লো অরুন্ধতী, 'দিদি।'

জ্ঞান হয়েছে? জ্ঞান হয়েছে? মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়লো শব্দ দুটি। সোমনাথের অনিদ্রা-ক্লান্ত চোখ মুহূর্তে চকচকে হ'য়ে উঠলো, ডাক্তাররা চাঙ্গা হ'য়ে উঠলেন। মিসেস মুখার্জি তাড়াতাড়ি নাতি কোলে নিয়ে এগিয়ে এলেন মুখের কাছে, 'এই গ্যাখ, কে এসেছে তোর ঘরে, ছেলে—ছেলে হয়েছে।'

'ছেলে।'

'কী সুন্দর ছেলে, পুতুলের মতো।'

এক ফোঁটা চাঁদ। ছোটো-ছোটো হাত, ছোটো-ছোটো পা, এইটুকু-টুকু আঙুল, ভাবতে অবাক লাগে, মানুষ। তারই মধ্যে কান্নার কী জোর, কী বলিষ্ঠ গলা। মজা লাগলো অরুন্ধতীর। এমন আর সে গ্যাখে নি, দু-হাত বাড়িয়ে দিলো কোলে নেবার জন্য। মিসেস মুখার্জি একেবারে হা-হা ক'রে উঠলেন, 'ধোরো না, ধোরো না। হাত-পা ভেঙে ফেলবে।'

'একটু দিন—'

'না, বাপু। সবটা নিয়ে ছেলেখেলা ভালো লাগে না।' মুখ ঘুরিয়ে নাতি নিয়ে তিনি শুইয়ে দিলেন দোলনায়। এই দোলনা তিনি নিজে কিনেছেন, তার ভেতরকার বিছানা সোমনাথ কিনেছে।

৯

সম্পূর্ণ তো নয়ই, কিছুটা সেরে উঠতেও বেশ সময় লাগলো কেতকীর। একেবারে টান হ'য়ে শুয়ে-থাকা অবস্থাতেই কাটলো তার দেড় মাস, তার

ওপরে মাসখানেক লাগলো ঘা শুকুতে। শেলাই কাটা, আবার তা পেকে ওঠা, তাই নিয়ে প্রবল জ্বর, জ্বর ছাড়লো তো পেটে ব্যথা, মুখে স্বাদ নেই, মাথায় যন্ত্রণা, একটা-না-একটা কষ্টের উপসর্গ লেগেই রইলো তার। মিসেস মুখার্জি চ'লে গেলেন এক মাস থেকে। তাঁর ছুটি নেই। অরুন্ধতীর আর যাওয়া হ'লো না, তার তো আর ছুটির কথা ওঠে না। মিসেস মুখার্জি বললেন, 'যতদিন সেরে না ওঠে থাকতেই হবে তোমাকে। এই ফেলে কেউ যায়? আর তা ছাড়া তোমার বিপদে যারা এত করেছে, যার আশ্রয়ে এসে তুমি নিজেকে নিরাপদ জেনেছো এখনই তো তার প্রতিদান দেবার সময় তোমার। ছেলেমানুষ, শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, হাঁটো, খাটো, সেবা করো। যদি এতে ঋণ তোমার শোধ হয় তবে তো তোমারই ভাগ্য।'

অরুন্ধতী মনে-মনে বললো, 'তবে তা-ই হোক। সেই ভাগ্যের কাছেই আত্মসমর্পণ করা যাক।' অতএব ঘুম ভেঙে উঠে আবার ঘুমিয়ে না-পড়া পর্যন্ত বিরাম রইলো না তার, বিশ্রাম রইলো না।

দিন আরো ছোটো হ'লো, ক'মে গেলো সকাল আর সন্ধ্যার ব্যবধান, সোমনাথের উত্তর-মুখো ফ্ল্যাটে শীত নামলো কনকনে। সামনের সরকারি চত্বরটুকু আবিল হ'য়ে উঠলো সারা পাড়ার কয়লার ধোঁয়াতে। এর মধ্যেই একদিন সুবিনয়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলো অরুন্ধতী, ভাবী স্ত্রীর কাছে তার প্রথম প্রণয়-নিবেদন। আসতে পারছে না সে, কেননা ছুটি নেই। যে-কোনো একটা শনিবারের ছুটিতেও যে আসবে তারও উপায় নেই, কারণ ছুটির সময় ছাড়া কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যাবার হুকুম নেই সরকারের। অথচ সুবিনয়ের মন মানে না। আপিশে সে জরুরি দরখাস্ত দিয়েছে, বিয়ে করার ছুটি। যদি কর্তাদের অনুমতি পায় তবে ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যাবে।

এ-বাড়িতে কোথাও রোদ্দুর নেই। ময়লা উঠোনটুকুই ব্যবহারযোগ্য ক'রে নিয়েছে অরুন্ধতী, ধারে গাঁদা গাছ পুঁতে ফুল ফুটিয়েছে হলদে-হলদে, সেই স্বল্পতম রোদ্দুরটুকুতেই সোমনাথের ছেলেকে তেল মাখাতে-মাখাতে তার হাত থেমে গেলো। পাঁচ বাড়ির মাথা এড়িয়ে, গলি পেরিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে একছিটে সেই রোদের উত্তাপই এই মুহূর্তে আগুন মনে হ'লো তার কাছে, আর তার পরেই হিমের মতো ঠাণ্ডা নামলো পৃথিবীতে, নামলো অন্ধকার, কবরের শীতলতা।

ফাল্গুন। ফাল্গুনের দেরি আছে নাকি ? এই তো এলো ব'লে। শুকনো পাতা ঝরিয়ে, নতুন পাতার কলরোল তুলে। বাতাসে সুর ভাসিয়ে যে-ফাল্গুন উনিশটি বসন্ত উপহার দিয়েছে তাকে, সে-ফাল্গুন তো এসে গেলো। এই তো এই উঠোনে ব'সেও তার আভাস পাচ্ছে অরুন্ধতী। গেলো বছর এমন দিনে বুকের ভেতরটা তার আশায় আর আনন্দে ঝিরঝির ক'রে কাঁপছিলো খেজুর-পাতার মতো। দাদামণি বলেছিলেন, 'বউমা, সামনে সুন্দর বসন্তকাল। ফাল্গুনের মতো মাস কিন্তু আর বছরে নেই। সব রকমের সুবিধে।' তরঙ্গিণী আধো ঘোমটার আড়ালে নরম হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে বলেছিলেন, 'সোমাকে আমি লিখে দেবো ছুটি নিতে। বিয়ের ছুটি সব চাকরিতেই আছে।'

মনের কথা মনেই লীন হ'লো দু-জনের। দাদামণি বিছানা নিলেন হঠাৎ, তারপর কে যেন এক গণ্ডূষে সব গ্রাস ক'রে নিলো।

আর অরুন্ধতী! এই তো অরুন্ধতী আবারও কাঁপছে, তেমনি ঝিরিঝিরি খেজুর-পাতার মতোই কাঁপছে তার বুক, আশায় নয়, আশঙ্কায়।

সত্যিই সে আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো, দুপুরবেলা টুকটুক কড়া-নাড়ার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দিয়ে যখন দেখলো স্থবিনয় দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মুখের গোলাপি রঙে তার ছাইয়ের বিবর্ণতা ছড়িয়ে পড়লো। স্থবিনয় হাসিতে বিস্তীর্ণ হ'য়ে বললো, 'এই যে। কেমন আছো?'

অরুন্ধতী নামিয়ে নিলো চোখ।

'এইবার সত্যি পালে বাঘ পড়লো তোমার, অরুন্ধতী। অভাগা এসে গেছে। ফাল্গুন পর্যন্ত আর পারলাম না অপেক্ষা করতে।'

অরুন্ধতী তার তুমি সম্বোধনটা লক্ষ্য করলো।

'উঃ, কী শীত ফ্ল্যাটটাতে। ভারি বিশ্রী তো! থাকো কী ক'রে?'

বাড়ি অরুন্ধতীর নয়, সোমনাথের। শুকনো গলায় বললো, 'বস্থন। আমি দিদিকে বলছি। ওঁর খুব অস্থখ।'

'অস্থখ! কী অস্থখ?'

'ঐ— মানে— ওঁর একটি ছেলে হয়েছে।'

'ছেলে! আরে! আমাকে তো জানাও নি সে-কথা।' যেন অরুন্ধতী সর্বদা সব কথাই তাকে জানায়। ভেতরের দিকে যাচ্ছিলো সে, স্থবিনয় বাধা দিলো— 'শোনো, শোনো। অস্থস্থ মানুষকে বিরক্ত ক'রে লাভ নেই। তুমি বোসো।'

'আমার কাজ আছে।'

'এখন এই নিরিবিলি ভরদুপুরে আবার তোমার কী কাজ?'

'খোকা খাবে।'

'বেশ, খাইয়ে এসো।'

বাঁচলো অরুন্ধতী। কেতকীর ঘরে এসে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দিলো তাকে। বললো, 'স্থবিনয়বাবু এসেছেন, ওঁকে কি নিয়ে আসবো এখানে?'

'সুবিনয়! সুবিনয় এসেছে?' গায়ের আঁচল ঠিক করতে-করতে কেতকী উঠে বসলো। খাটের বাজুতে লম্বা ক'রে দুটি বালিশ দিয়ে তাকে হেলান ক'রে দিলো অরুন্ধতী। কেতকী বালিশের তলায় রাখা ছোটো চিরুনিটা হাতে তুলে খশখশ ক'রে মাথায় চালাতে-চালাতে বললো, 'আমার চুলের কী দশা হ'লো, অরুন্ধতী? কেউ কি বিশ্বাস করবে, কোনোদিন এই চুলে আঙুল ডুবতো না?'

অরুন্ধতী বললো, 'আপনার মাথায় কিন্তু অনেক ছোটো-ছোটো চুল গজিয়েছে।'

'গজিয়েছে?'

'অনেক ভালো হ'য়ে গেছে চেহারা।'

কেতকী নিজের সুডোল সুন্দর পাথরের মতো মসৃণ শ্যামল হাতের বদলে একখানা শীর্ণ শুষ্ক হাত মেলে ধরলো চোখের সামনে, 'ভালো হয়েছে, না?' পরম আশ্বাসে তাকালো অরুন্ধতীর মুখের দিকে, 'আমিও লক্ষ্য করেছি। শোনো, শীতটা কমলেই আমি চেঞ্জে চ'লে যাবো। সুবিনয় ঠিক সময়েই এসে পৌঁচেছে। মনে-প্রাণে আমি ওকেই চাইছিলাম।'

অরুন্ধতী নিচু হ'য়ে খোকাকে কোলে তুলে ওর ভেজা কাঁথা বদলে দিলো। আর তার নিঃশব্দ নিচু-করা মাথার দিকে অপলকে তাকিয়ে কী ভেবে কেতকীর গলা নরম হ'য়ে উঠলো, 'আমি জানি বিয়েতে তোমার আগ্রহ নেই, আনন্দ নেই, কিন্তু এও জানি বিয়ে হ'লে তুমি সুখী হবে। ভেবে দ্যাখো তো এটা কি একটা জীবন? আমার সেবা করা কি তোমার কাজ? আমার ছেলে মানুষ করায় কি তোমার কোনো সার্থকতা আছে? তুমি মনস্থির করো, অরুন্ধতী।' খপ ক'রে হাত চেপে ধরলো সে, 'বলো, কথা দাও।'

টলটলে চোখে কেতকীর দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো অরুন্ধতী,

শুধু একটা অব্যক্ত বেদনায় ডানা ঝাপটালো বুকের পাখিটা। কেতকীর ছেলের অবিকল সোমনাথের মুখের মতো মুখের উপর ঈষৎ নামলো নিজের মুখ, ঠোঁটটা গালের উপর ছুঁলো কি ছুঁলো না।

একটু থেমে কেতকী বললো, 'আমি আমার স্বার্থে তোমাকে আর জড়াবো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। সত্যি ভালোবাসি। আমি বিয়ে দেবো তোমার—' একটু হাসলো, 'এই ছেলে তোমার যত আদরেরই হোক, তোমার তো ছেলে নয়। কিন্তু বিয়ে হ'লে তোমার নিজের ছেলে হবে। এত কষ্ট পাচ্ছি এই বাচ্চাটার জন্য, তবু তোমাকে বলি, ও যখুনি আমার কাছে আসে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, খেলা করে হাত-পা নেড়ে-নেড়ে— তখন কী যে ভালো লাগে সে তুমি বুঝবে না।'

বুঝবে না ? অরুন্ধতী বুঝবে না ? কেতকী কি জানে না এই ছেলের জন্মটুকুই শুধু সে দিয়েছে আর সবই করেছে অরুন্ধতী ? রাত জেগে ব'সে থেকেছে কোলে নিয়ে, নোংরা ঘেঁটেছে দু-হাতে, স্নান করিয়েছে, পলতে দিয়ে খাইয়েছে— এই জীবন্ত পুতুলই তো এখন জুড়ে রয়েছে তার সারা মন, সমস্ত সময়। আর তা কি অতীত ? এই তো— এই মুহূর্তেও তো তারই বুকের উত্তাপে বড়ো হচ্ছে সে। শীত ঘন হবার পরে বিছানায় সে কতটুকু গা দেয় ? কেবল দুপুরটুকু থাকে মা-র কাছে, ঐটুকুই সারা দিনে। রাত্রে বাচ্চা শুলে ঘুমের ব্যাঘাত হয় তাই ডাক্তার বারণ করেছেন। অতএব তাও অরুন্ধতী। তবু অরুন্ধতী বুঝবে না ?

'এবারই যাতে বিয়ে ক'রে তোমাকে ও মেদিনীপুরে নিয়ে যায় আমি সে-কথাই বলবো ওকে।' চিরুনি রেখে কেতকী সহপাঠীর সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বসলো।

১১

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা মস্ত দামি এক উপহার কিনে নিয়ে এলো সুবিনয়। সারাগায়ে চুনি-সেট-করা গোল আংটি। সোমনাথকে দেখিয়ে বললো, 'রাত দশটায় বর্ধমান যেতে হচ্ছে বড়ো সাহেবের সঙ্গে। ফিরবো দিন দশেক পরে; এসেই আবার রানাঘাটে কয়েক দিন। তারপর আবার কলকাতা এক হপ্তা। আশা করি এই ক'দিনে কেতকী অনেকটা সেরে উঠবে, এবং অন্তত বিয়ের দিনটা তুমি আপিশ যাবে না।'

সোমনাথ মৃদু হাসলো। তারপর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো আংটিটা।

কেতকী খুশি হ'য়ে বললো, 'যা হোক, তোমার পছন্দটা ভালোই, সুবিনয়, ভাগ্যটাও ভালো। তা এত লজ্জা কিসের? যাকে বাঁধবার জন্য তোমার এই ইটার্নিটি রিং, যাও না তার হাতেই পরিয়ে দাও না গিয়ে।' স্বামীর দিকে তাকালো, 'চুপ ক'রে আছো কেন? ওঠো, মিষ্টি-টিষ্টি আনো। আজ তো একটা দিনের মতো দিন।'

'নিশ্চয়ই।' তাড়াতাড়ি উঠলো সোমনাথ, কিন্তু বাধা দিলো সুবিনয়, 'আরে, ওটা আমার। রামদীনকে ডাকো—' কড়কড়ে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করলো সে পকেট থেকে— 'মিষ্টি তো আজ আমি আনবো। বলো কেতকী, কী খাবে? কী-কী খাওয়া তোমার বিধান।'

'আজকের এই সন্ধ্যা আমার বিনা বিধানের, যা খাওয়াবে তাই খাবো।'

'ঠিক আছে।' সুবিনয় নিজেই ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ভেতরের দিকে এলো। দু-বার চ্যাঁচালো রামদীন, রামদীন ব'লে, ঝি-কে দেখতে পেয়ে আস্তে বললো, 'দিদিমণি কোথায়?'

খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে একা চুপচাপ ব'সে ছিলো অরুন্ধতী। বুকটা

কাঁপছিলো তার পায়রার বুকের মতো থরথর ক'রে। ভেতরে-ভেতরে কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রস্তুতি চলছিলো। ব্যাপারটা গড়াতে-গড়াতে এখন যেখানে এসে পৌঁচেছে তারপর আর চুপ ক'রে থাকার কোনো প্রশ্ন নেই। বাইরে থেকে স্থবিনয় বললো, 'আসবো ?'

ব্যস্ত হ'য়ে অরুন্ধতী উঠে এলো দরজার কাছে। 'হ্যাঁ, এই যে, কিছু বলবেন ?'

স্থবিনয় অভিমান-আহত গলায় বললো, 'আমাকে দেখলেই তুমি পালিয়ে যাও কেন বলো তো ?'

এই ধরনের কথা এই নতুন। অরুন্ধতী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো, বললো, 'আমার তো কোনো দরকার থাকে না।'

'তবে এখানে কার জন্যে আসি ?'

'আমার জন্যে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু আমি তো আপনার বন্ধু নই।'

'তুমি তো বন্ধুবান্ধবের অতীত, অরুন্ধতী। শোনো—' এক পা এগোলো সে, 'হাতটা দাও তো, ছাখো তো এ-আংটিটা—'

'না, না!' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দু-পা পিছিয়ে গেলো অরুন্ধতী।

মৃদু হেসে স্থবিনয় বললো, 'কী হ'লো ? এত কিসের লজ্জা ?'

'লজ্জা! না, লজ্জা তো নয়।' অরুন্ধতী বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিতে লাগলো, 'এ-আংটি আপনি কার জন্য এনেছেন ?'

স্থবিনয় ঝাপসা অন্ধকারে অরুন্ধতীর ফর্শা মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হ'লো, একটু অস্বাভাবিক লাগলো তার অরুন্ধতীর কথা বলার ভঙ্গি, আঁৎকে ওঠার তৎপরতা। একটু ভেবে আস্তে বললো, 'তোমার জন্য।'

'আমার জন্য ! কেন ?'

'তা কি তুমি জানো না ?'

'জানি। কিন্তু ও-আংটি আপনি ফিরিয়ে নিন।' অরুন্ধতী প্রায় রুদ্ধস্বর হ'লো।

সুবিনয় তাকিয়ে থেকে বললো, 'কেন ?'

'ও আমি নিতে পারি না। ও হয় না, হ'তে পারে না।'

'কী হয় না ?'

'আপনি যা ভেবেছেন। আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। আমাকে দয়া করুন।'

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে সুবিনয় আস্তে-আস্তে বললো, 'তুমি কি— এই বিয়েতে— রাজি নও ?'

'বিয়ে আমি করবো না, করতে পারি না।'

'কেন ? আমাকে তোমার যথেষ্ট যোগ্য ব'লে মনে হচ্ছে না ?'

'না, সে-সব আমি ভাবি নি।'

'তবে কী জন্যে তোমার এই আপত্তি ?'

'আর কোনো প্রশ্ন করলে আমি তার জবাব দিতে পারবো না। আপনি ক্ষমা করুন আমাকে।'

'ক্ষমার কথা উঠছে না, কিন্তু তোমার এই অভিমতটি তো আমাকে আগে জানানো উচিত ছিলো। এখন আমি যদি বলি তুমি বাগ্‌দত্তা, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।'

'বাগ্‌দত্তা !'

'কেন নয় ? অনেক দিন ধ'রেই তোমার সঙ্গে আমার এই বন্ধন স্থির হ'য়ে আছে, এক কথায় তো সেটা চুকে যাবার নয়।'

ভীত বিবর্ণ মুখে অরুন্ধতী বললো, 'এ-সব আপনি কী বলছেন ?'

'যা ঠিক তা-ই বলছি!'

'আপনি কি জোর করতে পারেন?'

'অনায়াসে। তারপর বিয়ে হ'লে সব মেয়েই ঠিক হ'য়ে যায়।'

অরুন্ধতী চুপ ক'রে একটু ভাবলো, সুবিনয়ের মুখের দিকে তার বড়ো-বড়ো চোখের অপলক দৃষ্টি মেলে রেখে বললো, 'সে-মেয়ে যদি বিবাহিত হয়?'

'কী!'

'কিংবা সে যদি মনে-মনে অন্য মানুষকে স্বামী ব'লে জানে, তবুও?'

'তুমি বলছো কী!'

'আমার কথা তো আপনি কিছু জানেন না। আপনার বন্ধু কেতকীর কাছেও আমি অপরিচিত মানুষই বোধহয়। তা নইলে আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো অংশটাই উনি আপনাকে বলেন নি কেন?'

এবার গুম হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো সুবিনয়। অসহায় চোখে তাকালো চারদিকে। অরুন্ধতীর দিকে তাকালো, তাকিয়েই রইলো। শিথিল গলায় বললো, 'সে কে?'

অরুন্ধতী জবাব দিলো না, পর্দা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো ছবি হ'য়ে। সুবিনয় অপলকে দেখলো তাকে, তারপর আবার ধীরে-ধীরে বললো, 'কে সে?'

অরুন্ধতী হাঁপালো। 'আমায় আর কিছু জিগেস করবেন না।'

'যা বলছো, তবে তা সত্যি?'

'সত্যি।'

'সত্যি তুমি বিবাহিত?'

'আমার মনে আমি তা-ই জানি।'

'ও, তোমার মনে জানো! তাহ'লে তার সাক্ষী নেই কোনো?'

'যাঁরা ছিলেন তাঁরা স্বর্গে। আর সাক্ষী আমি নিজে। কিন্তু এ-সব সাক্ষীসাবুদের আপনার দরকার কী? যে-মেয়ে মনে-মনে অন্য মানুষকে স্বামী ব'লে জানে তাকে নিয়ে আপনি কী করবেন?'

তাই তো। তাকে নিয়ে আর সুবিনয়ের কী হবে? আংটির বাক্সটা হঠাৎ যেন বড়ো ভার হ'য়ে উঠলো পকেটের মধ্যে। তবু সে দাঁড়িয়ে রইলো আরো খানিকক্ষণ। একটা ব্যর্থতার বেদনা ছড়িয়ে পড়লো তার সারা চেহারায়। আস্তে-আস্তে চ'লে গেলো সেখান থেকে। আর অরুন্ধতী দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো তার পরের ঘটনার জন্যে।

কিন্তু না। এ-ঘরে এসে সুবিনয় সে-বিষয়ে কিছুই উচ্চবাচ্য করলো না। সহজভাবেই কথাবার্তা বললো। একটু পরে হঠাৎ একটা জরুরি কাজ মনে পড়ার অছিলায় ভদ্রভাবেই বিদায় নিলো তাড়াতাড়ি।

১২

এ নিয়ে যে সুবিনয় কেতকীর কাছে কিছু বলাবলি করলো না, অন্তত এই মুহূর্তে, তাতে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলো অরুন্ধতী। কিন্তু সেই রাত্রে এক পলকের জন্যও দুই চোখ এক করতে পারলো না সে। একটা সদ্য-ধরা টিয়াপাখি যেমন অবিরাম, অবিশ্রাম আবদ্ধ খাঁচা থেকে বেরোবার জন্য মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করে, তেমনি এ-দেয়াল, ও-দেয়াল ছুটোছুটি করলো। ভেবে-ভেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারলো না এখন সে কী করবে, কোথায় যাবে। আর খোকা! বুকের মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো কথাটা। এই খোকাকে ছেড়েই বা এখন সে থাকবে কেমন ক'রে? প্রেমের মধ্যে থাকে জ্বালা, সেই দহনই অনেক সময়

আত্মসম্মানবোধ মানুষকে অনেক অসম্মান থেকে রক্ষা করে। সোমনাথকে ছেড়ে যাবার জন্য তার যে-ছটফটানি ছিলো, সোমনাথের সুখের সংসারে থেকে তার স্ত্রীর সেবা করার মধ্যে যে-বেদনা ছিলো তা তো কই খোকার বেলায় অনুভব করতে পারছে না। এখানে এই ভালোবাসার কাছে সত্যি যে সে অসহায়, বিপন্ন, বন্দী। স্নেহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার নিম্নগামী স্রোতের জোয়ারে। অথচ এই তো সেদিন ও জন্মালো। আর ওকে প্রথম যখন অপটু হাতে কোলে নিলো অরুন্ধতীর বুকটা যেন হাহাকার ক'রে উঠেছিলো। ও যে সোমনাথের স্ত্রীর ছেলে এই সত্যটুকু মেনে নেওয়ার মধ্যে কতই না যন্ত্রণা ছিলো সেদিন। তারপর কখন হাত নেড়ে, পা নেড়ে, কোলে শুয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে, রাত জাগিয়ে, দিনের অবসর কেড়ে নিয়ে সমস্ত হৃদয় কেড়ে নিলো ও, কে জানে। আর এখন! ও যখন হাসতে শিখেছে মোটা গালে চোখ ডুবিয়ে, কাঁদতে শিখেছে দেখতে না-পেলে, মম্মা ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়তে শিখেছে বুকের উপর তখন, ঠিক তখুনি কি বিদায় নেবার সময় হ'লো তার? এ-ই কি তার ভাগ্য?

এ-ই তার ভাগ্য। এই ভাগ্যের সঙ্গেই সে বাস করছে উনিশ বছর। এ কথা তো মৃত্যুর মতো সত্য যে এই ছেলে তার নয়, এ-সংসার তার নয়। আর সোমনাথ! সোমনাথও তার কেউ নয়, কিছু নয়। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিলেও এখানে এক ফোঁটা অধিকার জন্মাবে না তার। ফুঁপিয়ে উঠে ভেজা মুখ সে বালিশের গভীরে লুকোলো।

সেই রাত্রে কী জানি কেন সোমনাথেরও ঘুম এলো না চোখে। কত কথার ঢেউ আছাড় খেলো বুকের তটে। অদ্ভুত একটা বেদনাবোধ

আচ্ছন্ন করলো হৃদয়-মন। কেন? কিসের এই বেদনা? মনের গভীরে আজ কোন অবচেতন বিদ্রোহ করছে চেতনায় উঠে আসবার জন্য? ঝাপসা-ঝাপসা কী কথা আজ সোমনাথের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে চাইছে? কী সেই কথা, যার জন্যে আজ সে ঘুমুতে পারছে না? জানি, অনেক অশান্তি আছে তার। তিন মাস ধ'রে তার স্ত্রী বিছানায় শুয়ে, ডাক্তারে, ওষুধে, নার্সে অরুন্ধতীর গচ্ছিত ধন নিঃশেষিত। এমনকি তার গয়নার থলিতেও থাবা বসিয়েছে কেতকীর অসুখ। যে-গয়নার থলি তার মা-র নয়, সর্বতোভাবে অরুন্ধতীরই। যে-গয়নার থলিতে পীতাম্বর বাঁড়ুজ্যের হাতে লেখা ফর্দ ছিলো। নাৎনির বিবাহের যৌতুক ব'লে স্বাক্ষরিত চিঠি ছিলো একখানা। ছিলো নাত-জামাইয়ের সোনার বোতাম। যে-বোতামের বুকে এনগ্রেভ করা এস. অক্ষর লেখা ছিলো। একজন নিঃসম্বল অসহায় মেয়ের গচ্ছিত ধন এভাবে নিজের প্রয়োজনে খরচ করা প্রায় অপহরণের লজ্জাই এনে দিয়েছে তার মনে। এর দুঃসহ গ্লানি আমরা জানি। এও জানি এর ভার তার বুকের উপর জগদ্দল পাথর হ'য়ে চেপে ব'সে প্রত্যেক মুহূর্তে তাকে মৃত্যুযন্ত্রণা দিচ্ছে। কিন্তু আজ কি রোজকার মতো সেই সব কথা ভেবেই ব্যথিত হচ্ছে সোমনাথ? কই? না তো। বরং সে-সব প্রাত্যহিক যন্ত্রণার ইতিহাস আজ লুপ্ত তার কাছে। এই মুহূর্তের বেদনার কাছে সেই যন্ত্রণা অনেক ছোটো মনে হচ্ছে তার। তবে কী? তবে যে কী, সে-কথাটা আর সোমনাথ মনের উপরতলায় ভাসতে দিলো না। কেবল চুপ ক'রে চেয়ারে ব'সে তাকিয়ে রইলো অন্ধকার জানলা দিয়ে আকাশের দিকে।

১৩

পরের দিন হঠাৎ মিসেস মুখার্জি এসে হাজির। দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। বললেন, 'কত কাণ্ড ক'রে তবে পাঁচ মাসের ছুটি পেলাম। যাই বলিস, পরের চাকরি করার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। মেয়ে আমার রোগে শুয়ে ধুঁকছে, বলে কিনা ছুটি দেবে না।'

খুশি হ'য়ে কেতকী বললো, 'ভাগ্যিস এসেছো। অরুন্ধতী চ'লে গেলে আমার উপায় ছিলো না। তখন তোমাকে চাকরি ছেড়েও আসতে হ'তো।'

'তা-ই তো।'

আসলে হাসপাতালের কতগুলো জিনিসের চার্জে ছিলেন তিনি, সেগুলো নিয়েই কী গোলমাল করেছেন, ফলে বিনা নোটিশে চাকরি গেছে তাঁর। সে-কথাটা চেপে গেলেন। তার পরের দিন ডিকও এসে হাজির তার ছোটো বাক্স-বিছানা নিয়ে। হস্টেল ছেড়ে দিয়ে এসেছে সে, এখন থেকে এখানে দিদি-জামাইবাবুর কাছেই থাকবে ব'লে। এদিকে ডাক্তার বললেন, 'স্ত্রীকে নিয়ে আপনি ইমিডিএটলি কোনো শুকনো জায়গায় চেঞ্জে চ'লে যান। তা নইলে এ-জ্বর সহজে বন্ধ হবে না।'

মিসেস মুখার্জি তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লেন, 'ঠিক। চেঞ্জে না-গেলে কখনো অসুখ সারে?' তারপর জামাইকে বুদ্ধি দিলেন— 'তুমি এত ভাবছো কেন? রাঁচিতে যাবার ব্যবস্থা করো। চমৎকার শুকনো জায়গা। আমি এখুনি রেভারেণ্ড মণ্ডলকে বা ফাদার জোসেফকে চিঠি লিখে দিতে পারি। ওঁরা ওখানকার সব আটঘাট জানেন। হোটেল চাও হোটেল, বাড়ি চাও বাড়ি, সব ওঁরা ঠিক ক'রে দিতে পারবেন।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমারও যা শরীরের অবস্থা কোথাও বাইরে না-গেলে আর ভালো হবার নয়।'

ডিক নেচে উঠে বললো, 'অল রাইট, জামাইবাবু যদি ছুটি না পান আমিই নিয়ে যাবো সকলকে।'

শীর্ণ হাত স্বামীর কোলের উপর বিছিয়ে দিয়ে কেতকী কাঁদলো, 'তুমি তা-ই করো, আমি আর বিছানায় শুয়ে ভুগতে পারি না।' শুনতে-শুনতে যেন অথৈ জলে হাবুডুবু খেলো সোমনাথ। স্ত্রীর হাতে হাত বুলিয়ে শূন্য চোখে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো। বলতে পারলো না টাকা কই? জিগেস করতে পারলো না, চারমাসের শয্যায় কত টাকা তাকে বিছোতে হয়েছে, সে-কথা কেতকী, বা তার মা কখনো ভেবেছেন কিনা। ভাবলেও সে-টাকা কোথায় পেয়েছে তা জানেন কিনা। কেবল মনে-মনে চিন্তার কুটিল রেখা এই ক'টি কথা আঁকিবুঁকি কাটলো— এতগুলো লোকের সংস্থান একা-একা সে এখন করবে কোথা থেকে! এর পরে আরো ভুগলে কেতকীর চিকিৎসা করাবে কী দিয়ে, ছোটো একটা শিশুর অনেক বড়ো দায়িত্বই বা পালন করবে কেমন ক'রে? আর অরুন্ধতী! তার কথাটাই কি খুব ভাববার অযোগ্য?

যে-ক'টি টাকা মাইনে পায় ব্যাগসুদ্ধু এনে ফেলে দেয় অরুন্ধতীর কাছে, সোমনাথ জানে না, বুঝতে পারে না কী ক'রে চালিয়ে নেয় সে। আগে, যখন তারা মাত্র দুটি প্রাণী ছিলো, অসুখ ছিলো না, ওষুধ ছিলো না, বাচ্চা ছিলো না, বাচ্চার দাই ছিলো না, তখনো তো কত টানাটানি গেছে মাসের শেষে। টুকটাক ধার করতে হয়েছে এর ওর কাছে, আবার শোধ দিতে গিয়ে টান পড়েছে পরের মাসে। অথচ এখনো তো তাতেই চ'লে যায়। কষ্টও হয় না কিছু।

কেতকীর অসুখের পরে, মনে আছে তার, মিসেস মুখার্জিই চালিয়েছিলেন সংসার। মাইনে শেষ হ'তে তার ঠিক তেরো দিন লেগেছিলো।

অরুন্ধতীর টাকা ছিলো তখন হাতে, কষ্ট হয় নি। যত লাগে নাও, যত খুশি খরচ করো। আর তার পরে তিনি চ'লে গেলে সে-ই দিতো রামদীনকে। কতবার দিতো তাও যেমন মনে থাকতো না, কত দিতো তাও তেমনি ভুলে যেতো। একটা অব্যবস্থার অরণ্যে কেবল পথ হাৎড়ানো। আর সেই ভুলের সুযোগে রামদীন তার দু-হাতকে দশ হাত বানালো। কয়লা থাকতে কয়লা, তেল থাকতে তেল, চিনি থাকতে চিনি, চা থাকতে চা, সংসারের যাবতীয় খরচের উপর ভারি হাতে লাঙল চষতে লাগলো সে। তারপর একদিন দরজার আধো-আড়ালে দাঁড়ালো অরুন্ধতী। 'একটা কথা।'

'বলুন।'

'সমস্ত দিনে রামদীনকে কত দেয়া হয়, আর কী জন্যে দেয়া হয় সেটা আমার জানা দরকার।'

'ও, তাই তো।' উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করলো সোমনাথ, 'আমার তো ঠিক মনে থাকে না—'

'তা নইলে আমার হিসেব নিতে অসুবিধে হয়, রামদীন ঠিক কথা বলে না।'

'হিসেব? আপনি হিসেব নেন নাকি রোজ?' মনে পড়লো রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া মিটে যাবার পরেও রামদীনের সঙ্গে আলো জ্বালিয়ে অরুন্ধতীর আরো অনেকক্ষণ কী কথা চলে। লক্ষ্য করেছে সোমনাথ। ভেবেছে হয়তো পরের দিনের কাজকর্মের নির্দেশ দিচ্ছে কোনো। কৌতূহল হবার কথা নয়। কিন্তু আজ বোঝা গেলো সেই নীরব মুহূর্ত-গুলিতে অরুন্ধতী সোমনাথের ভুলের মাশুল গোনে।

'কাল থেকে কী লাগবে না লাগবে আমি তার চিরকুট লিখে দেবো, আপনি শুধু জানাবেন কত টাকা ওকে দিলেন।' চোখ তুললো না

অরুন্ধতী, একটু স'রে এসে একখানা শাদা হাত টেবিলের উপর রাখলো;
'ও আমাকে যে-হিসেব দিয়েছে তা থেকে এটা বেঁচেছে।'

আঠারো টাকা সাত আনা দু-পয়সা।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অরুন্ধতীর নিচু-করা মুখের উপর চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো সোমনাথ। কিছু বললো না। কেবল আপিশে যাবার সময়ে কালো ব্যাগটা খাবার টেবিলের উপর রেখে বললো, 'এই যে—'

মশলা দিতে এসে অরুন্ধতী মুখ তুললো অবাক হ'য়ে। সোমনাথ বললো, 'কী আছে জানি না, ক'দিন চলবে তা-ও জানি না। রইলো।'

'এটা দিয়ে আমি কী করবো?'

'আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেবেন। আমি এ-সব পারি না।'

অরুন্ধতীর চকিত দৃষ্টি কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হ'লো সোমনাথের মুখের উপর, তারপর হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিলো সে। পরের মাস থেকে আর একবারও হোঁচট খায় নি সোমনাথ, অন্তত সংসারের অনটন চুকেছে তার। কিন্তু তার বাইরে আছে প্রত্যহের ডাক্তার-খরচ, বড়ো-বড়ো অঙ্কের ওষুধ, আজ এই টনিক, কাল সেটা বদলে আরেকটা। আছে ইনজেকসন, আছে পথ্য। দুধ, ফল— কী না? সেগুলো জোগাতেই প্রাণান্ত। যা দিয়ে এতদিন চলছিলো তা তো কবেই তলানিতে ঠেকেছে, শেষে কি ওর গয়নাগুলো সব বেচবে সোমনাথ? ছি! তার চেয়ে মৃত্যুও ভালো।

দেখতে-দেখতে তার আড়াইখানা ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাটটা যেন একেবারে ঠাসাঠাসিতে, ঘেঁষাঘেঁষিতে, বলাবলিতে একটা হাটের মতো হ'য়ে গেলো।

মিসেস মুখার্জি গুছিয়ে নিলেন সব। বসবার ঘরে দেয়ালের পাশে

ক্যাম্পখাট পড়লো রাত্তিরে ডিকের শোবার জন্যে। আর অরুন্ধতীর ঘরটা হ'লো তার পড়বার। দিনের বেলায় মা আর ছেলে সেই ঘরেই থাকে, দিবানিদ্রা দেয়। আর অরুন্ধতী কাজকর্ম সেরে খাবার ঘরেই ব'সে থাকে চুপচাপ। খোকা থাকে কাছে, সময় কেটে যায়। রাত্তিরে অবিশ্যি শোয় গিয়ে নিজের ঘরে। খাটে মিসেস মুখার্জি, মেঝেতে অরুন্ধতী। কেতকী জিগেস করে, 'অরুন্ধতী, দিনের বেলা তুমি অমন ছটফটিয়ে ঘুরে বেড়াও কেন আজকাল? শুলেই পারো একটু।'

অরুন্ধতী তার মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে হাসে, বলতে পারে না কেতকীর বাড়িতে আর জায়গা নেই তার।

'খোকার জন্যই তোমার বিশ্রাম হয় না। ঝি-টা করে কী?'

'ও তো সবই করে। খোকাই যেতে চায় না ওর কাছে।'

'পাজি ছেলে। তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছেই বা যেতে চায়?' স্নেহে বিগলিত হ'য়ে ওঠে কেতকীর কণ্ঠস্বর। একটি নরম করুণ হাসি ছড়িয়ে পড়ে অরুন্ধতীর মুখে।

মিসেস মুখার্জি শুধু যে তার একফোঁটা নিরিবিলি বিশ্রামের জায়গাটুকুই কেড়ে নিলেন তাই নয়, সংসারের ভারও তুলে নিলেন হাতে। কালো রঙের মোটা মনিব্যাগটা ট্র্যাঙ্কে ভ'রে রাখতে-রাখতে বললেন, 'ছেলে-মানুষ স্বাধীনভাবে এবার ঘুরে-ফিরে বেড়াও। এ-সব ঝক্কি পোয়ানো কি সোজা?' মেয়েকে বললেন, 'তোমাদের আবার সবটাতেই বাড়াবাড়ি, হাজার হোক বাইরের মানুষ, আজ আছে কাল নেই। একেবারে সর্বস্ব দিয়ে ব'সে থাকার দরকারটা কী?'

একটা বই পড়তে-পড়তে চোখ না-তুলেই কেতকী বললো, 'যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তো ওর ওপরেই সব দায়িত্ব।'

'তাই ব'লে মাইনের টাকাটা এনে ওর কাছে দেবে?'

'মাইনের টাকা ?' মুখ ফেরালো কেতকী— 'মাইনের টাকা দেরাজেই থাকে।'

'তাহ'লে তো তুমি সবই জানো দেখছি।'

'কেন, কী জানি না ?'

'কী আবার। আমি এসে তো তবে ব্যাগটা নিয়ে নিলুম। তুই না-হয় শুয়েই আছিস, কথা তো বলতে পারিস। হিসেব-নিকেশটা তো নিতে পারিস ?'

'ওরে বাবা, ও-সবের মধ্যে আমি নেই।' কেতকী আবার তার অর্ধ-সমাপ্ত উপন্যাসে মনোযোগ দিলো। আর মেয়ের নির্বুদ্ধিতায় হতবাক হলেন মা।

১৪

অরুন্ধতীর গৃহস্থালি ছিলো সোমনাথকে কেন্দ্র ক'রে, সোমনাথকে ঘিরে-ঘিরেই ছিলো তার সব ব্যবস্থা। এ-কাজে তার আলস্য ছিলো না, অবহেলা ছিলো না, সোমনাথের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছেটিও সে আপ্রাণ চেষ্টায় প্রতিপালন করতো। সমস্ত হৃদয়-মন তার ঐ একটি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই সমর্পিত ছিলো। নিজের শোবার ঘরের দেয়াল-তাকে তার ছোট্ট ভাঁড়ার ঘর, একটি জিনিস তার অপচয় হ'তে পারতো না, রামদীনের উপর নির্ভর ক'রে একদিনও সে অমনোযোগী হ'তো না। সে জানতো সোমনাথের যা আছে তা-ই আছে। তারই মধ্যে চলতে না-পারলে কষ্ট হবে তার, উদ্বেগ হবে। সেই উদ্বেগ আর সে কেমন ক'রে মুছে নিতে পারে, যদি না যথেষ্ট বুঝে চলে ?

কিন্তু মিসেস মুখার্জির সে-হৃদয় ছিলো না। জামাইয়ের ওপর মাতৃত্ব-

বোধ তাঁর প্রবল নয়, বরং এই সামাজিক খ্যাতিহীন নিরীহ হিন্দু যুবকটির বিরুদ্ধে একটি নালিশের কাঁটাই খচখচ করছিলো তাঁর মনের মধ্যে। ধর্মের বৈষম্যটা মাঝখানে খড়্গ হ'য়ে ঝুলছিলো। খাওয়া-দাওয়া হালচাল কোনো-কিছুতেই তিনি তাই সোমনাথের পছন্দটাকেই একমাত্র ব'লে ভাবতে পারলেন না। কিংবা কী তার পছন্দ সে-বিষয়েই মন দিলেন না। তাঁর কেন্দ্র হ'লো ছেলে ডিক কিংবা তিনি নিজে। তাঁদের পছন্দ মতোই চলতে লাগলো সব। যেমন সোমনাথ সময়ে-অসময়ে এক কাপ চা পেলে খুশি হ'য়ে ওঠে, ডিক তেমনি গ্লাশ-ভর্তি দুধ খায়। অতএব চা কমলো, দুধের বিল ভারি হ'লো। সোমনাথের প্রচুর মাছ না-হ'লে ভাত রোচে না, মিসেস মুখার্জি বা ডিকের রোজ মাংস চাই। অতএব এতদিনকার ছোটোমাছের চচ্চড়ি, ইলিশ মাছের পাতুরি, কই মাছের তেল-ঝোল, বড়া ভাজা, পাতা ভাজা, রান্নার স্বাদবৈচিত্র্যের সব অপূর্ব বিন্যাস আর খুঁটিনাটি তা-ও গেলো। তাছাড়া মিসেস মুখার্জির রাত সাড়ে-আটটার সময় খাওয়া অভ্যাস, নইলে হজম হয় না তাঁর, ডিকের ঘুম পায়। অথচ সোমনাথ রাত দশটার আগে জীবনে খেতে বসে নি। একদিন অরুন্ধতী বলেছিলো, 'ওঁর যখন তা-ই অভ্যেস, আপনি খেয়ে নিন না, আমি তো আছি।' তৎক্ষণাৎ চোখ টান ক'রে মিসেস মুখার্জি জবাব দিলেন, 'সে তো রামদীনও আছে।' লাল হ'য়ে গেলো অরুন্ধতী।

এই সব বিরোধে শুধু যে অসুবিধেটাই প্রবল হ'য়ে উঠলো সংসারে তা নয়, অশান্তি আর খরচের অঙ্কটাও বেড়ে গেলো হুহু ক'রে। অতএব তিরিশ দিনের খরচ পনেরো দিনে ফুরিয়ে ফেলে জামাইয়ের কাছে আবার যখন হাত পাতলেন কেতকীর মা, সোমনাথ প্রায় মাথায় হাত দিলো। 'টাকা?' চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে হাত থেমে গেলো তার,

'টাকা তো নেই।' রুটিতে মাখন লাগাতে-লাগাতে অরুন্ধতী মুখ তুললো একবার। মিসেস মুখার্জি মিষ্টি ক'রে হাসলেন। 'আমি কী এখুনি চাইছি। মনে করিয়ে দিলাম, আপিশ থেকে আসবার সময় নিয়ে এসো।' আপিশে গেলেই যে টাকা পাওয়া যায় এ-খবর ভদ্রমহিলা কার কাছে শুনলেন সোমনাথ জানে না। একটু চুপ ক'রে থেকে নিষ্প্রভ গলায় বললো, 'মাইনের সব টাকাই তো ওর মধ্যে ছিলো। আপিশে আর টাকা আমি পাবো কোথায়?'

'তবে কি তুমি বলতে চাও এ-টাকাতেই তোমার সারা মাস চলে?'

'তাই তো চলে।'

'হবে।' মুখ এতখানি ভার করলেন মিসেস মুখার্জি। হয়তো সোমনাথের কথা তিনি বিশ্বাস করলেন না। দুমদাম উঠে গিয়ে শূন্য ব্যাগটা এনে ফেলে দিলেন টেবিলে, 'তাহ'লে তোমরাই চালাও।'

'তা তো চালাবো কিন্তু মাসের যে এখনো ঢের বাকি। এখন চলবে কী দিয়ে?'

কোনো-কিছু নিয়ে কিছু বলাই সোমনাথের অভ্যাসবিরুদ্ধ, এটাই তার স্বভাব। আর এ-বিষয়ে কী বলবে? কাকেই বা বলবে? বললেও যাকে বলা যায় সে তার স্ত্রী। কিন্তু সে তো বিছানায়, ওইটুকই তার পরিমণ্ডল। তার উপর ভুগে-ভুগে খিটখিটে হ'য়ে গেছে। এরই মধ্যে মাকে, ভাইকে দেখে কোথায় যেন একটা আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে সারা চেহারায়, সেখানে তার মা-র গৃহিণীপনার বিরুদ্ধে কিছু ব'লে আর তাকে অশান্ত ক'রে লাভ কী? আর তার মা-র বিরুদ্ধে কিছু বলা মানেই অরুন্ধতীর সপক্ষে বলা। মা-র বিরুদ্ধে নালিশটা সইতে পারলেও অরুন্ধতীর পক্ষ নেয়াটা যে কেতকী কী ভাবে নেবে সেটাই বুঝতে

পারছিলো না সোমনাথ। লক্ষ্য করছিলো কয়েকদিন যাবৎ আবার যেন মেঘের ভার নেমেছে তার মুখে। অবিশ্যি সোমনাথের নিজের মনেও কি কোনো মেঘ জমে নি স্ত্রীর বিরুদ্ধে? জমেছে। বারে-বারেই মনে হয়েছে— এ-সব তাকে বলতেই বা হবে কেন আমার? শুয়েই থাক, যা-ই থাক, উদ্বেগ থাকলে, আগ্রহ থাকলে, সে জানতে পারতো না সব? এ-কথা ভেবে সোমনাথ ব্যথিত না-হ'য়ে পারে না যে আর কিছু না হোক, সংসারের হাল-চাল না-হয় সে না-ই জানলো, দেখলো, খরচ-পত্রের বিষয় তো জিগেস করতে পারে কিছু? সোমনাথের অবস্থা সে জানে, তার কত মাইনে, কী ভাবে চলে সবই তার জানা, অথচ এত বড়ো অসুখের খরচ, এত বড়ো সংসারের ভার সে যে কী ভাবে বহন করছে এক দিনও তো তা-ই নিয়ে কেতকী কোনো দুর্ভাবনা দেখালো না, সমবেদনা জানালো না। সংসারের এই দুঃখের দিকটাতে তারও তো কিছু অংশ আছে। না কি এই ভাবনা-চিন্তাগুলো একা সোমনাথেরই? সেই অভিমানে আরো নিঃশব্দ হয়েছিলো সোমনাথ। তিক্ত হ'য়ে, ত্যক্ত হ'য়ে একাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো অসার সংসারের ঘূর্ণ্যমান চাকার তলায়। ভেতরে-ভেতরে কেবল একটা অসহায় রাগ আর বিরক্তি আর নালিশ মাথা খুঁড়ে মরছিলো অবিরত।

সেদিন রাত্রে সে আর না-ব'লে পারলো না। 'তোমার মা যে-রেটে খরচ করেন আমার পক্ষে তো চালানো দায়।' কথাটা এতক্ষণেও কি শোনে নি কেতকী? বরং মা-র কাছে অনেক রং চড়িয়ে শুনে থেকে তাই নিয়ে তার নিজেরই মনে স্বামীর বিরুদ্ধে একটি নালিশ জমা হচ্ছিলো এতক্ষণ। বেশ রাগ-ভাবেই জবাব দিলো, 'যিনি চালালে চলে, তাঁর হাতেই তো মা দিয়ে দিয়েছেন, আবার দুঃখ কিসের?'

'দুঃখ-বেদনার কথা আমি বলতে আসি নি তোমাকে।' সোমনাথের

গলায়ও রাগ ফুটলো। 'তুমি যে তা শুনতে ভালো বাসো না তা আমি জানি, কিন্তু কথাটা হচ্ছে বাড়িটা আমার, আমার সুবিধে-অসুবিধেটাও নেহাৎ তুচ্ছ নয় এখানে।'

'তা তো নিশ্চয়ই। অস্থায়ী হ'লেও খেলাটা তো মন্দ চলছিলো না, আমি বলি কি, এ-সবের আর দরকার কী? আঁচলে তো চাবি বেঁধেইছে, গৃহিণীপদটিও এবার পুরুৎ ডেকে পাকা ক'রে নাও।'

'তুমি অত্যন্ত অন্যায় কথা বলছো, কেতকী।'

কেতকী পাশ ফিরে শুলো, 'ন্যায়-অন্যায়ের বোধ যে কার কতটা তা তো বুঝতে পারছি না। যাক গে, তর্ক ক'রে লাভ নেই। ঘুমোও।'

সোমনাথের যে কী খারাপ লাগলো, কী নিষ্ঠুর লাগলো কেতকীর ব্যবহারটা বলা যায় না। অনেকটা সময় ছটফট ক'রে কাটলো তার। তারপর বলবার মতো অনেকগুলো কথা মনে-মনে সাজিয়ে যখন আবার স্ত্রীকে ডাকলো তখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরের দিন সকালে উঠে কেউ কারো সঙ্গে আর কথা বললো না। সময়ের অনেক আগেই, রান্না না-নামতেই না-খেয়ে সেদিন আপিশে চ'লে গেলো সোমনাথ আর অরুন্ধতী ছটফট করলো এ-ঘর ও-ঘর। দুপুরবেলা তার নিজের খাদ্যও মুখে রুচলো না। আর বিকেলে মিসেস মুখার্জির হাজার ভ্রূকুটি সত্ত্বেও অস্থির হ'য়ে খাবার তৈরি করলো নানারকম, আর সন্ধেবেলা রামদীনকে দিয়ে আলাদা টাটকা মাছ আনিয়ে রান্না করলো ব'সে-ব'সে। জল বসানোই ছিলো, সোমনাথ আসা মাত্রই অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি গেলো চা তৈরি করতে।

ভুরু কুঁচকে মিসেস মুখার্জি বললেন, 'এতে বুঝি তোমাদের পয়সা খরচ হয় না?' অরুন্ধতী চুপ ক'রে রইলো। কেতকী ডেকে বললো, 'অরুন্ধতী, শোনো।' গলার স্বর তার রীতিমতো কঠোর, 'তুমি আমার

সংসারের জন্যে অনেক করেছো, আমার সন্তানের জন্যেও অনেক করেছো কিন্তু তাতেই তোমার এ-অধিকার জন্মায় নি যে আমার মাকে অগ্রাহ্য ক'রে তুমি নিজে কিছু করতে পারো এখানে!'

অবাক হ'য়ে অরুন্ধতী বললো, 'আমি কী করেছি?'

কেতকী বললো, 'তুমি এটা মনে করলেই আমি খুশি হবো যে এ-বাড়ির দায়িত্ব যতটা তোমার, আমার মা-র তার চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর জামাই বা নাতি সম্বন্ধে তোমার উদ্বেগের চাইতে তাঁর উদ্বেগ কিছু কম নয়। তাঁকে তাঁর ধারণা-মতোই সংসার চালাতে দিয়ো।'

অরুন্ধতী স্তব্ধ হ'য়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর বাইরে এসে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে রইলো তারা-ভরা আকাশের দিকে।

ভালোই হ'লো। এর পরে মনস্থির করা সহজ হ'লো অরুন্ধতীর পক্ষে। বুক থেকে খোকাকে ছিনিয়ে, মনকে শক্ত করা সম্ভব হ'লো। শেষে কোনো সকালের এক নির্জন অবকাশে সোমনাথের কাছে এসে দাঁড়ালো সে।

'এবার আমি যাবো।'

'যাবেন? কোথায়?' খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললো সোমনাথ।

'দেশে যাওয়াই স্থির করলাম।'

'দেশে কেন?' সোমনাথ অবাক না-হ'য়ে পারলো না।

বর্ষায় নিটোল হ'য়ে ফুটে-ওঠা বেলকুঁড়ির মতো ফোলা সদ্য-ঘুম-ভাঙা মুখে এক ফোঁটা হাসি ছড়ালো অরুন্ধতী, 'এখানে যখন কিছু হ'লোই না—'

'বিশেষ কোনো দরকার আছে কি সেখানে?'

'দরকার আর কী? ওটাই তো আমার বাড়ি।'

'কেউ নেই সেখানে। হ'লোই বা বাড়ি।'

'তবে কোথায় যাবো ?'

'কেন ?' সোমনাথ অবহিত হ'লো, 'সুবিনয় তো খুব সম্ভব দু-চার দিনের মধ্যেই—'

অরুন্ধতী বাধা দিলো— 'তিনি আসুন বা না আসুন, তাঁর সঙ্গে আমার কী ?'

শীতের সকাল। তখনো সারা বাড়ি ঘুমে নিঝুম। কেউ অত ভোরে লেপ ছেড়ে ওঠে না এ-বাড়ির। কেবল ওঠে অরুন্ধতী, আর এক কাপ চায়ের অভ্যাসে সোমনাথ। কখনো বাইরে এসে টেবিলে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে-বুলোতে চুমুক দেয়, কখনো ঘরে নিয়ে যায়। অরুন্ধতীর মুখের উপর চোখ রাখলো সে। 'আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'কাজ না-পেলে আমি তো এতদিন দেশেই থাকতাম ? কাজ পেয়েছিলাম ব'লেই আসতে হ'লো। এখন যখন আবার কাজ গেছে তখন সেখানেই ফিরে যাই।'

'আর সুবিনয় ?'

অরুন্ধতীর মুখ লালচে দেখালো। 'বারে-বারে তাঁর কথা তুলছেন কেন ? তিনি আপনাদের বন্ধু, আমি কতটুকু চিনি তাঁকে ? আমার দেশে যাওয়া না-যাওয়ার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ?'

'আপনাদের বিয়ে—'

'না।'

'কী না ?'

'যা বলবার আমি বলেছি তাঁকে,' অরুন্ধতী দরজার ভর থেকে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। 'তিনি সজ্জন, ভদ্র, তিনি বুঝেছেন একজন মেয়ের পক্ষে দু-বার বিয়ে করা খুব স্বাভাবিক নয়।'

'তু-বার !' যেন বাজ পড়লো ঘরে।

অরুন্ধতী সোমনাথের চোখে চোখ রাখলো, 'অন্তত যতদিন পর্যন্ত তাকে ভোলা না যায়।' একটা স্তম্ভিত বেদনা ফেটে গেলো মুহূর্তে। অরুন্ধতী নামিয়ে নিলো চোখ, সোমনাথের চোখের তলায় খবরের কাগজের অক্ষরগুলো হঠাৎ বড়ো ঝাপসা ঠেকলো।

সেই বিকেলেই যখন হলদে রোদ লাল ছুঁয়েছে, সোমনাথের উত্তর-মুখো-ফ্ল্যাটে তির্যক রেখায় তার ছায়া পড়েছে লম্বা হ'য়ে, খোকাকে পরিষ্কার ক'রে পাউডার কাজলে সাজিয়ে, জামা টুপি পরিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে নিজের চুলে চিরুনি চালাচ্ছে অরুন্ধতী, তখন কেতকী ডেকে পাঠালো তাকে। অরুন্ধতী নিজেই তার যাবার কথাটা তুলতে সারাদিন সুযোগ খুঁজেছে, কিন্তু পারে নি। ভালোই হ'লো তার ডাক পেয়ে। কী জানি কেন, কেমন আতঙ্কই হচ্ছিলো তার আসতে। সে বুঝতে পারছিলো না বিয়ে না-ক'রে সহসা তার দেশে যাবার এই প্রস্তাবটিকে কেতকী কী ভাবে নেবে। মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমাকে ডেকেছেন ?'

আধো শোয়া হ'য়ে উঠে বসেছে কেতকী। মুখ থমথমে। বললো, 'হ্যাঁ। বোসো।'

কয়েকদিন থেকে কেতকীর মেজাজ ভালো চলছিলো না, তাই তার গম্ভীর আওয়াজে কিছু মনে করলো না অরুন্ধতী। নরম গলায় বললো, 'কিছু বলবেন ?'

'সুবিনয়কে তুমি কী বলেছো ?'

ধ্বক ক'রে উঠলো বুকটা। এতক্ষণে সে লক্ষ্য করলো কেতকীর হাতের মুঠোয় একখানা নীল রঙের খাম। কুণ্ঠিত হ'য়ে বললো, 'তিনি কি আপনাকে সে-বিষয়ে কিছু লিখেছেন ?'

'তুমি তাকে বিয়েতে অসম্মতি জানিয়েছো ?'

অরুন্ধতী মাথা নিচু করলো।

'কেন ?' কেতকীর কঠিন গলা চ'ড়ে উঠলো অসহিষ্ণু হ'য়ে।

অরুন্ধতী চুপ।

'আর সে-কথা তুমি আমাকে জানাও নি কেন ?'

'আপনি তো জানতেন।'

'কী ? কী জানতাম ? তুমি কখনো বলেছো ?'

বড়ো-বড়ো চোখ তুলে কেতকীর মুখের দিকে তাকালো অরুন্ধতী, 'উচ্চারণ ক'রে না-বললেই কি বলা হয় না ?'

'ওঃ। কথা শিখেছো খুব!' কেতকীর হাতের মুঠো শক্ত হ'লো। 'কেন ? বিয়ে করতে তোমার আপত্তিটা কিসের। সুবিনয়ের চাইতে উপযুক্ত ছেলে আর তুমি কোথায় পাবে শুনি ?'

অরুন্ধতী চুপ।

'তোমার আসল মৎলবটা কী বলো না খুলে।'

'মৎলব ?'

'তা নয় তো কী! গলগ্রহ হ'য়ে এসে উঠেছো, খেতে দিয়েছি, পরতে দিয়েছি, সসম্মানে থাকতে দিয়েছি তারই এখন প্রতিশোধ নিচ্ছো ব'সে-ব'সে— এই তো ?'

'আপনি এ-সব কী বলছেন ?' অরুন্ধতীর ব্যথিত গলায় যেন কান্না ভাসলো।

'তা আমিও বলি বাছা,' মিসেস মুখার্জি ডিকের জন্য তিন-কাঁটার মোজা বুনছিলেন চেয়ারে ব'সে, এবার মন্তব্য ছাড়লেন একটি, 'এত নাচানাচি ক'রে, ছেলেটাকে নানাভাবে মজিয়ে কত ক্ষতি ক'রে শেষে কি "না" ব'লে হাত গুটোলেই হ'লো ?'

ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো অরুন্ধতীর কান দুটো। শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো দাঁতে দাঁত চেপে।

কেতকী তীব্র স্বরে বললো, 'আর বিয়ে যদি করবেই না জানো, তবে এতদিন ধ'রে প'ড়ে রয়েছো কেন এখানে?'

'আপনার অসুখের জন্যই থাকতে হয়েছে আমাকে। তা নইলে—'

'তা নইলে আরেক ছুতোয় থাকতে। তোমাদের তো আর ছলের অভাব হয় না। আমার অসুখ ক'রে যে তোমার খুব সুবিধে হয়েছে তা আমি জানি।'

'সুবিধে!' অরুন্ধতীর গলা কাঁপলো।

'কিন্তু শোনো, যা আমি স্থির করেছি— তা স্থির। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।'

'করতেই হবে?'

'করতেই হবে। তোমাদের মতো সব অশিক্ষিত গাঁয়ের মেয়েরা চুপ ক'রে থেকে-থেকে যে মানুষের কত বড়ো সর্বনাশ করতে পারে তা ভালোভাবেই টের পেয়েছি আমি।'

আকর্ণ লাল হ'য়ে উঠলো অরুন্ধতী। মুখটা কঠিন হ'য়ে গেলো। সোজা চোখ তুলে তাকিয়ে বললো, 'সর্বনাশ কাকে বলে আপনি কি তা জানেন?'

তার দৃষ্টির ভঙ্গিতে, চিরনম্র গলার কাঠিন্যে ঈষৎ চকিত হ'লো কেতকী। পরমুহূর্তেই গ'র্জে বললো, 'জানি, খুব ভালো ক'রে জানি।'

'তাহ'লে মনে-মনে ভেবে দেখুন না নিজে সুখী হবার জন্যে একদিন আপনি যা-যা করেছিলেন তা যদি আমি করি তাহ'লে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়ায়?'

'অরুন্ধতী!'

'কেন, সুখ কী আপনার একলার? সুখী হ'তে কী অন্য মানুষের ইচ্ছে করে না! কিন্তু কারো ক্ষতি ক'রে যে-সুখ সে-সুখে আমার রুচি নেই, তাই—'

'তোমার এত সাহস? তুমি এত অসভ্য? এত উদ্ধত? তুমি আমার মুখে-মুখে বলতে পারছো এ-কথা? আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে?' রাগে কেতকীর চোখে আগুন বেরুলো। অরুন্ধতী তার জবাবে কী বলতে গিয়ে থেমে গেলো হঠাৎ। চোখে চোখ রেখে সোমনাথও থমকালো দরজায়। এইমাত্র আপিশ থেকে ফিরেছে সে।

১৫

আজকের বিকেলটি বড়ো সুন্দর ছিলো। বড়ো ভালো লাগছিলো আজ সোমনাথের। কতকাল পরে মাত্র এই আজই তার মনে হয়েছিলো পৃথিবীটা তো বেশ। সুখে-দুঃখে বেঁচে থাকাটা নেহাৎ মন্দ কী এখানে? নরম হাওয়া-ভরা লাল বিকেল দেখতে-দেখতে এই কথাটাই ভাবছিলো সোমনাথ। আসলে বিকেল দেখলো সে অনেক দিন পরে। আপিশে ওভারটাইম খেটে সে যখন গড়ের মাঠের বুক চিরে ভিড়াক্রান্ত ট্রামের রড ধ'রে ঝুলতে-ঝুলতে বাড়ি ফেরে, তখন বিকেল থাকে না। রীতিমতো রাত্রি নামে শহরের বুকে। অপরিসীম ক্লান্ত শরীরে বোবা চোখে বাইরে তাকালে শুধু অগণিত জনস্রোত, চৌরঙ্গির উজ্জ্বল দোকানের সারি চোখ-টিপটিপ জোনাকির মতো নেভা-জ্বলা রাশি-রাশি বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপন। আর-কিছু না। আর বাড়িতেই বা কী আশা? কেতকী তার জ্বরতপ্ত লালচে মুখ নিয়ে শুয়ে থাকে বিছানায়, কেতকীর মা জিগেস করেন, 'রাত তো হ'য়ে গেছে। চা কি আর খাবে? না কি হাত মুখ

ধুয়ে একেবারে খেয়েই নেবে।' আর ডিক এসে দাঁড়ায় হাসিমুখে, 'জামাইবাবু, অস্ট্রেলিয়া আজ যা খেললো, ওঃ। সত্যি, ক্রিকেটে ওরা ওঅর্ল্ড বেস্ট।' আর অরুন্ধতী! সে কোথায় থাকে? কোন সুদূরে? মনে পড়লো না আজ ছাড়া কত দিনের মধ্যেও একবার তাকে দেখতে পেয়েছে কিনা। দেখতে তাকে আগেও কমই পাওয়া যেতো। এইটুকু বাড়ির মধ্যেই সে যে কোথায় নিজেকে নিয়ে মিশে থাকে কে জানে। তবু আপিশ থেকে ফিরলে তার চঞ্চল হ'য়ে ওঠা, ব্যস্ত-ব্যাকুল ভঙ্গি, নিঃশব্দ অথচ উত্তপ্ত অভ্যর্থনা, কাছে দাঁড়িয়ে নম্র নত মুখে চা ঢেলে দেয়া— এ-সব তো ছিলো? এখন আর কী? কেবল টাকার চিন্তা, কেবল উপার্জনের ক্লান্তি।

আজ অনেক আগেই বেরিয়েছিলো আপিশ থেকে। আর এতকাল পরে বিকেলের দিকে তাকিয়ে মনটা যেন ভালো লাগায় ভ'রে গিয়েছিলো। চুলে হাওয়ার আঙুল বুলিয়ে, চারদিকে কচি-কচি সবুজ পাতায় আলোর নাচন তুলে বিশ্বপ্রকৃতি রোমাঞ্চিত করেছিলো তাকে। বসন্ত। আসলে বসন্ত আসছে। আকাশে বাতাসে তারই গান। তারই সুর। 'রোদনভরা এ-বসন্ত' —চলতে-চলতে সহসা এই গানটা মনে প'ড়ে গেলো তার, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে গেলো ঠিক এই রকম সময়টাতেই তার বাবার মৃত্যুর তারিখ। তরঙ্গিণী এ-সময়টায় তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতেন সারাদিন উপোস থেকে। কতদিন পরে মনে পড়লো কথাটা। তার সঙ্গে তার বাবার জীবন বা মৃত্যুর কতটুকুই বা সম্বন্ধ ছিলো, বড়ো হ'য়ে কলকাতায় পড়তে আসবার পর থেকেই ভুলে গিয়েছিলো তারিখটা, মাসটা। দেশে থাকতে মনে পড়ার কারণ ছিলেন তার মা, তিনি এই সর্বনাশা তারিখটাকে ভুলতে পারতেন না, বোধহয় একটু কাঁদবার অবকাশের জন্যই— রান্না-খাওয়া বাদ দিয়ে ব'সে থাকতেন চুপচাপ,

যাঁকে প্রায় ভুলে এসেছেন চেষ্টা করতেন তাঁকে মনে আনতে। আর তাই দেখে-দেখে সোমনাথও বুঝতো যে শুধু মা-ই নয়, বাবা নামেও একজন মানুষ ছিলেন তার জীবনে, যিনি ঠিক তার মা-র মতোই আপন।

কলকাতা শহর। যাকে বলে নগর। এখানে সময় নেই, অসময় নেই, সকলেই উর্ধ্বশ্বাস। কিন্তু আজ সোমনাথ ব'য়ে যেতে দিলো সময়। কার্জন পার্কের ভেতর দিয়ে ধীরে-ধীরে হেঁটে এলো এসপ্ল্যানেডে; ভিড় ব'লে ছেড়ে দিলো গোটা দুই ট্রাম, তারপর অতি শান্ত মনে একটি ফাঁকা ট্রামে চ'ড়ে ব'সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো চারদিকে। অদ্ভুত মধুর এক ভালো-লাগায় ভ'রে থাকলো মন। কিন্তু বাড়ি ফিরে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েই অরুন্ধতীর জলভরা মেঘের মতো কাজল-কালো চোখের উপর চোখ রেখে না-থমকে পারলো না সে। স্ত্রীর কথাগুলোও কানে গিয়েছিলো তার। দু-পা ঘরে ঢুকে বললো, 'কী হয়েছে?'

মিসেস মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন জামাইকে দেখে, আর কেতকী মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আপাদমস্তক জ্ব'লে উঠলো। আহত সাপের মতো গ'র্জে উঠে বললো, 'তোমরা কী ভেবেছো শুয়ে আছি ব'লে আমি ম'রে গিয়েছি? নাকি আমি একটা হাফ্-উইট? কিছুই বুঝি না?'

সোমনাথ মুখ থেকে মুখে চোখ সরিয়ে আবার বললো, 'হয়েছে কী?'

কেতকী হাতের মুঠো থেকে ডেলা-পাকানো চিঠিটা ছুঁড়ে মারলো সোমনাথের দিকে। 'আগাগোড়াই যদি এই মৎলব ছিলো, বলো নি কেন আগে? কেন আমাকে এ-রকম অপদস্থ করলে? আর ছেলেটাকেই বা বাঁদর নাচিয়ে কী সুখ হ'লো তোমাদের?'

সোমনাথ চোখ বুলিয়ে গেলো চিঠিটায় তারপর চুপ ক'রে রইলো।

কেতকী ফণা আছড়ালো— 'ইতরামো করবার একটা সীমা আছে, সোমনাথ। তোমরা কি তাও ছাড়িয়েছো?'

'এ-সব তুমি কী বলছো ?'

'যা ঠিক, তা-ই।'

'না, এ-সব কিছুই ঠিক নয়।'

'বোকা পেয়ে আমার চোখে অনেক ধুলো দিয়েছো, কিন্তু আমার মা-র চোখকে ফাঁকি দেবে এত চালাক এখনো হও নি।' ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন মিসেস মুখার্জি, 'আঃ, কী যা-নয়-তাই বলছিস। রাগ উঠলে যেন আর জ্ঞান থাকে না মেয়ের।'

'তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে ভুগে-ভুগে—' সোমনাথ এগিয়ে এসে গলার টাইটা ঝুলিয়ে দিলো ব্রাকেটে। কেতকী ফেটে গেলো— 'তা আর বলবে না ? এখন পাগল ব'লেই তো স্ত্রীকে চালাতে হবে তোমার। নইলে পাশের ঘরে বাসর পাতবে কেমন ক'রে ?'

'ছি, ছি !'

'ছি ছি ! তোমাদের আবার ছি ছি !'

অন্ধ রাগে কেতকী দিশেহারা হ'য়ে গেলো। 'জন্তু জানোয়ারেরও অধম তোমরা। তাদেরও যতটুকু মন আছে তোমাদের তা'ও নেই।'

অরুন্ধতীর শাদা কাগজের মতো বিবর্ণ মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো। স্থির বেদনায় স্তব্ধ হ'য়ে রইলো সে। সোমনাথ অস্থির গলায় বললো, 'কেতকী, তুমি ভদ্রতার সীমা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছো। কিন্তু আর না। আর আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'নির্লজ্জ ! না-হয় হৃদয় ব'লে কিছু নেই, বিবেক ব'লেও কি তোমার কিছু নেই ?'

সোমনাথ ছটফট করলো। বড়ো-বড়ো চুল টানতে লাগলো জোরে। স্ত্রীর কথার কোনো জবাবই তার মুখে এলো না।

'বিয়ে ওকে করতেই হবে।' কেতকী কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসলো। 'কেন ও বিয়ে করতে চায় না তা কি আমি জানি না?'

অরুন্ধতীর নিশ্বাসপতনের শব্দ নেই। কিন্তু সোমনাথ এগিয়ে এলো। 'তুমি কি ওঁর কর্তা? উনি কি তোমার আশ্রিতা? কিসের জোরে তুমি একজন মানুষকে এমন অপমান করতে সাহস পাও?'

গা থেকে আঁচলটা খ'সে পড়লো কেতকীর, রোগা শরীরে ঢলঢল করতে লাগলো ব্লাউজটা, দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে প্রায় রক্তাক্ত ক'রে ফেলে তীব্র জলন্ত দৃষ্টিতে সোমনাথকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফুঁসে উঠলো, 'আবার ওর পক্ষ নিয়ে তুমি ঝগড়াও করছো আমার সঙ্গে। এত! এতখানি?'

মিসেস মুখার্জি মেয়েকে ধরলেন, 'এই অসুস্থ শরীরে তুই কী আরম্ভ করেছিস? আগেই জানি এই আগুন একদিন লাগবে।'

'ছেড়ে দাও!' মাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিলো কেতকী, 'লাগবে তো ভালো ক'রেই লাগুক। তুমি আমাকে অনেক সময় অনেক কথা বলেছো, আমি বিশ্বাস করি নি কিন্তু আজ তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পেলাম। কিন্তু শোনো, সোমনাথ, যা তোমরা দিনরাত কামনা করো দু-জনে মিলে, তা হবে না। আমি মরবো না। আমি এর কেমন ক'রে প্রতিশোধ তুলতে হয় তা তোমাদের দেখিয়ে দেবো। কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে ওকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

জলে ডুবে যেতে-যেতে যেন হাত-পা ছুঁড়লো সোমনাথ, 'কেতকী, তুমি থামো, থামো। তোমার পাপ হবে এ-রকম বললে।'

'পাপ! পাপ তো বিদায় করবো আজ। যদি অমনি যায় ভালো। নয় তো রামদীন আছে!'

পাথরের পুতুল যেন নড়লো একবার, তার পরে আবার স্থির।

অনেক রাত্রে পেঁচা ডাকলো ঘূর্ণিফল গাছের মাথায়। দূরে উটরাম ঘাটে জাহাজের ভেঁপু শোনা গেলো, কোথা থেকে গান ভেসে এলো অস্পষ্ট আওয়াজে, কোথায় ট্রেন চ'লে গেলো ঝিকঝিক ক'রে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন তন্দ্রার অবসাদ থেকে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালো সোমনাথ। ঝাপসা-ঝাপসা চারদিকে তাকিয়ে কেমন অচেনা লাগলো সব। এই ঘর, এই বিছানা, বিছানার মানুষ, খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি কিছুই যেন তার নয়, সবই যেন তার জীবন থেকে অনেক, অনেক দূরে। সব বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। আস্তে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। একটা কনকনে ঠাণ্ডায় শিউরে উঠলো শরীরটা। গায়ে আপিশের পোশাক, পায়ে তেমনি জুতো। সেটুকু ছাড়বারই বা সময় পেলো কই? আকাশের তারার আলোয় সহসা পায়ের তলায় অরুন্ধতীকে দেখে স্তব্ধ হ'লো। ঈশ্বরের অবিচারে একটা ভাঙাচোরা, অবসন্ন, লাঞ্ছিত, ব্যর্থ মানুষ। খোলা চুলে মেঘের ঢেউ, নিচু-করা পিঠের বাঁকা রেখায় আধখানা চাঁদ। মোমের মতো মসৃণ শাদা অবলম্বনহীন দুটি হাতে পৃথিবীর মমতা। সোমনাথের আভাসে ঝড়ের দাপটে ব্যাকুল গাছের মতো অরুন্ধতী নিজেকে নিয়ে একেবারে আছড়ে পড়লো তার পায়ের পাতায়।

'নাও, নাও আমাকে নাও। আমি আর পারি না!'

এক মুহূর্ত। তার পরেই নিচু হ'লো সোমনাথ। অন্তর্লীন ভালোবাসার পরিপূর্ণ আবেগে দুই হাতের ব্যাকুল আলিঙ্গনে তাকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে। কপালে, মাথায়, গালে, চুলে অবিরল বৃষ্টি ধারার মতো চুম্বন করতে-করতে বললো, 'অরুন্ধতী, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালো-বাসি। আমি তোমার, তোমার।'

মধ্যরাত্রি থমকে রইলো মাথার উপরে। অন্ধকার বাজাতে লাগলো তার শেষ স্বরটি, আকাশ, বাতাস স্তব্ধ হ'লো। তারারা কোনো গোপন বাসনার দাহে কেঁপে-কেঁপে উঠে একটি-একটি ক'রে নেমে এলো নিচের দিকে। অন্ধকারের নাড়ি ছিঁড়ে জন্ম নিলো আলো।

অরুন্ধতীর যেন ঘুম ভাঙলো। চমকে উঠে মুখ তুললো সে। 'ঈশ্! কী শীত!' হাত রাখলো সোমনাথের গলার কাছে, উন্মুক্ত বুকে, 'যাও ঘরে যাও।' বোতাম বন্ধ ক'রে দিলো খোলা শার্টের, 'ঠাণ্ডা লাগলো না তো?' হাত দিয়ে সরিয়ে দিলো মাথার এলোমোলো চুল, মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের উদ্বেগ নিয়ে, স্ত্রীর প্রেম নিয়ে, কন্যার মমতা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে দু-হাতে তুলে দিলো সোমনাথকে।

সোমনাথ বললো, 'তুমি?'

'আমি!' অরুন্ধতীর কান্না-ভেজা মুখ শিশির-ভেজা ঘাসের মতো নরম। সোমনাথের হাতে সে ঢেকে ফেললো সেই মুখ, 'আমি কোথায় যাবো?'

'আমার ঘরে, আমার কাছে।'

'অনেক, অনেক দিয়েছো তুমি আমাকে। আমাকে ভ'রে দিয়েছো। তুমি যাও, ভেতরে যাও। বাইরে বড়ো ঠাণ্ডা।'

সোমনাথকে একরকম জোর ক'রেই ঘরে পাঠিয়ে দিলো সে, কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে রইলো আকাশে মুখ তুলে বাইরে। তারের যন্ত্রের মতো সুরেলা হ'য়ে কাঁপতে লাগলো সমস্ত শরীরের অন্ত্রী-তন্ত্রী। সেই ঝংকৃত শরীরের অসহ্য সুখের যন্ত্রণাই হয়তো তাকে বার ক'রে নিয়ে এলো রাস্তায়। সারা রাত্রির হিম গায়ে মেখে সরু গলিটার দু-ধারে বাড়িগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ প্রহরীর মতো। তাদের মাঝখান দিয়ে

ধীরে-ধীরে পা ফেলে আধো-অন্ধকারে ছায়া হ'য়ে কোথায় মিলিয়ে গেলো অরুন্ধতী। বড়ো কঠিন দুঃখের পণে পেয়েছে সে, এই সঞ্চয় সে হারাতে পারে না।

সোমনাথ ঘরে এসে দাঁড়ালো। মস্ত একটা বিছানায় লাউয়ের বাসি পাতার মতো এলিয়ে, নেতিয়ে মিশে একেবারে অসাড় হ'য়ে ঘুমুচ্ছে কেতকী। রুগ্ন, বিকৃত, অসহায়। তার ছোটো-ছোটো চুলগুলো, যে-চুলের ঘনতায় কতবার মুখ ডুবিয়েছে সোমনাথ, সেই সব চুল পাৎলা হ'য়ে বিশ্রী হ'য়ে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে মুখের এপাশে-ওপাশে বালিশের ওপর। রোগা হাতটা যেন একটা রেখা টেনেছে শাদা চাদরে। একটু আগে মানুষটা যে কত দাপাদাপি করেছে তার চিহ্নমাত্র নেই। কী যে মনে হ'লো, বুকের মধ্যে যে কেমন ক'রে উঠলো কে জানে। বিদ্যুতের মতো কত চকিত ছবি ফুটে উঠলো মনের পর্দায়। কত ফুল, কত গন্ধ। কত নিবিড় রাত, কত স্নিগ্ধ সকাল, ছুটির দুপুরের কত রোমাঞ্চ। সোমনাথ পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলো বিছানার কাছে, কিন্তু তক্ষুনি পেছিয়ে গেলো অনেক দূরে। আর যা-ই হোক, সত্যকে সে অবমাননা করতে পারে না। এই অবিশ্বাসী শরীর-মন নিয়ে সে ঠকাতে পারে না তাকে, তার স্ত্রীকে, সন্তানের মাকে।

তবে ? তবে কী ? এখন কী করবে সে ? তাড়িয়ে দেবে অরুন্ধতীকে ? ভুলে যাবে ? তা কেমন ক'রে হয় ? তা কি সম্ভব ? কেতকীর কাছে যদি তার কোনো ঋণ থাকে তবে অরুন্ধতীর কাছেই বা নয় কেন ? সে আমাকে কী দেয় নি ? কী রেখেছে নিজের ব'লে ? আমাকে ভালোবেসে আমার স্ত্রীর দাসী হয়েছে, আমার সন্তানের মা হয়েছে, আমার দুঃখের দিনে নিঃশব্দে সে-ই এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। আমার ঘর করেছে,

সংসার করেছে, ক্লান্তির পরে বিশ্রাম জুগিয়েছে, সেবার মাধুর্যে ভ'রে দিয়েছে হৃদয় মন। কিছুই না-চেয়ে, না-পেয়ে। কেতকী তার নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই ছাড়তে পারে নি তাকে। তার নিজের জীবন নিয়ে নিজের মনে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে দেয় নি। নিজের অযোগ্যতা কেতকী তাকে দিয়েই পূরণ করিয়ে নিতে চেয়েছে বারে-বারে। যে-ঘর কেতকীর আপন পরিশ্রমে গ'ড়ে ওঠা উচিত ছিলো, সে-ঘর সে অন্যকে দিয়ে বাঁধিয়েছে। স্বামীর জন্য যে-ব্যাকুলতা একান্তই তার, সেই কর্তব্যটুকু পর্যন্ত সে ছেড়ে দিয়েছে অন্যের উপর। আর যদি তার ভাগে কিছু কমই প'ড়ে থাকে তবে আর কী করতে পারে সোমনাথ? মন-প্রাণ, সহ্য-ধৈর্য, স্নেহ-প্রেম, মমতা, ধর্ম-কর্ম সবই তো সে কেতকীকে দিয়েছিলো, তরঙ্গিণীর চেয়েও বড়ো আসন দিয়েছিলো তাকে। কিন্তু কেতকী তো তাকে ভ'রে দিতে পারলো না, সব ছেড়ে সবের চেয়েও সোমনাথ যাকে অনেক-অনেক বেশি ব'লে ভেবেছিলো, প্রত্যেক দিনের জীবনে সে রইলো অনেক পেছিয়ে। বয়সের ধর্মে নয়, প্রকৃতির কৌশলে নয়, রূপের মোহেও নয়, ধীরে-ধীরে তিলে-তিলে মনের গভীর প্রদেশ থেকে অঙ্কুর মেলেছে এই ভালোবাসার বীজ, এর উচ্ছেদ আর সম্ভব নয়। আজ আমার সমস্ত হৃদয়ের সব শূন্যতা ভ'রে দিয়ে অরুন্ধতীই সত্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ছেড়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব। অসম্ভব? তাহ'লে? অরুন্ধতী আর কেতকী। কেতকী আর অরুন্ধতী। দুই স্ত্রী? দুই প্রিয়তমা? আর তাদের একমাত্র স্বামী সোমনাথ। প্রত্যহের আগুন? প্রত্যেক দিনের গ্লানি আর নোংরা? ঈর্ষা আর বেদনা। ছিঃ।

সোমনাথ অস্থির বেগে ঘরের এমাথা-ওমাথা হাঁটতে লাগলো। পট-পট ক'রে খুলে ফেললো জামার বোতাম, আবার লাগিয়ে ফেললো

তখুনি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো, হাতে মুঠো পাকালো, মাথার বড়ো-বড়ো চুল টেনে-টেনে প্রায় ছিঁড়ে ফেললো। তবু এর কোনো সমাধান সে খুঁজে পেলো না মনের মধ্যে, আবদ্ধ সিংহের দুঃসহ অসহায়তায় নিশ্বাস নিতে লাগলো জোরে-জোরে। কতক্ষণ এ-রকম করলো কে জানে। যেন ভয়ংকর পরিশ্রমে হাঁপাতে-হাঁপাতে দরজা ধ'রে সে থামলো শেষে। কী ভেবে একটু যেন শান্ত হ'লো। কেবল অদ্ভুত একটা অবসাদ। অবসাদের সমুদ্র।

তারপর ভোর হ'লো। গাছে-গাছে ডানা ঝাপটালো পাখিরা, পাতায়-পাতায় প্রাণ ছড়িয়ে দিলো নতুন সূর্য। ভেজা ছাইয়ের মতো তুঁতে রঙ ছড়িয়ে পড়লো শীতের স্যাঁতসেঁতে আকাশে। সোমনাথ বাথরুমে এসে দাঁড়ালো, চুপচাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেজিয়ে দিলো দরজাটা, খুপরি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো, তাকালো ভেতরকার এক-চৌবাচ্চা ঠাণ্ডা জলে। মনে প'ড়ে গেলো পদ্মানদীর কথা, পদ্মার ঢেউ। একটি বালককে দেখতে পেলো পেছন ফিরে, সেই পথ বেয়ে যে-বালক একদিন ঠিক এই সময় এসে এই কলকাতা শহরের বুকে পা রেখেছিলো, আশ্চর্য দুই চোখ মেলে রাস্তায় জল দেয়া দেখেছিলো, দেখেছিলো মানুষের মিছিল। ট্রাম, বাস, রিক্‌শা, মোটর, ফিটন। অন্য এক বিশাল জগৎ। তখন তার বুক কেঁপেছিলো, পা কেঁপেছিলো, ঘন-ঘন দৃষ্টি কেঁপেছিলো চোখের। আর তারও আগে আরো একটি ছোটো ছেলেকে মনে পড়লো তার, যে-ছেলে সারা বেলা অপলক তাকিয়ে থাকতো তার মা-র মুখের দিকে, দুঃখী মুখ, বিষণ্ণতার আভায় মধুর। সে-মুখে নীল শিরা, সে-মুখ বাদামি। সেই মুখের আলোয় তার পৃথিবী আলোকিত ছিলো। ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ প্রদীপের আলো। সেই

আলোটুকুই চারদিকের অন্ধকার দূর ক'রে দিলো একদিন। এগিয়ে দিলো আরো অনেক বড়ো জগতের দিকে। অনেক লম্বা রাস্তার চৌমাথায়। মা দরজার চৌকাঠে দাঁড়ালেন পথ দেখাতে, সজল চোখে মাথায় হাত রেখে, অস্ফুটে বললেন, 'গোবিন্দ, গোবিন্দ।' দাদু বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা।' ঠাকুরমা মোটা শরীরে মোটা মুখে থমথম করলেন, 'কী দরকার ছিলো অতটুকু ছেলেটাকে বিদেশে পাঠাবার? লোকে বলতেই বলে, অধিক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা।' দাদু বললেন, 'চুপ করো।' তারপর বাঁয়ে লক্ষ্মীগোবিন্দের মন্দির, ডাইনে বৈঠকখানার পিছনে জবাগাছের ঝোপ। বকুলতলার ঘাট। হানিফ, জনাবালি, গোবর্ধন। দাদু, পাঁচু, ঠাকুর্দা, নিমাই-কাকু। খেজুর গুঁড়ির সিঁড়ি। ছিপের মতো দোমাল্লাই কালো নৌকো। 'ওহে, ডাইন বাউলি দাও, ডাইন বাউলি দাও।' 'দুর্গা। দুর্গা।' আর তারপর সেই বালক নলখাগড়ার বাঁক ঘুরতে-ঘুরতে চিলেকুঠির ছাতে মা-কে দেখলো, হিজল গাছের আড়ালে মা-কে দেখলো, চৌধুরী-বাড়ির সীমানা পার হ'তে-হ'তে দুই চোখ আঁধার ক'রে তার জল নেমে এলো ধারাবর্ষার মতো। গভীর নীল দিগন্ত-জোড়া আকাশের দিকে তাকিয়ে সুদূর শঙ্খচিলের পাখায় উড়ে মন আবার ফিরে গেলো বকুলতলার ঘাটে। সেখানে এখনো দাদু দাঁড়িয়ে তার কথাই ভাবছেন।

আর তারপর?

তারপর সোমনাথ তাকের উপর থেকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নামিয়ে নিয়ে প্লাস্টিকের ঘনশাদা আর সবুজ মেশানো বাক্সটি খুলে ঝকঝকে নতুন ব্লেডটা তুলে নিলো হাতে। হঠাৎ ব্লেডের নীল মাছির মতো রংটা বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠলো চোখে আর সেই আলোয় এই প্রথম সে লক্ষ্য করলো— তার বলিষ্ঠ হাতের

রক্তবাহী মোটা-মোটা শিরাগুলোর রং‌ও ঠিক নীল মাছির পাখার মতোই চিক্কণ।

কেতকী তখন পাশ ফিরলো। সকালের আলোয় সারা রাত্রির দুঃস্বপ্ন-ক্লান্ত ভাঙা-ভাঙা যন্ত্রণাময় ঘুম তরল হ'য়ে এসেছে। তবু সে সম্পূর্ণ জেগে উঠতে পারলো না। চৈতন্য আর অচৈতন্যের মাঝামাঝি অদ্ভুত একটা শূন্যতার মধ্যে আকাশের বুকে মেঘের মতো ভাসতে লাগলো। অভ্যাস-মতো সোমনাথের আঘ্রাণে-ভরা শূন্য বালিশটির কাছে আদরে এগিয়ে এসে ঘুমের ঘোরেই আস্তে ডাকলো, 'সোমনাথ।' তারপর আবার ডুবে গেলো নিবিড় তিমিরে।

মিসেস মুখার্জি ভোরবেলাকার আরাম-ঠাণ্ডায় লেপটা ভালো ক'রে জড়িয়ে নিলেন গায়ে। ডিকের ছেলেমানুষি গভীর ঘুমে চিড় খেলো না। শুধু খোকাই কী জানি কেন দিদিমার অপরিচিত বুকের তলায় শুয়ে সারারাত উসখুস করলো।

ততক্ষণে ধারালো ব্লেডের তীক্ষ্ম ইস্পাত স্পর্শে শরীরের শিরা-উপশিরার মুখগুলো খুলে দিয়ে উচ্ছ্বসিত রক্তপ্লাবনের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠলো সোমনাথ। অদ্ভুত একটা ভয় আর কষ্ট মেশানো অনুভূতিতে যেন হিম হ'য়ে গেলো বুকের ভেতরটা। যে-কাজ এতক্ষণ ধ'রে সে অতিশয় ঠাণ্ডা মাথায় বীরের মতো সম্পন্ন করেছে ব'সে-ব'সে, সে-কাজের বিরুদ্ধতার জন্যই দাপিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ছি, ছি। শেষে আত্মহত্যা করলো কাপুরুষের মতো? যে-ঘটনা গল্পে উপন্যাসে পড়তে-পড়তে শিউরে উঠেছে, রাগ করেছে, উত্তেজিত হয়েছে? আর সবচেয়ে বেশি হয়েছে ঘেন্না। যে-লোক আত্মহত্যা করে তাকে মনে-মনে সত্যি

ঘেন্না না ক'রে পারে নি সোমনাথ। জীবনের কাছে এর চেয়ে বড়ো পরাজয় আর কিছুই সে ভাবতে পারে নি। আর আজ সে কিনা তাই ক'রে বসলো? কেন? কী থেকে বাঁচবার জন্য? কোন দুঃখ মৃত্যুর চেয়ে বেশি? প্রাণের চেয়ে বড়ো? আর যে-প্রাণ নিজের সৃষ্টি নয় তা তুমি কী অধিকারে হনন করবে? সেটা তো অধর্ম। তবে?

ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চৌবাচ্চার জলে সে হাত ডুবিয়ে দিলো, আবার তুলে নিলো, আবার ডুবিয়ে দিলো। মুছে দিলো প্যাণ্টের পায়ে, শার্টের বুকে— মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, বাঁচবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে সে যে কী করলো আর করলো না নিজেও বুঝলো না। এক মুহূর্ত আগে যে-সমস্যার সমাধান খুঁজতে-খুঁজতে সে পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো, একমাত্র এই উপায় ছাড়া যা থেকে মুক্তির অন্য কোনো দরজা সে খোলা পায় নি সে-সব কোথায় মিলিয়ে গেলো তুচ্ছ হ'য়ে। কেবল ভালো। সব ভালো। এ-সংসারে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে কাম্য। এই তো সব ভালো লাগা এখনো তার সারা গায়ে মাখামাখি, এখনো অরুন্ধতীর স্পর্শসুখে সমস্ত চেতনা তার উন্মিষিত, সমস্ত প্রাণ তারই সৌগন্ধ্যে ভরা, সব ইন্দ্রিয় তারই জন্য উন্মুখ। তবে এ-জীবন ছেড়ে সে কোথায় যাবে! আর তার শিশুপুত্র? যে-ছেলেকে আজ পর্যন্ত সে নিজের ছেলে ব'লেই ভেবে উঠতে পারে নি, সহসা তার মমতাতেও ব্যথায় টনটনিয়ে উঠলো মনটা। নিজের ছাব্বিশ বছরের টগবগে তাজা রক্তধারার অসংখ্য ছিন্ন মুখগুলো দু-হাতের দশটি শিথিল আঙুলে চেপে ধরতে-ধরতে সে এবার দৌড়ে চৌবাচ্চার কাছ থেকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করলো বাইরের দিকে। অসতর্ক পদক্ষেপে স্নান করবার জলচৌকিটা উল্টে গেলো, ঘটিটা গড়িয়ে গেলো। নিজে প'ড়ে গেলো হুমড়ি খেয়ে। চৌবাচ্চার কোণে লেগে মাথা ফেটে গেলো। তারপর এক অদ্ভুত বাঁকা রেখায়

নোংরা বাথরুমের শক্ত পিছল মেঝেতে শুয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' হাত দুটি শূন্যে তুলে ডুবন্ত মানুষের মতো শিশুর নির্ভরে ডাকতে লাগলো, 'অরুন্ধতী! অরুন্ধতী!' কেউ শুনলো না, কেউ এলো না। ঐ খুপরি ঘরের বন্ধ বাতাসেই দেয়ালে-দেয়ালে শেষ রাত্রির আজানের মতো তার কাঁপা-কাঁপা গলার আপ্রাণ মিনতি কোথায় মিলিয়ে গেলো। আস্তে-আস্তে ঝিমিয়ে এলো সব। ঘুম। ঘুম। ঘুমের অতল পাথার। হাত, পা, বুক, গলা সব, সব ঝিমিয়ে এলো ক্রমে। অমন সুন্দর দুটি চোখ, যে-চোখের তারায় কত স্বপ্ন মাখা ছিলো, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও যে-দুটি চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে বড়ো ভালো লেগেছিলো সে-দুটি চোখের পাতাও আস্তে-আস্তে কখন বুজে এলো ভারি হ'য়ে। কেবল একটানা লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি অযুত অর্বুদ ঝিঁঝিঁ পোকার দুঃসহ ডাক আর অলস অবশ ঘুমন্ত শ্রান্ত একটা অসম্ভব ভারি শিথিল শরীরে পাথরের ভার।